দেখিয়াছি, সেই খানেই খ আসিয়াছে। অতএব দৃঢ়চিত্তে বলা যাইতে পারে, যে যেখানে ক থাকিবে, সেই খানে, খ-বিনাশী কারণান্তর বিদ্যমান না থাকিলে, ভবিষ্যতে অবশ্য খ উপস্থিত থাকিবে। ইহাই সত্য ভবিষ্যদুক্তি, এবং ইহাই সর্ব্ব বিজ্ঞান শাস্ত্রের মূল।

"এখন তোমরা কি বলিতে পার, যে ফলিত জ্যোতিষের সিদ্ধান্তগুলি এই প্রকার প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত হইয়াছে? তোমরা বল যে জাতকের জন্মে বা বর্ষপ্রবেশ কালে তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল থাকিলে, শুভ ফলপ্রদ। ভাল যাঁহারা এই নিয়ম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কি, যাহার যাঁহার তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল তাহাদের সকলের জীবনের ফল পর্য্যবেক্ষিত করিয়া এই সকল নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন? এমন কেহ কখন জন্মিয়াছে কি না, যে তাহার তৃতীয়ে বা দশমে মঙ্গল আছে; অথচ তাহার তৃতীয় বা দশম ভাবের ফল ভাল হয় নাই, এ বিষয়ের সন্ধান করিয়া, এরূপ উদাহরণ পাওয়া যায় না, ইহা স্থির করিয়া, তার পর এ নিয়ম প্রচারিত করিয়াছিলেন কি? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং ইহার উপর নির্ভর করাও যাইতে পারে না।"

ফলিত জ্যোতিষের সপক্ষীয়েরা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে এরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ফলিত জ্যোতিষের তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলিবার কোন কারণ নাই। জ্যোতির্ব্বিদদিগের গ্রন্থে এমন কোন কথাই নাই, যে তাহা হইতে অনুমান করা যায়, যে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল প্রত্যক্ষমূলক। ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে, যে আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রে এমন অনেক কথা আছে তাহা কখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, যথা পূর্ব্বজন্মজ্ঞান। কথিত আছে যে

> জ্ঞানেন তীর্থরাজেষু মৃত্যোর্মৃত্যুপ্রদোগুরুঃ।
> শক্রস্য সদনং নীত্বা পশ্চান্মোক্ষপ্রদো ভবেৎ॥

মৃত্যু স্থানে অর্থাৎ অষ্টম গৃহে বৃহস্পতি থাকিলে তিনি জাতককে মৃত্যুপরে ইন্দ্রলোকে লইয়া গিয়া পশ্চাৎ মোক্ষ প্রদান করেন। এ সকল কথা কি প্রত্যক্ষমূলক?

অতএব এখানে বিচারে ফলিত জ্যোতিষের পক্ষকে একটু হটিতে হই-তেছে। এ শাস্ত্রের তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। কিয়দংশ হইলে হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু আর একটা কথা আছে। এ সকল তত্ত্বের উৎপত্তি যাহা হইতে হউক না কেন, কার্য্যতঃ তাহার যাথার্থ্য দেখা যায় কি? মনে কর, তৃতীয়ে বা দশমে রবি শনি বা মঙ্গল থাকিলে, তৃতীয় বা দশমের শুভ ফল হইবে, এ কথা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণেতৃগণ আপনার চিত্ত হইতে উদ্ভূত করিয়াছেন, বা স্বপ্নে দেখিয়াছেন, কিন্তু তা যাই হউক, বস্তুতঃ যাহার তৃতীয় বা দশমে রবি শনি বা মঙ্গল আছে, তাহার তৃতীয় বা দশমের ফল শুভ, ইহা দেখা যায় কি না? যদি দেখা যায়, তবে ফলিত জ্যোতিষের আদি যাই হউক না কেন, উহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হইবে। আর যদি তাহা দেখা না যায়, তবে উহা সত্য শাস্ত্র বলিয়া কদাচ মানিব না।

এই আসল কথা, ফল মিলে কি? সকল বিজ্ঞান শাস্ত্রেরই প্রকৃত পরীক্ষা এই, ফল মিলে কি? তুমি বল, কুইনাইনে জ্বর ভাল হয়। ভাল জ্বরগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে যথানিয়ম কুইনাইন খাওয়াইয়া দেখ। দেখিলে, জানিবে, যে হাঁ কুইনাইনে জ্বর ভাল হয়। সুতরাং চিকিৎসা শাস্ত্রের এ কথা মানিব। তুমি বল, জলজনে ও অম্লজনে জল হয়। যথারীতি ঐ দুই বায়ুর সংমিলন করিয়া দেখ। সংমিলন করিয়া যদি দেখি, জল হইল, তবে অবশ্য এ কথা মানিব। তেমনি দেখ, যাহার যাহার তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল আছে, তাহা-দের ইহ জীবনের তৃতীয় বা দশমের ফল শুভ হইয়াছে কি না। যদি দেখ যে হাঁ, যাহারই যাহারই তৃতীয় বা দশমে মঙ্গল তাহারই তাহারই তৃতীয়* বা দশমের শুভফল ফলিয়াছে, তবে অবশ্য মানিব, যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই তত্ত্ব সত্য বটে। এমনি যদি দেখি ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের সকল বচনের ফল মিলে, তবে আর কোন বিচারই করিব না—অবশ্য মানিব যে ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্য।

---

* মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে অনুজ পক্ষে শুভ হয় না। কিন্তু অন্য শুভ ফল আছে।

অতএব আসল কথা, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফল মিলে কি ? এই প্রশ্নের দুই প্রকার উত্তর শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন সকল ফলই মিলে। ইহাঁরা প্রায় এই শাস্ত্রব্যবসায়ী, অথবা তদুপজীবী, অথবা নির্ব্বোধ গোঁড়া। তাঁহাদিগকে যদি দেখাইয়া দাও, যে অমুক স্থানে ফল মিলে নাই, সেখানে তাঁহারা হয় ত বলিবেন, লগ্ন ঠিক নাই, নয় বলিবেন, গণনা ঠিক হয় নাই, নয়, আদৌ মানিবেন না যে ফল মিলিল না। গণক মহাশয় হয় ত তোমাকে গণিয়া বলিয়াছেন যে তুমি জ্যৈষ্ঠ মাসে ধনলাভ করিবে। জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় গেল, তুমি ধন লাভ করা দূরে থাকুক, বরং ঋণগ্রস্থ হইলে। গণক ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তুমি বলিলে, "কই মহাশয় ? ধনলাভ দূরে থাক, কর্জ্জ করিতে হইল।" গণক মহাশয় অম্লান বদনে বলিলেন, "সেই লাভ। কর্জ্জ করিয়া যে টাকা ঘরে আনিয়াছ, সে টাকা কি টাকা নয় ?" ইহার অপেক্ষা ও নির্লজ্জ জ্যোতির্ব্বিদ দেখা যায়। হয় ত তিনি বলিয়াছেন, " বৈশাখ মাসে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে।" বৈশাখ মাসে আরোগ্য লাভ দূরে থাক, হয় ত তোমার রোগ বাড়িয়াছে। গণক ঠাকুরকে সে কথা বলিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি অবশ্য আরোগ্য লাভ করিয়াছ—শাস্ত্রের বচন কি মিথ্যা হয় ? যদি উত্তর কর ; শাস্ত্রের বচন মিথ্যা হয় না, কিন্তু আমি ত শয্যাগত ;" গণক উত্তর করিবেন, "আরে, সেই তোমার আরোগ্য। তুমি ত মর নাই !"

অপর সম্প্রদায়ের উত্তর, আমাদের লক্ষিত দ্বিতীয় উত্তর। তাঁহারা বলেন, " ও সব পাগলামি। কই ফল মিলিতে কখন দেখা যায় না। " যদি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দাও, যে অমুক অমুক স্থানে ফল ঠিক মিলিয়াছে, তাঁহারা বলিবেন, " ও সব Coincidence. " যেখানে মিলিবে, সেইখানেই তাঁহাদের মতে Coincidence অথবা " shrewd guess." কাহারও গণনা শত করা নিরানব্বইটা মিলিলেও Coincidence বা আন্দাজ। "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ের লোক সচরাচর এই দলভুক্ত।

দেখা যাইতেছে, যে এ উভয় উত্তরের মধ্যে কোন একটির উপরে নির্ভর করা যাইতে পারে না। যাঁহারা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া প্রাচীন কুসংস্কারের বশীভূত আছেন, কোন সংস্কৃত গ্রন্থে কোন একটা বচন

দেখিলে, তাহাই অভ্রান্ত ঋষির উক্তি বলিয়া তাহার উপর অচলা ভক্তি সংস্থাপন করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রকৃত বিচারক নহেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা নব্য কুসংস্কারের বশীভূত, দেশী জিনিষ মাত্রেরই উপর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা করেন, পাশ্চাত্যদিগের মানসিক ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া আছেন, ফলিত জ্যোতিষের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কখন কোন অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারা এ বিষয়ের প্রকৃত বিচারক নহেন। উভয়েরই মত অগ্রাহ্য।

তবে, ফলিত জ্যোতিষোক্ত ফল ফলে কি না? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কি? উত্তর কঠিন বটে। আমরা যথাসাধ্য একটা উত্তর দিতে পারি। পাঠকের যদি কৌতুহল দেখি, তবে বারান্তরে উত্তর দিব।

কালিদাসের উপমা।

রাক্ষসবংশের নিধন এবং সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সস্ত্রীক স্বীয় ভুজবলার্জ্জিত রাবণের শ্রেষ্ঠ বিমাণ আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছেন। পুষ্পক রথ আকাশ পথে মেঘমালা ভেদ করিয়া শূন্যে চলিতেছে। সুদূর নিম্নে অনন্ত বিস্তীর্ণ মহান্ সমুদ্র,—বিচিত্র পাদপে শোভমান বিশাল পর্ব্বত-শৃঙ্গ সমূহ মেঘ স্পর্শ করিয়া আছে,—প্রবাহিণী স্রোতস্বতী দূরতানিবন্ধন ক্ষীণ প্রতীয়মানা—নির্ম্মল সলিলে হংসশ্রেণী ক্রীড়া করিতেছে —তীরবনসকল মৃগপক্ষিসঙ্কুল বিচিত্র মনোহর,—লতাকুঞ্জ,—বনস্থলী,— রাক্ষস ভয়শূন্য জীবনময় জনপদ,—হৃদয়গ্রাহী নির্ম্মল সুপ্রচ্ছন্ন শান্ত ঋষির আশ্রম,—বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলসম্পন্ন সরোবরনিমগ্ন প্রমোদোচ্ছাসপূর্ণ বিলাসীর সৌধ,—রামচন্দ্র সীতাকে পুষ্পক হইতে দেখাইতেছেন। সীতার বিচ্ছেদ সময়ে এই সমস্ত সুখকর দৃশ্যাবলী কখন কিরূপ বিষাদ উৎপাদন করিয়াছিল সেই কথা সীতার নিকট বিবৃত করিতেছেন। বিপত্তি অতিবাহিত হইলে, সুখের সময়ে উহার আলোচনায় সুখ আছে। আর দুঃখের সময়ে পূর্ব্ব-সুখস্মৃতি কেবল যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে।

রামের সেতু মলয় হইতে সুবর্ণ লঙ্কা পর্য্যন্ত বিস্তৃত—দুই পার্শ্বে সফেণ নীল সাগরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রহিয়াছে। রাম দেখাইলেন—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেণিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রশন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

দেখ বৈদেহি! ছায়াপথ কর্ত্তৃক শরৎকালের নির্ম্মল এবং নক্ষত্রশোভী আকাশের ন্যায়, মলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমার সেতু কর্ত্তৃক সফেণ সাগর বিভক্ত হইয়াছে।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী-
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

তাল, তমাল বনে নীলবর্ণ লবণ সমুদ্রের তীর, সুদূর শূন্যস্থ রামের পুষ্পক হইতে চতুর্দ্দিকে কলঙ্ক রেখাবিশিষ্ট একখানি লৌহ চক্রের ন্যায় প্রতীয়মাণ হইতেছে।

সেইরূপ

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
সরিদ্বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥

দূরতানিবন্ধন ক্ষীণ প্রতীয়মানা স্থিরনির্ম্মলসলিলা ঐ মন্দাকিনী নদী, ভূমির কণ্ঠে মুক্তাহারের ন্যায়, পর্ব্বতকণ্ঠে শোভা পাইতেছে।

পূর্ব্ব পরিচিত শ্যাম বটকে দেখাইয়া রাম সীতাকে বলিতেছেন—

ত্বয়া পুরস্তাদুপযাচিতো যঃ
সোঽয়ং বটঃ শ্যাম ইতি প্রতীতঃ।
রাশির্ম্মণীনামিব গারুড়ানাম্
সপদ্মরাগঃ ফলিতো বিভাতি॥

পূর্ব্বে তুমি যাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, শ্যাম নামে অভিহিত, এই সেই বট—ফলিত হওয়ায়, সপদ্মরাগ মরকত মণির রাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে।

চারিটী শ্লোকে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের—শ্বেত কৃষ্ণের সম্মিলনের—কেমন মনোহারিণী বর্ণনা—

কচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ
মুক্তামযী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥

কোথাও, মাঝে মাঝে প্রভাবিলেপী ইন্দ্রনীলমণিগ্রথিত—মুক্তার মালার ন্যায়। অন্যত্র, মাঝে মাঝে ইন্দীবর খচিত—শ্বেত পদ্মের মালার ন্যায়।

ক্কচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাম্
কাদম্বসংসর্গবতীব পংক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তিভুর্বশ্চন্দনকল্পিতেব।

কোথাও, নীল হংসের সহিত—মানসসরোবরপ্রিয় শ্বেত হংসশ্রেণীর ন্যায়। অন্যত্র, কৃষ্ণ চন্দনে অঙ্কিত পত্রাবলীবিশিষ্ট—পৃথিবীর শ্বেত চন্দনের রচনার ন্যায়।

ক্কচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ॥

কোথাও, ছায়াবিলীন অন্ধকারে—বিশুদ্ধ চন্দ্ররশ্মির ন্যায়। অন্যত্র, মাঝে মাঝে নীলাকাশপ্রকাশী—শারদীয় শুভ্র মেঘের ন্যায়।

ক্কচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥

কোথাও ভস্মাঙ্গরাগযুক্ত কৃষ্ণসর্পভূষিত মহাদেবের শরীরের ন্যায়। অনবদ্যাঙ্গি! যমুনার তরঙ্গে ভিন্নপ্রবাহা গঙ্গা শোভা পাইতেছে, দেখ।

সীতারাম।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের কথা বাহিরে যায় বটে, কিন্তু কখন ঠিক ঠাক যায় না। স্ত্রীলোকের মুখে মুখে যে কথা টা, চালিয়া চালিয়া রটিতে থাকে, সেটা কাজেই মুখে মুখে বড় বাড়িয়া যায়। বিশেষ যেখানে একটু খানি বিস্ময়ের গন্ধ থাকে, সেখানে বড় বাড়িয়া যায়। জয়ন্তী সম্বন্ধে অতিপ্রকৃত রটনা পূর্ব্বে যথেষ্টই ছিল, নাগরিকদিগের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখিয়াছি। এখন জয়ন্তী রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছিল, এই সোজা কথাটা যেরূপে বাহিরে রটিল, তাহাতে লোকে বুঝিল, যে দেবী অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইলেন, আর কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

কাজেই লোকের দৃঢ় প্রত্যয় হইল, যে তিনি নগরের অধিষ্ঠাত্রী এবং রক্ষা-কর্ত্রী দেবতা—রাজাকে ছলনা করিয়া, এক্ষণে ছল পাইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব রাজ্য আর থাকিবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে জনরব উঠিল, যে মুর্শিদাবাদ হইতে নবাবি ফৌজ আসিতেছে। কাজেই রাজ্যধ্বংস যে অতি নিকট সে বিষয়ে বড় বেশী লোকের সন্দেহ রহিল না। তখন নগর মধ্যে বোঁচকা বাঁধিবার বড় ধুম পড়িয়া গেল। অনেকেই নগর ত্যাগ করিয়া চলিল।

সীতারাম এ সকলের কোন সম্বাদ না রাখিয়া, চিত্তবিশ্রামে গিয়া একাকী বাস করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার চিত্তে ক্রোধই প্রবল—সে ক্রোধ সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসক। অন্যকে ছাড়িয়া ক্রোধ শ্রীর উপরেই অধিক প্রবল হইল।

উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে সীতারাম কতকগুলি নীচব্যবসায়ী নীচাশয় অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন, "রাজ্যে যেখানে যেখানে যে সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমার জন্য চিত্তবিশ্রামে লইয়া আইস।" তখন দলে দলে সেই পামরেরা চারি দিগে ছুটিল। যে অর্থের বশীভূতা তাহাকে অর্থ দিয়া লইয়া আসিল;

যে সাধ্বী তাহাকে বলপূর্ব্বক আনিতে লাগিল। রাজ্যে হাহাকারের উপর আবার হাহাকার পড়িয়া গেল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, চন্দ্রচূড়, ঠাকুর এবার কাহাকে কিছু না বলিয়া তল্পী বাঁধিয়া মুটের মাথায় দিয়া, তীর্থযাত্রা করিলেন। ইহজীবনে আর মহম্মদপুরে ফিরিলেন না।

পথে যাইতে যাইতে চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ফকির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর জি, কোথায় যাইতেছেন?"

চন্দ্র। কাশী। আপনি কোথায় যাইতেছেন?

ফকির। মক্কা।

চন্দ্র। তীর্থযাত্রায়?

ফকির। যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়ন্তী, প্রসন্নমনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—"জয় জগন্নাথ—তোমার দয়া অনন্ত! তোমার মহিমার পার নাই! তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেই ভাবে বিপদ! বিপদ কাহাকে বলে, প্রভু! তাহা বলিতে পারি না, তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ! আমি এত দিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই, যে আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা, কেন না বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া। অর্জ্জুন ডাকিয়াছিলেন, আমিও ডাকিতেছি প্রভু, শিখাও প্রভু! শাসন কর!

যচ্ছ্রেয়ং স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেহহং সাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

জয়ন্তী, জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনি

সেই পরম পিতা-মাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায়, বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, "আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন। সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপির দণ্ডই এই, যে সে দয়াময়কে ডাকিতে ভুলিয়া যায়। তাইসীতা-রাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে. আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি, যে এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ, তোমার নামের জয়! সীতা-রামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

তার পর জয়ন্তী ভাবিল, যে নিশ্চেষ্ট তাহার ডাক ভগবান্ শুনেন না। আমি যদি নিজে সীতারামের উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন? দেখি কি করা যায়। আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া, ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণপরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

জয়ন্তী, তখন শ্রীর কাছে চলিল। যথাকালে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জয়ন্তী শ্রীর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বলিল। শ্রী বিষণ্ণ হইয়া বলিল, "রাজার অধঃপতন নিকট। তাঁহার উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?"

জয়ন্তী। উপায় ভগবান্। ভগবান্‌কে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। ভগবান্‌কে যে দিন আবার তাঁর মনে হইবে সেই দিন তাঁহার আবার উন্নতি আরম্ভ হইবে।

শ্রী। তাহার উপায় কি? আমি যখন তাঁর কাছে ছিলাম, তখন সর্ব্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গই তাঁর কাছে কহিতাম। তিনি ত মনোযোগ দিয়া শুনিতেন।

জয়ন্তী। তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকি-

তেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কাণে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

শ্রী। না। তা, বড় লক্ষ্য করি নাই।

জ। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।

শ্রী। তবে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না?* স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?

শ্রী। তবে আমাকে পলাইতে পরামর্শ দিয়াছিলে কেন?

জ। তুমি যে বলিলে, তোমার শত্রু রাজা নিয়া বার জন। যদি ইন্দ্রিয়-গণ তোমার বশ্য নয়, তবে তোমার স্বামিসেবা সকাম হইয়া পড়িবে। অনাসক্তি ভিন্ন কর্ম্মানুষ্ঠানে কর্ম্মত্যাগ ঘটে না। তাই তোমাকে পলাইতে বলিয়াছিলাম। যার যে ভার সয় না, তাকে সে ভার দিই না। পদ্মং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং ইত্যাদি উপমা মনে আছে ত?

শ্রী বড় লজ্জিতা হইল। ভাবিয়া বলিল "কাল ইহার উত্তর দিব।"

সে দিন আর সে কথা হইল না। শ্রী সে দিন জয়ন্তীর সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করিল না। পরে জয়ন্তী তাহাকে ধরিল। বলিল, "আমার কথার কি উত্তর, সন্ন্যাসিনি?"

---

* কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥
গীতা ১৮।৯

শ্রী বলিল, "আমায় আর একবার পরীক্ষা কর।"

জয়ন্তী বলিল, "এ কথা ভাল। তবে মহম্মদপুর চল। তোমার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি, পথে তার পরামর্শ করিতে করিতে যাইব।"

দুই জনে তখন পুনর্ব্বার মহম্মদপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

গঙ্গারাম গেল, রমা গেল, শ্রী গেল, জয়ন্তী গেল, চন্দ্রচূড় গেল, চাঁদশাহ গেল। তবু সীতারামের চৈতনা নাই।

বাকি মৃণ্ময় আর নন্দা। নন্দা এবার বড় রাগিল—আর পতিভক্তিতে রাগ থামে না। কিন্তু নন্দার আর সহায় নাই। এক মৃণ্ময় মাত্র সহায় আছে। অতএব নন্দা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য, একদিন প্রাতে মৃণ্ময়কেই ডাকিতে পাঠাইল। সে ডাক মৃণ্ময়ের নিকট পৌঁছিল না। মৃণ্ময় আর নাই। সেই দিন প্রাতে মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়াই মৃণ্ময় সম্বাদ শুনিলেন, যে মুসলমান সেনা মহম্মদপুর আক্রমণে আসিতেছে—আগতপ্রায়—প্রায় গড়ে পৌঁছিল। বজ্রাঘাতের ন্যায় এ সম্বাদ মৃণ্ময়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ের যুদ্ধের কোন উদ্যোগই নাই। এখন আর চন্দ্রচূড়ের সে গুপ্তচর নাই, যে পূর্ব্বাহ্ণে সম্বাদ দিবে। সম্বাদ পাইবামাত্র মৃণ্ময় সবিশেষ জানিবার জন্য স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। কিছু দূর গিয়া সহসা মুসলমান সেনার সম্মুখে পড়িলেন। তিনি পলাইতে জানিতেন না। সুতরাং তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিহত হইলেন।

মুসলমান সেনা আসিয়া সীতারামের দুর্গ বেষ্টন করিল—নগর ভাঙ্গিয়া অবশিষ্ট নাগরিকেরা পলাইয়া গেল। চিত্তবিশ্রামে যেখানে সুন্দরীমণ্ডল পরিবেষ্টিত সীতারাম লীলায় উন্মত্ত, সেইখানে সীতারামের কাছে সম্বাদ পৌঁছিল, যে "মৃণ্ময় মরিয়াছে। মুসলমান সেনা আসিয়া দুর্গ ঘেরিয়াছে।" সীতারাম মনে মনে বলিলেন, "তবে আজ শেষ। ভোগ বিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।" তখন রাজা রমণীমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিলাসিনীরা বলিল, "মহারাজ কোথা যান? আমাদের ফেলিয়া কোথা যান?"

সীতারাম চোপদারকে আজ্ঞা করিলেন, "ইহাদের বেত মারিয়া তাড়াইয়া দাও।"

স্ত্রীলোকেরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। তাহাদিগের থামাইয়া ভানুমতী নামে, তাহাদিগের মধ্যস্থা এক সুন্দরী রাজার সম্মুখীন হইয়া বলিল,

"মহারাজ! আজ জানিলে বোধ হয়, যে সত্য সত্যই ধর্ম্ম আছে। আমরা কুলকন্যা, আমাদের কুলনাশ, ধর্ম্মনাশ করিয়াছ, মনে করিয়াছ কি তাহার প্রতিফল নাই? আমাদের কাহারও মা কাঁদিতেছে, কাহারও বাপ কাঁদিতেছে, কাহার ও স্বামী কাঁদিতেছে, কারও শিশুসন্তান কাঁদিতেছে—মনে করিয়াছিলেন কি যে সে কান্না জগদীশ্বর শুনিতে পান না? মহারাজ, নগরে না, বনে যাও, লোকালয়ে আর মুখ দেখাইওনা; কিন্তু মনে রাখিও যে ধর্ম্ম আছে।

রাজা এ কথার উত্তর না করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বায়ুবেগে অশ্ব সঞ্চালিত করিয়া দুর্গদ্বারে চলিলেন। যুবতীগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কেহ বলিল, "আয় ভাই, রাজার রাজধানী লুটি গিয়া চল।" "সীতারাম রায়ের সর্ব্বনাশ দেখি গিয়া চল," কেহ বলিল, "সীতারাম আল্লা ভজিবে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে ভজিগে চল।" সে সকল কথা রাজার কাণে গেল না। ভানুমতীর কথায় রাজার কাণ ভরিয়াছিল। রাজা এখন স্বীকার করিলেন, "ধর্ম্ম আছে।"

রাজা গিয়া দেখিলেন, মুসলমান সেনা, এখন গড় ঘেরে নাই—সবে আসিতেছে মাত্র—তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ধূলি, পতাকা ও অশ্বারোহী সকল নানা দিগে ধাবমান হইয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিতেছে। এবং প্রধানাংশ দুর্গদ্বার সম্মুখে আসিতেছে। সীতারাম দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

তখন রাজা চারিদিগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রায় শিপাহী নাই। বলা বাহুল্য যে তাহারা অনেক দিন বেতন না পাইয়া ইতি-

পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল—যে কয়জন বাকি ছিল, তাহারা মৃণ্ময়ের মৃত্যু ও মুসলমানের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। তবে দুই চারি জন ব্রাহ্মণ বা রাজপুত অত্যন্ত প্রভুভক্ত, একবার নূন খাইলে আর ভুলিতে পারে না, তাহারাই আছে। গণিয়া গাঁথিয়া তাহারা জোর পঞ্চাশ জন হইবে। রাজা মনে মনে কহিলেন, "অনেক পাপ করিয়াছি—ইহাদের প্রাণ দান করিব। ধর্ম্ম আছে।"

রাজা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারীরা কেহই নাই. সকলেই আপন আপন ধন প্রাণ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ভৃত্যবর্গ কেহ নাই কেবল দুই এক জন অতি পুরাতন দাস দাসী প্রভুর সঙ্গে একত্রে প্রাণপরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাশ্রুলোচনে অবস্থিতি করিতেছে।

রাজা তখন অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজন যে যে পুরীমধ্যে বাস করিত, সকলেই যথাকালে আপন আপন প্রাণ লইয়া প্রস্থান করিয়াছে। সেই বৃহৎ রাজভবন, আজ অরণ্যতুল্য, জনশূন্য, নিঃশব্দ, অন্ধকার! রাজার চক্ষে জল আসিল।

রাজা মনে জানিতেন, নন্দা কখনও যাইবে না, তাহার যাইবারও স্থান নাই। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে নন্দার সন্ধানে চলিলেন। তখন গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া মুসলমানের কামান ডাকিতে লাগিল—তাহারা আসিয়া গড় ঘেরিয়া প্রাচীর ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কোলাহল, অন্তঃপুর হইতে শুনা যাইতে লাগিল।

রাজা নন্দার ভবনে গিয়া দেখিলেন, নন্দা ধূলায় পড়িয়া শুইয়া আছে, চারি পাশে তাহার পুত্রকন্যা, এবং রমার পুত্র বসিয়া কাঁদিতেছে। রাজাকে দেখিয়া নন্দা বলিল, "হায় মহারাজ! এ কি করিলে!"

রাজা বলিলেন, "যাহা অদৃষ্টে ছিল তাই করিয়াছি। আমি প্রথমে পতিঘাতিনী বিবাহ করিয়াছিলাম, তাহার কুহকে পড়িয়া এই মৃত্যুবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে—"

নন্দা। "সে কি মহারাজ? শ্রী?"

রাজা। শ্রীর কথাই বলিতেছি।

নন্দা। যাহাকে আমরা ডাকিনী বলিয়া জানিতাম, সে শ্রী? এত দিন

বল নাই কেন মহারাজ?” নন্দার মুখ সেই আসন্ন মৃত্যুকালেও প্রফুল্ল হইল।

রাজা। বলিয়াই কি হইবে? ডাকিনীই হৌক, স্ত্রীই হোক, ফল একই হইয়াছে। মৃত্যু উপস্থিত।

নন্দা। মহারাজ! শরীর ধারণে মৃত্যু আছেই। সে জন্য দুঃখ করি না। তবে তুমি লক্ষযোদ্ধার নায়ক হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মরিবে, আমি তোমার অনুগামিনী হইব—তাহা অদৃষ্টে ঘটিল না কেন?

রাজা। লক্ষ যোদ্ধা আমার নাই। একশত যোদ্ধাও নাই। কিন্তু আমি যুদ্ধে মরিব, তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। আমি এখনই ফটক খুলিয়া মুসলমান সেনামধ্যে একাই প্রবেশ করিব। তোমাকে বলিতে ও হাতিয়ার লইতে আসিয়াছি।

নন্দার চক্ষে বড় ভারি বেগে স্রোত বহিতে লাগিল—কিন্তু নন্দা তাহা মুছিল। বলিল,

" মহারাজ আমি যদি ইহাতে নিষেধ করি, তবে আমি তোমার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তুমি যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছ—ইহাই আমার বহু ভাগ্য—আর যদি দুদিন আগে হইত! তুমিও মরিবে মহারাজ! আমিও মরিব—তোমার অনুগমন করিব। কিন্তু ভাবিতেছি—এই অপোগণ্ড গুলির কি হইবে? ইহারা যে মুসলমানের হাতে পড়িবে।,,

এবার নন্দা কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রাজা বলিলেন, “তাই, তোমার মরা হইবে না। ইহাদিগের জন্য তোমাকে থাকিতে হইবে।”

নন্দা। আমি থাকিলেই বা উহারা বাঁচিবে কি প্রকারে?

রাজা। নন্দা! এত লোক পলাইল—তুমি পলাইলে না কেন? তাহা হইলে ইহারা রক্ষা পাইত?

নন্দা। তোমার মহিষী হইয়া আমি কার সঙ্গে পলাইব মহারাজ! তোমার পুত্রকন্যা আমি তোমাকে না বলিয়া কাহার হাতে দিব? পুত্র বল, কন্যা বল, সকলই ধর্ম্মের জন্য। আমার ধর্ম্ম তুমি। আমি তোমাকে ফেলিয়া পুত্র কন্যা লইয়া কোথায় যাইব?

রাজা। কিন্তু এখন উপায়!

নন্দা। এখন আর উপায় নাই। অনাথা দেখিয়া মুসলমান যদি দয়া করে। না করে, জগদীশ্বর যাহা করিবেন তাহাই হইবে। মহারাজ, রাজার ঔরসে ইহাদের জন্ম। রাজকুলের সম্পদ বিপদ উভয়ই আছে—তজ্জন্য আমার তেমন চিন্তা নাই। পাছে, তোমায় কেহ কাপুরুষ বলে আমার সেই বড় ভাবনা।

রাজা। তবে বিধাতা যাহা করিবেন তাহাই হইবে। ইহজন্মে তোমাদের সঙ্গে এই দেখা।

এই বলিয়া আর কোন কথা না কহিয়া রাজা সজ্জার্থ অন্তগৃহে গেলেন। নন্দা বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া, রাজার সঙ্গে অন্তগৃহে গেলেন। রাজা, রণসজ্জায় আপনাকে বিভূষিত করিতে লাগিলেন, নন্দা বালক বালিকা-গুলি লইয়া, চক্ষু মুছিতে মুছিতে দেখিতে লাগিল।

যোদ্ধ্‌বেশ পরিধান করিয়া, সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্র বাঁধিয়া, সীতারাম আবার সীতা-রামের মত শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি তখন বীরদর্পে, মৃত্যু কামনায়, একাকী দুর্গ দ্বারাভিমুখে চলিলেন। নন্দা আবার মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

একাকী দুর্গদ্বারে যাইতে দেখিলেন, যে যে বেদীতে জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের জন্য আরূঢ় করিয়াছিলেন, সেই বেদীতে দুইজন কে বসিয়া রহিয়াছে। সেই মৃত্যুকামী যোদ্ধারও হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল। শশব্যস্তে নিকটে আসিয়া দেখিলেন—ত্রিশূল হস্তে, গৈরিকভস্মরুদ্রাক্ষবিভূষিতা, জয়ন্তীই পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশে, সেইরূপ ভৈরবীবেশে শ্রী!

রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে, সেই বেশে সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, "তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?"

জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল। রাজা দেখিলেন, শ্রী গদ্গদ কণ্ঠ, সজললোচন—কথা কহিবে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

২

রাজা তখন বলিলেন, "শ্রি! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?"

শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনীরা কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে, নন্দা যাইবে, প্রস্তুত হইয়াছ। তুমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ! যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাই, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার আসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি। এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,———

এই বলিয়া, শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল———

এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই। আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। শ্রী, তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী, রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, "আমি ভিখারিণী আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।"

সী। মা! তোমার নিকট আমি বড় অপরাধী। তুমি যে আজ আমার দুর্দ্দশা দেখিতে আসিয়াছ, তাহা মনে করি না, তোমার আশীর্ব্বাদেই বুঝি-

ভেছি তুমি যথার্থ দেবী। এখন আমায় বল তোমার কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত করিলে তুমি প্রসন্ন হও! ঐ শোন! মুসলমানের কামান! আমি ঐ কামানের মুখে এখনই এই দেহসমর্পন করিব। কি করিলে তুমি প্রসন্ন হও, তা এই সময়ে বল।

জয়ন্তী। আর এক দিন তুমি একাই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলে।

রাজা। আজ তাহা হয় না। জলে আর তটে অনেক প্রভেদ। পৃথিবীতে এমন মনুষ্য নাই যে আজ একা দুর্গ রক্ষা করিতে পারে।

জয়ন্তী। তোমার ত এখনও পঞ্চাশ জন সিপাহী আছে।

রাজা। ঐ কোলাহল শুনিতেছ? ঐ সেনা সকলের এই পঞ্চাশ জনে কি করিবে? আমার আপনার প্রাণ আমি যখন ইচ্ছা, যেমন করিয়া ইচ্ছা, পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু বিনাপরাধে উহাদিগের হত্যা করি কেন? পঞ্চাশ জন লইয়া এ যুদ্ধে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন ফল নাই।

শ্রী। মহারাজ! আমি বা নন্দা মরিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু নন্দা রমার কতকগুলি পুত্রকন্যা আছে, তাহাদের রক্ষার কিছু কি উপায় হয় না?

সীতারামের চক্ষে জলধারা ছুটিল। বলিলেন, "নিরুপায়! উপায় কি করিব?"

জয়ন্তী বলিল, "মহারাজ! নিরুপায়ের এক উপায় আছে—আপনি কি তাহা জানেন না? জানেন বৈ কি? জানিতেন, জানিয়া ঐশ্বর্য্যমদে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—এখন কি সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়ে না?"

সীতারাম মুখ নত করিলেন। তখন অনেক দিনের পর, সেই নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতিকে মনে পড়িল। কাল কাদম্বিনী বাতাসে উড়িয়া গেল—হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে, ক্রমে ক্রমে, সূর্য্যরশ্মি বিকশিত হইতে লাগিল—চিন্তা করিতে করিতে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপ্রকাশক সেই মহাজ্যোতিঃ প্রভাসিত হইল। তখন সীতারাম মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন! "নাথ! দীননাথ! অনাথনাথ! নিরুপায়ের উপায়! অগতির গতি! পুণ্যময়ের আশ্রয়! পাপিষ্ঠের পরিত্রাণ! আমি পাপিষ্ঠ বলিয়া আমায় কি দয়া করিবে না!"

সীতারাম অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকে জয়ন্তী ইঙ্গিত করিল। তখন সহসা দুই জনে সেই মঞ্চের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া, ঊর্দ্ধনেত্র হইয়া ডাকিতে লাগিল—গগন-বিহারী গগণবিদারী কলবিহঙ্গনিন্দিত কণ্ঠে, সেই মহাদুর্গের চারি দিগ প্রতি-ধ্বনিত করিয়া ডাকিতে লাগিল,

ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরং চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ! ॥

দুর্গের বাহিরে সাগরগর্জ্জনবৎ সেই মুসলমান সেনার কোলাহল; প্রাচীর ভেদার্থ প্রক্ষিপ্ত কামানের ভীষণ নিনাদ—মাঠে মাঠে, জঙ্গলে জঙ্গলে, নদীর বাঁকে বাঁকে, প্রতিধ্বনিত হইতেছে;—দুর্গমধ্যে জনশূন্য, সেই প্রতিধ্বনিত কোলাহল ভিন্ন শব্দশূন্য—তাহার মধ্যে সেই সাক্ষাৎ জ্ঞান ও ভক্তিরূপিণী জয়ন্তী ও শ্রীর সপ্তসুরসম্বাদী অতুলিতকণ্ঠনিঃসৃত মহাগীতি আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, সীতারামের শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল—

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্ব্বত এব সর্ব্ব ! ॥

শুনিতে শুনিতে সীতারাম বিমুগ্ধ হইলেন—আসন্ন বিপদ্ ভুলিয়া গেলেন, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে, বিহ্বল হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন,—তাঁহার চিত্ত আবার বিশুদ্ধ হইল। জয়ন্তী ও শ্রী সেই আকাশবিপ্লবী কণ্ঠে আবার হরিনাম করিতে লাগিল, হরি! হরি! হরি! হরি হে! হরি! হরি! হরি! হরি হে!

এমন সময়ে দুর্গমধ্যে মহা কোলাহল হইতে লাগিল—শব্দ শুনা গেল— "জয় মহারাজ কি জয়! জয় সীতারাম কি জয়!"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠককে বলিতে হইবে না. যে দুর্গমধ্যেই শিপাহীরা বাস করিত। ইহাও বলা গিয়াছে. যে শিপাহী সকলই দুর্গ ছাড়িয়া পলাইয়াছে. কেবল দুশ পঞ্চাশ নিতান্ত প্রভুভক্ত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত পলায় নাই। তাহারা বাছা বাছা লোক—বাছা বাছা লোক নহিলে এমন সময়েও বিনা বেতনে কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া থাকে না। এখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। এ দিকে মুসলমান সেনা আসিয়া পড়িয়াছে, মহা কোলাহল করিতেছে. কামানের ডাকে মেদিনী কাঁপাইতেছে—গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাচীর ফাটাইতেছে—তবু ইহাদিগকে সাজিতে কেহ হুকুম দেয় না! রাজা নিজে আসিয়া সব দেখিয়া গেলেন। কৈ? তাহাদের ত সাজিতে হুকুম দিলেন না! তাহারা কেবল প্রাণ দিবার জন্য পড়িয়া আছে, অন্য পুরস্কার কামনা করে না, কিন্তু তাও ত ঘটিয়া উঠে না—কেহ ত বলে না, "আইস! আমার জন্য মর!" তখন তাহারা বড় অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

তখন তাহারা সকলে মিলিয়া এক বৈঠক করিল। রঘুবীর মিশ্র তাহার মধ্যে প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ—রঘুবীর তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল। বলিল, "ভাই সব! ঘরের ভিতর মুসলমান আসিয়া খোঁচাইয়া মারিবে, সেই কি ভাল হইবে? আইস মরিতে হয় ত মরদের মত মরি! চল, সাজিয়া গিয়া লড়াই করি। কেহ হুকুম দেয় নাই—নাই দিক্! মরিবার আবার হুকুম হাকাম কি? মহারাজের নিমক্ খাইয়াছি, মহারাজের জন্য লড়াই করিব—তা হুকুম না পাইলে কি সময়ে তাঁর জন্য হাতিয়ার ধরিব না? চল হুকুম হোক্ না হোক্, আমরা গিয়া লড়াই করি!"

এ কথায় সকলেই সম্মত হইল। তবে, গয়াদীন পাঁড়ে প্রশ্ন তুলিল যে, "লড়াই করিব কি প্রকার? এখন দুর্গ রক্ষার উপায় একমাত্র কামান। কিন্তু গোলন্দাজ্ ফৌজ ত সব পলাইয়াছে। আমরা ত কামানের কাজ তেমন জানি না। আমাদের কি রকম লড়াই করা উচিত?"

তখন এ বিষয়ের বিচার আরম্ভ হইল। তাহাতে দুর্ম্মদ সিংহ জমাদ্দার বলিল, "অত বিচারে কাজ কি? হাতিয়ার আছে. ঘোড়া আছে. রাজাও

গড়ে আছে। চল, আমরা হাতিয়ার বাঁধিয়া, ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া রাজার কাছে গিয়া হুকুম লই। মহারাজ যাহা বলিবেন তাহাই করা যাইবে।”

এই প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিয়া সকলেই অনুমোদন করিল। অতি ত্বরা করিয়া সকলে রণসজ্জা করিল—আপন অশ্ব সকল সুসজ্জিত করিল। তখন সকলে সজ্জীভূত ও অশ্বারূঢ় হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা শব্দ উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল

“জয় মহারাজ কি জয়! জয় রাজা সীতারাম কি জয়!”

সেই জয়ধ্বনি সীতারামের কানে প্রবেশ করিয়াছিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যোদ্ধ্‌গণ জয়ধ্বনি করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যথায় মঞ্চপার্শ্বে সীতারাম, জয়ন্তী ও শ্রীর মহাগীতি শুনিতেছিলেন, সেইখানে আসিয়া জয়ধ্বনি করিল।

রঘুবীর মিশ্র জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজের কি হুকুম! আজ্ঞা পাইলে আমরা এই কয় জন নেড়ামুণ্ডকে হাঁকাইয়া দিই।”

সীতারাম বলিলেন, “তোমরা এইখানে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি আসিতেছি।”

এই বলিয়া রাজা অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শিপাহীরা ততক্ষণ নিবিষ্টমনা হইয়া অবিচলিত চিত্ত এবং অস্খলিতপ্রারম্ভ সেই সন্ন্যাসিনী দ্বয়ের স্বর্গীয় গান শুনিতে লাগিল।

যথাকালে রাজা এক দোলা সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইলেন। রাজভৃত্যেরা সব পলাইয়াছিল বলিয়াছি। কিন্তু দুই চারি জন প্রাচীন পুরাতন ভৃত্য পলায় নাই, তাহাও বলিয়াছি। তাহারাই দোলা বহিয়া আনিতেছিল। দোলার ভিতরে নন্দা এবং বালকবালিকাগণ।

রাজা শিপাহীদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া, অতি প্রাচীন প্রথানুসারে একটি অতি ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ

রচনা করিলেন। রন্ধ্রমধ্যে নন্দার শিবিকা রক্ষা করিয়া স্বয়ং সূচীমুখে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি জয়ন্তী ও শ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, " তোমরা বাহিরে কেন ? সূচীর রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ কর ? "

জয়ন্তী ও শ্রী হাসিল। বলিল, আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না। "

তখন সীতারাম আর কিছু না বলিয়া, " জয় জগদীশ্বর ! জয় লছমীনারায়ণ জী ! " বলিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই ক্ষুদ্র সূচীব্যূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তখন সেই সন্ন্যাসিনী অবলীলাক্রমে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে আসিয়া, ত্রিশূলদ্বয় উন্নত করিয়া,

জয় শিব শঙ্কর ! ত্রিপুরনিধনকর !
রণে ভয়ঙ্কর ! জয় জয় রে !
চক্রগদাধর, কৃষ্ণ পীতাম্বর
জয় জয় হরিহর ! জয় জয় রে !

ইত্যাকার জয়ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে চলিল। সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন,

" সে কি ? এখনই পিশিয়া মরিবে যে ? "

শ্রী বলিল, " মহারাজ ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশী ? " কিন্তু জয়ন্তী কিছু বলিল না। জয়ন্তী আর দর্প করে না। রাজা ও এই স্ত্রীলোকেরা কথার বাধ্য নহে বুঝিয়া, আর কিছু বলিলেন না।

তার পর দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজা স্বহস্তে তাহার চাবি খুলিয়া অর্গল মোচন করিলেন। লোহার শিকল সকলে মহা ঝঞ্ঝনা বাজিল—সিংহদ্বারের উচ্চ গুম্বুজের ভিতরে, তাহার ঘোরতর প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল—সেই অশ্বগণের পদধ্বনিও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন যবনসেনাসাগরের তরঙ্গাভিঘাতে সেই দুশ্চালনীয় লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কপাট আপনি উদ্ঘাটিত হইল—উন্মুক্ত দ্বারপথ দেখিয়া সূচীব্যূহস্থিত রণবাজিগণ নৃত্য করিতে লাগিল।

এদিগে যেমন বাঁধ ভাঙ্গিলে বন্যার জল, পার্ব্বত্য জলপ্রপাতের মত ভীষণ

বেগে প্রবাহিত হয়, মুসলমান সেনা দুর্গ দ্বারমুক্ত পাইয়া তেমনি বেগে ছুটিল। কিন্তু সম্মুখেই জয়ন্তী ও শ্রীকে দেখিয়া সেই সেনা তরঙ্গ,—সহসা মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত যেন নিশ্চল হইল। যেমন বিশ্ববিমোহিনী দৈবী মূর্ত্তি, তেমনি অদ্ভুত বেশ, তেমনি অদ্ভুত, অশ্রুতপূর্ব্ব সাহস, তেমনি সর্ব্বজন-মনোমুগ্ধকরী সেই জয়গীতি!—মুসলমান সেনা তাহাদিগকে পুররক্ষাকারিণী দেবী মনে করিয়া সভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। তাহারা ত্রিশূল ফলকের দ্বারা পথ পরিস্কার করিয়া, যবন সেনা ভেদ করিয়া চলিল। সেই ত্রিশূল নির্ম্মুক্ত পথে সীতারামের সূচীব্যূহ অবলীলাক্রমে মুসলমান সেনা ভেদ করিয়া চলিল। এখন সীতারামের অন্তঃকরণে জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন কেবল ইচ্ছা জগদীশ্বর স্মরণ করিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া মরিব। তাই সীতারাম চিন্তাশূন্য, অবিচলিত, কার্য্যে অভ্রান্ত, প্রফুল্লচিত্ত, হাস্যবদন। সীতারাম ভৈরবী মুখে হরিনাম শুনিয়া, শ্রীহরি স্মরণ করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন এখন তাঁর কাছে মুসলমান জয় কোন ছার।

তাঁর প্রফুল্লকান্তি, এবং সামান্যা অথচ জয়শালিনী সেনা দেখিয়া মুসলমান সেনা মার! মার! শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল। স্ত্রীলোক দুইজনকে কেহ কিছু বলিল না—সকলেই পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু সীতারাম ও তাঁহার সিপাহীগণকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সীতারামের সৈনিকেরা, তাঁহার আজ্ঞানুসারে, কোথাও তিলার্দ্ধ দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল না —কেবল অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। অনেকে মুসলমানের আঘাতে আহত হইল—অনেকে নিহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, অমনি আর এক জন পশ্চাৎ হইতে তাহার স্থান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে সীতা-রামের সূচীব্যূহ অভগ্ন থাকিয়া ক্রমশঃ মুসলমান সেনার মধ্যস্থল ভেদ করিয়া চলিল, সম্মুখে জয়ন্তী ও শ্রী পথ করিয়া চলিল। সিপাহীদিগের উপর যে আক্রমণ হইতে লাগিল তাহা ভয়ানক, কিন্তু সীতারামের দৃষ্টান্তে, উৎসাহবাক্যে, অধ্যবসায়, এবং শিক্ষার প্রভাবে তাহারা সকল বিঘ্ন জয় করিয়া চলিল। পার্শ্বে দৃষ্টি না করিয়া, যে সম্মুখে গতিরোধ করে, তাহাকেই আহত, নিহত, অশ্বচরণবিদলিত করিয়া সম্মুখে তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, মুসলমান সেনাপতি সীতারামের গতিরোধ জন্য একটা কামান সূচীব্যূহের সম্মুখ দিকে পাঠাইলেন। ইতি পূর্ব্বেই মুসলমানেরা দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিবার জন্য কামান সকল তদুপযুক্ত স্থানে পাতিয়াছিল, এজন্য সূচীব্যূহের সম্মুখে হঠাৎ কামান আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে নাই। এক্ষণে, রাজা রাণী পলাইতেছে জানিতে পারিয়া, বহু কষ্টে ও যত্নে একটা কামান তুলিয়া লইয়া সেনাপতি সূচীব্যূহের সম্মুখে পাঠাইলেন। নিজে সে দিকে যাইতে পারিলেন না, কেন না দুর্গদ্বার মুক্ত পাইয়া অধিকাংশ সৈন্য লুঠের লোভে সেই দিকে যাইতেছে। সুতরাং তাঁহাকেও সেই দিকে যাইতে হইল—সুবাদারের প্রাপ্য রাজভাণ্ডার পাঁচ জনে লুটিয়া না আত্মসাৎ করে। কামান আসিয়া সীতারামের সূচীব্যূহের সম্মুখে পৌঁছিল। দেখিয়া, সীতারামের পক্ষের সকলে প্রমাদ গণিল। কিন্তু শ্রী প্রমাদ গণিল না। শ্রী ও জয়ন্তী দুইজনে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া কামানের সম্মুখে আসিল। শ্রী, জয়ন্তীর মুখ চাহিয়া, হাসিয়া, কামানের মুখে আপনার বক্ষস্থাপন করিয়া, চারিদিক চাহিয়া ঈষৎ, মৃদু, প্রফুল্ল, জয়সূচক হাসি হাসিল। জয়ন্তীও শ্রীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর গোলন্দাজের মুখপানে চাহিয়া, সেইরূপ হাসি হাসিল—দুই জনে যেন বলাবলি করিল —"তোপ জিতিয়া লইয়াছি।" দেখিয়া, শুনিয়া, গোলন্দাজ হাতের পলিতা ফেলিয়া দিয়া, বিনীতভাবে তোপ হইতে তফাতে দাঁড়াইল। সেই অবসরে সীতারাম লাফ দিয়া আসিয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য তরবারি উঠাইলেন। জয়ন্তী অমনি চীৎকার করিল, "কি কর! কি কর! মহারাজ রক্ষা কর?" "শত্রুকে আবার রক্ষা কি?" বলিয়া সীতারাম সেই উত্থিত তরবারির আঘাতে গোলন্দাজের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া তোপ দখল করিয়া লইলেন। দখল করিয়াই, ক্ষিপ্রহস্ত, অদ্বিতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত সীতারাম, সেই তোপ ফিরাইয়া আপনার সূচীব্যূহের জন্য পথ সাফ করিতে লাগিলেন। সীতারামের হাতে তোপ প্রলয়কালের মেঘের মত বিচ্ছেদশূন্য গম্ভীর গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তদ্বর্ষিত অনন্ত লৌহপিণ্ডশ্রেণীর আঘাতে মুসলমান সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া সম্মুখ ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। এখন সূচীব্যূহের পথ সাফ! তখন সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও

পুত্রকন্যা ও হতাবশিষ্ট সিপাহীগণ লইয়া মুসলমান কটক কাটিয়া আপদ-শূন্য স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন। মুসলমানেরা দুর্গ লুটিতে লাগিল।

এই রূপে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রী সন্ধ্যার পর জয়ন্তীকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"জয়ন্তী! সেই গোলন্দাজ কে?"

জয়ন্তী। যাহাকে মহারাজ কাটিয়া ফেলিয়াছেন?

শ্রী। হাঁ! তুমি রাজাকে কাটিতে নিষেধ করিয়াছিলে কেন?

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর জানিয়া কি হইবে?

শ্রী। না হয় একটু চোখের জল পড়িবে। তাহাতে সন্ন্যাসধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় না।

জয়ন্তী। চক্ষের জলই বা কেন পড়িবে।

শ্রী। জীবন্তে আমি চিনিতে পারি নাই। কিন্তু তোমার নিষেধবাক্য শুনিয়া আমি মরা মুখখানা একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছিলাম। আমার একটা সন্দেহ হইতেছে। সে ব্যক্তি যেই হউক, আমিই তার মৃত্যুর কারণ। আমি তোপের মুখে বুক না দিলে সে অবশ্য তোপ দাগিত: তাহা হইলে মহারাজা নিশ্চিত বিনষ্ট হইতেন, গোলন্দাজকে তখন আর কে মারিত?

জয়ন্তী। সে মরিয়াছে, মহারাজা বাঁচিয়াছেন, সে তোমার উপযুক্ত কাজই হইয়াছে—তবে আর কথায় কাজ কি?

শ্রী। তবু মনের সন্দেহটা ভাঙ্গিয়া রাখিতে হইবে।

জয়ন্তী। সন্ন্যাসিনীর এ উৎকণ্ঠা কেন?

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাসবিভ্রংশের কথা কেন বল?

জয়ন্তী। তবে চল, সন্দেহ মিটাইয়া আসি। আমি সে স্থানে একটা চিহ্ন রাখিয়া আসিয়াছি—রাত্রেও সে স্থানের ঠিক পাইব। কিন্তু আলো লইয়া যাইতে হইবে।

এই বলিয়া দুই জনে খড়ের মশাল তৈয়ার করিয়া তাহা জ্বালিয়া রণক্ষেত্র দেখিতে চলিল। চিহ্ন ধরিয়া জয়ন্তী অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিল। সেখানে মশালের আলো ধরিয়া তল্লাস করিতে করিতে সেই গোলন্দাজের মৃত দেহ পাওয়া গেল। দেখিয়া শ্রীর সন্দেহ ভাঙ্গিল না। তখন জয়ন্তী সেই শবের রাশীকৃত পাকা চুল ধরিয়া টানিল—পরচুলা খসিয়া আসিল; শ্বেতশ্মশ্রু ধরিয়া টানিল, পরচুলা খসিয়া আসিল। তখন আর শ্রীর সন্দেহ রহিল না—গঙ্গারাম বটে।

শ্রীর চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী বলিল,

"বহিন্—যদি এ শোকে কাতর হইবে, তবে কেন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলে?"

শ্রী বলিল, "মহারাজ আমাকে বৃথা ভৎর্সনা করিয়াছেন। আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই—আমি আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এত দিনে ফলিল।"

জয়ন্তী। বিধাতা কাহার দ্বারা কাহার দণ্ড করেন, তাহা বলা যায় না। তোমা হইতেই গঙ্গারাম দুইবার জীবন লাভ করিয়াছিল, আবার তোমা হইতেই ইহার বিনাশ হইল। যাই হউক, গঙ্গারাম পাপ করিয়াছিল, আবার পাপ করিতে আসিয়াছিল। বোধ হয় রমার মৃত্যু হইয়াছে তাহা জানে না, ছদ্মবেশে ছলনা দ্বারা তাহাকে লাভ করিবার জন্যই মুসলমান সেনার গোলন্দাজ হইয়া আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। কেননা, রমা তাহাকে চিনিতে পারিলে কখনই তাহার সঙ্গে যাইত না। বোধ হয়, শিবিকাতে রমা ছিল মনে করিয়া তোপ লইয়া পথ রোধ করিয়াছিল। যাই হোক উহার জন্য বৃথা রোদন না করিয়া উহার দাহ করা যাক আইস।"

তখন দুই জনে ধরাধরি করিয়া গঙ্গারামের শব উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া দাহ করিল।

জয়ন্তী ও শ্রী আর সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল না। সেই রাত্রে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, কেহ জানিল না।

পরিশিষ্ট।

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদ্বয় রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই পলাইয়া নলডাঙ্গায় বাস করিতেছিলেন। সেখানে একখানি আটচালায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

রামচাঁদ। কেমন হে ভায়া! মহম্মদপুরের খবরটা শুনেছ?

শ্যামচাঁদ। আজ্ঞে হাঁ—সেত জানাই ছিল। গড় টড় সব মুসলমানে দখল করে লুটপাট করে নিয়েছে।

রাম। রাজা রাণীর কি হ'লো কিছু ঠিক খবর রাখ?

শ্যাম। শোনা যাচ্চে, তাঁদের নাকি বেঁধে মুর্শিদাবাদ চালান দিয়েছে। সেখানে নাকি তাঁদের শূলে দিয়েছে।

রামচাঁদ। আমিও শুনেছি তাই বটে, তবে কি না শুন্‌তে পাই যে পথে তাঁরা বিষ খেয়ে মরেছেন। তার পর মড়া দুটো নিয়ে গিয়ে বেটারা শূলে চড়িয়ে দিয়েছে।

শ্যাম। কত লোকে কত রকমই বলে! আবার কেউ কেউ বলে রাজা রাণী নাকি ধরা পড়ে নাই—সেই দেবতা এসে তাদের বার ক'রে নিয়ে গিয়েছেন। তার পর নেড়ে বেটারা জাল রাজা রাণী সাজিয়ে মুর্শিদাবাদ নিয়ে গিয়ে শূলে দিয়েছে।

শ্যাম। তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।

রাম। তা এটা উপন্যাস না ওটা উপন্যাস তার ঠিক কি? এটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরে কাজ কি? আপনার আপনার প্রাণ নিয়ে যে বেঁচে এয়েছি এই ঢের। এখন তামাকটা ঢেলে সাজ দেখি।

রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ তামাক সাজিয়া খাইতে থাকুক। আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সমাপন করি। এবং সর্ব্বফলদাতার নিকট প্রার্থনা করি, যে পাঠকেরা সীতারামের দুষ্কর্ম্ম এবং শ্রীর অকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া জয়ন্তীর কর্ম্মানুকারী হউন।

রাজকৃষ্ণ।

সখা হে, তোমার তরে, আজিকে ব্যাকুলান্তরে,
মিলিত হয়েছি সেই সাবিত্রী ভবনে,
এ নহে সে সুখমেলা, এ নহে হাসির খেলা,
—জুড়াতে হৃদয় জ্বালা গুণের কীর্ত্তনে!
হায়, কে জানিত এক দিন হইয়া এমন দীন,
—হারায়ে তোমারে মোরা আসিব হেথায়,
তোমার মুখানি স্মরি, ফেলিব শোকাশ্রু বারি,
—রহিবে না (পাশে তুমি বসন্তের প্রায়!)
তোমার সে হাসি মুখ, স্মরিলে এখনও সুখ,
পুলকে পুরিয়া উঠে হৃদয় নিলয়,
সে কি সন্তোষের ছবি, যেন প্রভাতের রবি,
—আলোকে জাগায়ে ধরা করে মধুময়!
—নয়নে অমৃত রাশি, মুখে পূত পুণ্য হাসি
একাধারে গুণ রাশি রাজকৃষ্ণ কায়,
—কেমনে ভুলিব সখা! (লইতে বিদায়!
—বিদরি যে যায় বুক কি বলিব হায়!)

হায়!

আঁধার মলিন পুরী রতন গিয়েছে চুরী!
—নিভেছে উজ্জ্বল দীপ কাল ঝড় বায়!—
—ফেলো. দুবিন্দু শোকাশ্রু বারি স্মরি সবে তাঁয়
—স্মরি সে পবিত্র মূর্ত্তি, রাজকৃষ্ণ কায়!
হায়!—বন্ধুতার প্রতিদান, বিনয়ের সসম্মান,
—থাকে যদি লোকালয়ে, থাকে মুগ্ধ মন,
(তবে আসিবে নয়নে বারি স্মরি সে আনন!)

---

* গত ২ রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ আহুত সভা উপলক্ষে লিখিত।

সখা,

আজি বসন্তের দিন, ফুটিছে মুকুল,
—গাঁথিছে বালকে মালা কুড়াইয়া ফুল,
—স্নেহ প্রতিদান ছলে,
—পরাবে সখার গলে;
হায়! মোরা স্মরি গুণ তব হয়েছি ব্যাকুল!
—অভাগা বঙ্গেরে বিধি সদা প্রতিকূল!
হায়! আজি এ মিলন হেন, প্রতিম' বিসর্জ্জি যেন!
—আঁধার মণ্ডপ মাঝে আনত আনন।
—লিখি তব গুণ-গাথা,
—স্মরি তব প্রেম-কথা!
—গভীর হৃদয় ব্যথা, হবে কি মোচন?
কি বলিব আর!

সখা,

—এই শত আঁখি আগে, নবীন অরুণ রাগে,
—সদা যেন রহে জেগে তোমার আনন।
হবে কি প্রসন্ন ভাল,
করেছে যে ক্ষতি কাল,
—লয়ে অসময়ে তোমা, দীন বঙ্গ হতে।
—সে ক্ষতি পুরাতে বিধি
পুনঃ কি মিলাবে নিধি,
—তোমার অভাব যাহে পারিবে পূর্ণিতে!

হায়!

"সাবিত্রী" তোমারে স্মরে,
কাঁদিবে গো চির তরে,
করিবে সতত তব গুণের কীর্ত্তন,
(রাখিবে হৃদয়ে তব মুরতি মোহন!)

হায়!
—শত আঁখি অশ্রুবারি,
—ঝরিবে তোমারে স্মরি,
—আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয়?
যশের মন্দির মাঝে
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে,
সদা অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয়!!
"ভারতকুসুম" রচয়িত্রী।

রাজকৃষ্ণ বাবুর জীবনী।

গোস্বামী দুর্গাপুর নিবাসী ৺ আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাইকপাড়া কন্‌সারন নামক নীলকুঠীর দেওয়ানী কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু অর্থ রক্ষা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি যাহা কিছু পাইতেন সমস্তই হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদিতে ব্যয় করিতেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু দুর্গাপুরের লোক এখনও তাঁহার প্রদত্ত ভোজ ভুলিতে পারে নাই। অতি অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স ১৫ বৎসর এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স নয় বৎসর মাত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্ন তখন কৃষ্ণনগর কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, কনিষ্ঠ তখনও পাঠশালায়। হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় মৃত্যুকালে রাধিকাপ্রসন্ন পিতার নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার পৈতৃক যাহা কিছু ছিল তাহা তিনি পান নাই। পূর্ব্ব পুরুষের যে কিছু স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা তাঁহাদিগের নাবালগ অবস্থায় অন্য লোকে উপভোগ করিত, সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর দুই ভাইয়ে বিস্তর কষ্ট পাইয়াছিলেন। পিতার

মৃত্যুতে রাধিকাপ্রসন্ন বাবু অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উক্ত পরীক্ষায় প্রথম হইলেন এবং সেইরূপ বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। এই সামান্য বৃত্তি হইতে তাঁহাকে আপনার লেখাপড়া ভাইএর লেখাপড়া এবং পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হইত।

১৯ বৎসর বয়সে তিনি যখন পাঠ সমাপন করিয়া চাকরী করিতে আরম্ভ করিলেন; তখন ১৩ বৎসরবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কৃষ্ণনগরে আনয়ন করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ বাবু এ পর্য্যন্ত গ্রামস্থ বর্দ্ধমানীয় গুরুর নিকট অস্থিতপঞ্চক পর্য্যন্ত অঙ্ক কসা শেষ করিয়াছিলেন এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন সুতরাং তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়েন। কিন্তু পিতৃকুলের অভিমত না হওয়ায় রাজকৃষ্ণ বাবুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হওয়া হইল না। বাল্যাবধিই রাজকৃষ্ণ বাবু অতি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার পড়া শুনায় বড়ই অনুরাগ ছিল। এবং তিনি মাতার তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকারে তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি কতবার বলিয়াছেন যে বাল্যকালে মায়ের পূজার জন্য ফুল তুলিতে তিনি বড ভাল বাসিতেন।

যাহা হউক কৃষ্ণনগরে গিয়া তিনি কিছু দিন দাদার বাসায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে ইংরাজী দুই একখানি পুস্তক পাঠ সমাপন করিয়া তিনি মিসনরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভরতি হন ও ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। পরে ২ বৎসর মাত্র কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করত এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ইউনিবর্সিটির তৃতীয় হয়েন। এইরূপে এল এ পরীক্ষায় ১ম, বি এ পরীক্ষায় ২য় ও বি এল পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন। ফিলসফিতে এম এ লইয়া তিনি প্রথম শ্রেণীতে পাস হন। যে বৎসর তিনি এম এতে পাস হন সেই বৎসর কনবোকেসন কালীন বক্তৃতায় বাইস চানসেলার সাহেব তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতি করেন। তিনি বলেন যে রাজকৃষ্ণ বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রের সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাস হইয়া তিনি প্রথমতঃ কটক কলেজের প্রোফেসর

ও ল লেকচরর হইয়া গমন করেন। বৎসরাবধি তথায় অবস্থান করিয়া সে কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া দিন কতক তিনি কলিকাতায় বসিয়া থাকেন, পরে যখন শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুর কলেজের ল লেকচারি হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন তথায় ল লেকচরর নিযুক্ত হন এবং তথা হইতে পাটনায় প্রোফেসর ও ল লেকচরর হইয়া যান। পাটনা হইতে আসিবার কিছু দিন পরে তিনি কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। প্রায় ৩।৪ বৎসর এই কার্য্য করিলে পর, কুমার বাহাদুর সাবালগ হয়েন ও তাঁহার কর্ম্ম যায়, তখন তিনি কিছু দিনের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রোফেসর হয়েন এবং তাহার পর রবিন্‌সন সাহেবের মৃত্যু হইলে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক নিযুক্ত হন্। ৭ বৎসর কয়েক মাস এই কার্য্য করার পর তাঁহার মৃত্যু হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিতি কাল হইতেই তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন বি এল পড়িতেছিলেন তখনই তিনি "ভগীরথের গঙ্গানয়ন" নামক কাব্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। প্রথমতঃ কাব্য লেখার উপরই তাঁহাব অধিক ঝোঁক ছিল। "ভগীরথের গঙ্গানয়ন" কখন মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার চারিখানি কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল কবিতা দুষ্ট প্রণয় বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নহে। ইহার বিষয় সকল অতি উদার, মহান্! তাঁহার সৃষ্টি নামক কবিতা যিনিই পাঠ করিয়াছেন তিনিই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার যৌবনোদ্যান নামক রূপক অতি পরিপাটী হইয়াছে। উহা অনেক বৎসর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কোর্স ছিল।

পদ্য ছাড়িয়া তিনি একবার মাত্র গদ্য কাব্য লিখিতে প্রয়াস পান। এ কাব্যখানির নাম রাজবালা—আপনার গ্রামের উৎপত্তি লইয়া এ কাব্য আরম্ভ।

তিনি যে শুদ্ধ কাব্য সাহিত্য লইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে। তাঁহার পরিমিতি ও বীজগণিত এখনও ষ্টাণ্ডার্ডওয়ার্ক বলিয়া গণ্য।

কিন্তু সাহিত্যের যে শাখায় তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা ইতিহাস। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসখানি লিখিতে ৭ দিন মাত্র সময়

লাগিয়াছিল। তাঁহার আর ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার নানা প্রবন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আছে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান।

তিনি যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায়ই পুস্তক লিখিতেন এরূপ নহে। তাঁহার ইংরাজীতেও অতি উচ্চ দরের বিষয় লইয়া ৪।৫ খানি পুস্তিকা আছে যথা:— Origin of Language, Theory of morals, Hindu mythology, Hindu Philosophy. ইত্যাদি; ইহার মধ্যে এক খানি পাঠ করিয়া মহাত্মা লব বলিয়াছিলেন—

I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter.

কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু ইংরাজী অপেক্ষা বাঙ্গালায় লিখিতে ভাল বাসিতেন। তিনি বলিতেন "নানান্ দেশে নানান্ ভাষা;

বিনে আপন ভাষা পুরে কি আশা।"

রাজকৃষ্ণ বাবু কখন জ্ঞানোপার্জ্জনের সুবিধা পরিত্যাগ করিতেন না। কোন পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহার নিকট কোন না কোন কূট প্রশ্ন বুঝাইয়া লইতেন। তিনি যখন উড়িষ্যায় ছিলেন তখন বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। উৎকল ভাষায় তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল। পাটনায় অবস্থিতি কালে তিনি, হিন্দী, উর্দ্দূ ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পারস্য ভাষায় তাঁহার এতদূর ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে তিনি এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে তোতিনামা ও করীমা নামক দুইখানি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে ফরাসী পুরাতত্ত্বজ্ঞ বর্ণুফ সাহেব অনেক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এই জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু বিশেষ যত্ন সহকারে ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ঐ কারণেই তিনি আর এক সময়ে বিশেষ উদ্যম সহকারে জর্ম্মান ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। তিনি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিতেন। মূলগ্রন্থ না পাইলে জর্ম্মান, ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় তাহার অনুবাদ পাঠ করিতেন। পালি ভাষায় গ্রন্থাদি প্রায় রোমন অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে, কিন্তু রোমান অক্ষরে পালি ভাষা পড়িয়া রাজকৃষ্ণ বাবুর তৃপ্তি হইত না। সেই জন্য তিনি ব্রহ্মদেশীয়

বর্ণমালা অভ্যাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃতমূলক বর্ণমালা সমূহের মধ্যে ব্রহ্ম বর্ণমালা যত নিকৃষ্ট এত আর কোনটীও নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বাবু অতিশয় যত্ন সহকারে সেই বর্ণমালা অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। বাল্যকালে গ্রামস্থ পণ্ডিতের নিকট তিনি মুগ্ধবোধ কিছু পড়িয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে তিনি কখন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের এত আদর ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত তিনি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি সমস্ত উপনিষৎগুলি পাঠ করিয়াছিলেন এবং উপনিষৎ শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। তিনি সংস্কৃত ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আপিস হইতে ফিরিয়া গিয়াও তিনি ১২ টা ১ টা পর্য্যন্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং অঙ্ক কসিতেন। তিনি ঠিকুজি ও কোষ্ঠী প্রস্তুত ও পরীক্ষা করিতে পারিতেন। করকোষ্ঠী উদ্ধারেও তাঁহার অনেক পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল।—[ক্রমশঃ]

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বপন ও মরণ।

১। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি এক দিন গাইয়াছিলেন—

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে জীবন নদে।

জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মরণ সকলেরই পক্ষে নিশ্চিত। দুঃখভারে অবনত, সুখামোদে উল্লাসিত, ক্লেশ কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, ঐশ্বর্য্যমদে চরম গর্ব্বিত, সকলেরই জন্য সেই এক দিন আছে—যে দিন সকল ভার নামিবে, সকল উল্লাস ফুরাইবে, সকল ক্ষত আরোগ্য হইবে, সকল গর্ব্বের অবসান করিবে। সকলই ফুরায়—সকলি চলিয়া যায়—সকলেরই অবসান হয়। এই যে পঞ্চভূতাত্মক দেহ—যাহাতে এত লাবণ্য, এত বল, এত যত্ন, যাহা রক্ষার জন্য

এত চেষ্টা, যাহা পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য এত আয়োজন, যাহার পোষণে এত ব্যয়, যাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এত কাণ্ড—তাহাও সেই দিন আপনার গন্তব্য পথে চলিয়া যাইবে। রোগে হৌক, শোকে হৌক, বিষে হৌক বন্ধনে হৌক, এই দেহের বিনাশ একদিন অবশ্যম্ভাবী। যাহাদের দ্বারা সে গঠিত, তাহারা আপন আপন মিশিবার জিনিস খুঁজিয়া লইবে—দুই দিনে আপনাদিগকে তাহাদের সহিত মিশাইবে—এ লাবণ্যময়, বলব্যঞ্জক, পরিপুষ্ট, যত্নে পরিমার্জ্জিত দেহের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—কোন চিহ্ন ও কেহ কখন দেখিতে পাইবে না। সকলই যাইবে, সকলই ফুরাইবে কেবল যাইব না—কেবল ফুরাইব না—আমি। দেহ যাইবে—দেহ আমার নহে—কয়েক দিনের জন্য তাহাতে বাসা লইয়াছি মাত্র। আমি থাকিব—বাসা লইয়াছিলাম বাসা গেল—আমি বাসা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব মাত্র। এই বিনশ্বর দেহ খাঁচা ছাড়িয়া অবিনাশী আত্মাপাখী কোথায় যায়? এ কথার পাকা জবাব কেহ দিতে পারে না। পাখী একবার উড়িলে আর সে ফিরিয়া আসে না—সে কোন দেশে যায় তাহাও কেহ অনুসন্ধান করিতে পারে না—

" The undiscovered country
From whose bourne no traveller returns——"

২। হিন্দু দার্শণিকগণ এই তত্ত্বের বিশদ মীমাংসার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন--এবং তাঁহাদের সে চেষ্টা অনেকাংশে সফল ও হইয়াছিল। তান্ত্রিক যোগীগণের মতে মানব দেহে সাতটী চক্র আছে ১ ম মস্তকে, ২ য় ভ্রূমূলে, ৩ য় কণ্ঠে, ৪ র্থ বক্ষে, ৫ ম নাড়ীতে, ৬ ষ্ঠ লিঙ্গমূলে, ৭ ম লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে (মুলাধারে)। ইংরাজীতে এই গুলিকে Centres of Nervous forces বলা যাইতে পারে। সন্তানোৎপাদন সময়ে মনুষ্য-দেহ হইতে একবিধ বীজ নিঃসৃত হয়। মূলাধার চক্র এই বীজের আধার স্থল। সেই বীজ জরায়ুতে যাইয়া অঙ্কুরিত, গঠিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং তাহা হইতে কিছু দিনে একটী নূতন জীবের উৎপত্তি হয়। এই নূতন প্রাণী যে শরীরীর বীজ হইতে উৎপন্ন, তাহার ন্যায় আকার, স্বভাব ও গুণদোষাদি প্রাপ্ত হয়! এই শরীরির প্রাণের অংশ, ঐ বীজে সঞ্চারিত হয় এবং সেই জন্যই উহা জরায়ুতে ক্রমে পরিপুষ্ট ও

বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। ঐ বীজ নিঃসরণ কালে ঐ শরীরীর জীবনী শক্তির হ্রাস হইয়া পড়ে, কিন্তু ঐ শক্তি একেবারে নিঃশেষিত হয় না। এমন এক সময় আছে যে সময় কোন প্রাণীর ভিতরকার জীবনী শক্তি টুকু সমস্তই ঐ রূপ বীজস্বরূপ পদার্থ অবলম্বন করিয়া কোন না কোন চক্রস্থান (মর্ম্মস্থান) ভেদকরতঃ বাহিরে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। এই জীবনী শক্তির নিঃসারণ ও আমার দেহবাসা ত্যাগ করণের নাম মরণ। মৃত্যু কালে যে বীজ অবলম্বনে জীবনীশক্তি টুকু সমস্ত বাহিরে নিঃসৃত হইয়া যায়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষদেহ বা লিঙ্গদেহ নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

৩। তান্ত্রিক যোগীগণ বলেন যে মূলাধার চক্রে পৃথ্বীবীজ, স্বাধিষ্ঠান চক্রে (লিঙ্গমূলে) জলবীজ, মণিপুর চক্রে (নাভিতে) অগ্নিবীজ, এবং অনহাত চক্রে (বক্ষে) বায়ুবীজ এবং কণ্ঠে বিশুদ্ধাখ্য চক্রে আকাশবীজ নিহিত আছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাঁহাদের মতে মূলাধারস্থ বীজ সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল এবং সেই জন্য স্থূলদেহ ধারীর জরায়ু ব্যতীত অন্য-স্থানে উহা পরিপুষ্ট হইতে পারে না। মৃত্যুর পরে লিঙ্গ শরীর বাহ্য বায়ুতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং সন্তানোৎপাদক স্থূলবীজ যে অবয়ব গঠনের জন্য দীর্ঘকাল সময় গ্রহণ করে, লিঙ্গশরীরীর সেই কার্য্যের জন্য অতি অল্প মাত্র সময় আবশ্যক করে, অর্থাৎ বাহ্য বায়ুতে স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার অবয়ব গঠিত হয়। এই অবয়ব সর্ব্বাংশে পরিত্যক্তাত্মা দেহধারীর আকারের অনু-রূপ। আমি যাহা ছিলাম, আমি তাহাই থাকিয়া যাই

—" রাম প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই।
তাই হবি তুই মরণ কালে ॥ "

৪। জরায়ুস্থ আকৃতির ন্যায় লিঙ্গ শরীরীর অবয়ব কোন পদার্থে গঠিত হয় না। এইরূপ অবয়ব প্রাপ্ত আত্মা বাহ্যবায়ুতে বিচরণ করিতে থাকে। সৃষ্টির যে সমুদয় পদার্থ বা ক্রিয়ার সহিত সে কোন না কোন আকর্ষণে বাঁধা ছিল বা আছে সেই সমুদয় ক্রিয়া বা পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবার জন্য প্রয়াস পায়। মনুষ্যে চেষ্টা করিলে সেই লিঙ্গ শরীরীর সহিত সংস্রবে আসিতে পারে। যে জীবের পরমাত্মার সহিত মিলনের জন্য একান্ত লিপ্সা, তাঁহার

সহিত নৈকট্য স্থাপনের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা সেই জীব মৃত্যুর পর লিঙ্গ শরীর অবলম্বনে পরমাত্মায় যাইয়া মিলিত হয়। যাহার সংসারে বড় বন্ধন, পরম মায়া, সে সংসারচক্রেই পরিভ্রমণ করিতে-থাকে, সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারে না। মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন, বান্ধব যিনিই স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তিনিই স্বানুরূপ অবয়বে স্থানান্তরে অবস্থান করিতেছেন, চেষ্টা করিলে এই স্থূল দেহীও সেই সূক্ষ্ম দেহীর সহিত সংসৃষ্ট হইতে পারে, এ কথা মনে হইলেও যেন পুলকিত হইতে হয়। ইউরোপের অনেক স্থলে এবং আমেরিকায় যে spiritualismএর কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা কেবল সেই লিঙ্গ শরীরীর সহিত সংস্রবে আসিবার চেষ্টা মাত্র।

৫। নিদ্রা মরণের রূপান্তর বা ভাবান্তর মাত্র। নিদ্রাকালে জীব তাহার নিজের সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে। স্থূল শরীরের সহিত সম্পর্ক অনেক কমিয়া যায়। স্থূল ইন্দ্রিয় সকলের ক্রিয়া স্থগিত থাকে এবং সেই সময়ে জীব যখন যে চক্রান্তস্থিত বীজে অবস্থিতি করে সেই অনুযায়ী ভাব সকল তাহার সমক্ষে প্রকৃত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। ইহারই নাম স্বপ্ন।

৬। সর্ব্ব জীবাত্মার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সেই নিরাকার চৈতন্যস্বরূপের চৈতন্যময়তার মধ্যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থেরই পূর্ণাদর্শ বিরাজমান আছে। এই সামান্য জীবাত্মা সেই অনন্ত পরমাত্মার অংশ; সেই চৈতন্যময়ের চৈতন্যময়তার অতি ক্ষুদ্রতর—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর—এতটুকু কণিকা পাইয়া এই জীবাত্মা চেতন; এই এতটুকু চেতন, তাঁহার তেজে তেজোবান্ কণিকামাত্রও সেই পরমাত্মার গুণপেত—ইহাতেও সেই পূর্ণাদর্শের একটু সামান্য আদর্শ আছে। আত্মা ও মনোবৃত্তির পরিস্ফুরণক্রমে এই ক্ষুদ্র আদর্শের মধ্যে যখন যে ভাব যে অংশ শরীর গত চক্রান্তস্থিত হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয় সেই ভাব আমাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির প্রত্যক্ষীভূত হয়। জাগ্রতাবস্থায় স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) ও নির্দ্ধারণ শক্তির (Volition) ক্রিয়া প্রবল থাকে। স্বপ্নাবস্থায় নির্দ্ধারণ শক্তি বদ্ধাবস্থায় অবস্থিত হয় সেই কারণবশতঃ, এবং ভাব পরম্পরা অনবরত অসংলগ্ন ভাবে মনোমধ্যে আসিয়া উদিত হয় সেই জন্য, স্বপ্ন অনেক স্থলে অমূলক বলিয়া বোধ হয়। নিদ্রাবস্থায় নির্দ্ধারণ শক্তি আবদ্ধ থাকে বলিয়া আত্মা তৎকালে যে চক্রান্তঃস্থিত

বীজে অবস্থিত থাকে সেই চক্রবীজ সম্বন্ধীয় ভাবে মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ অধিকার জন্মে।* মেসমেরিজম নামক ক্রিয়াতেও নির্দ্ধারণ শক্তি এইরূপ আবদ্ধাবস্থায় থাকে কিন্তু এই ক্রিযায় আত্মার আদর্শস্থিত ভাব চক্রান্তর্গত বীজে আপনাপনি স্ফূরিত না হইয়া মেসমেরাইজরের কৌশল বলে বিকশিত হইয়া থাকে।†

অনেক সময়ে এমন ঘটে যে, যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা এত পরিস্কার, এবং উহার অংশ সকল পরস্পর এরূপ সংলগ্ন যে নিদ্রাভঙ্গের পরও উহা সত্য দেখিলাম, কি স্বপ্ন দেখিলাম তাহা নির্ব্বাচন করা কঠিন হয়। এই সকল স্বপ্ন আমার কাছে নিতান্ত অমূলক চিন্তামাত্রে বলিয়া বোধ হয় না। লেখকের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জীবনে একবার এইরূপ অতি চমৎকার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (সামান্য সামান্য অনেক সত্য স্বপ্ন হইতে উদ্ধার করা যায় কিন্তু এটী বড় বিস্ময় জনক) তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

৮। একদিন স্বপ্নাবেশে বোধ হইল আমি আমার একটী অতি নিকট আত্মীয় ও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুর সহিত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। (স্বপ্ন দর্শনের প্রায় এক বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে আমার এই আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছিল) ভ্রমণের প্রথম আরম্ভ শয়ন গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানেই হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষনেক পরেই যেন আমরা এমন এক স্থানে উপস্থিত হইলাম যে তাহা জীবনে ইতিপূর্ব্বে কখন নয়নগোচর হয় নাই—হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে দৃশ্য সেই সময়েই সম্পূর্ণ নূতন দেখিলাম। স্থানটী অতি মনোরম—পরিষ্কার ময়দান—গড়ের মাঠের মত—ঘাসগুলি যেন মাথায় মাথায়

---

* In the dreaming state, the functions of volition are suspended. In a dream we are conscious of making an effort, the effort is spontaneous. See Mansel's Metaphysics Page 176.

† In the state of Mesmerism the volition is suspended as in sleep. In dreaming the mind follows the train of associations suggested by some leading idea. In mesmeric state the leading idea is conveyed from with out by the operator, instead of arising from within in the patients own mind. See the same Page 178.

সমান করিয়া ছাটা—মাঝে মাঝে বড় গাছ—ছোট গাছ বা লতাপাতা কিছুই নাই। স্থানে স্থানে ছোট ছোট পাকা ঘর, ঘরগুলিও বেশ পরিচ্ছন্ন। এই স্থানে যাইয়া মনে যেন বড় আনন্দ হইল, অনেকক্ষণ সেখানে বেড়াইলাম। আমার সহচারী মুক্তাত্মার সহিত এই দৃশ্য সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, অনেক পরে স্বপ্ন শেষ ও নিদ্রাভঙ্গ হইল স্থানটীর চিত্র মনোমধ্যে পরিস্ফুট রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল, বহু দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিলাম না (তখন স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তা মাত্র বলিয়াই বোধ ছিল)। এই স্বপ্ন দর্শনের প্রায় ২।৩ বৎসর পরে Bengal central Railawy line (যশোহরের রেল লাইন) খুলিল। এবং সেই রেল পথে প্রথম আরোহী হইলাম। দমদমা গোরা বাজার ষ্টেশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া কয়েক শত হস্ত মাত্র আসিলে রেল পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ময়দান দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র একেবারে চমকিত হইলাম, সমুদায় স্বপ্ন কথাগুলি পরিস্ফুট রূপে মনে আসিল। স্বপ্নে আমি আমার আত্মীয়ের মুক্তাত্মার সহিত এই স্থানেই ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এখানে আর কখন আসি নাই। আসিবার পথ বড় ছিল না। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দমদমার বারিকের মধ্যস্থ যে পথ দিয়া আমরা ইতিপূর্ব্বে যাতায়াত করিয়াছি সে পথ হইতে এ স্থান দেখা যায় না। তবে কি স্বপ্নে মুক্তাত্মার সহিত ভ্রমণ করার কথার কোন মূল আছে? অনেক সময়ে শুনা যায় যোগীগণ যোগবলে স্থূল দেহ ত্যাগ করতঃ সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বন পূর্ব্বক স্থানান্তরিত হইয়া থাকেন। আধুনিক Theosophy শাস্ত্রানুশীলকগণ এরূপ বৃত্তান্ত অবিশ্বাস করেন না। যোগবলে এরূপ হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রবল নৈকট্যবশতঃ আত্মার সম্পূর্ণ বেগবলে যে লিঙ্গ শরীর স্থূল দেহ পরিত্যাগ করতঃ অপর স্থানে যাইতে পারে না এরূপ কথাও নিতান্ত অসম্ভব ও অগ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালিদাসের উপমা।

রঘুবংশে নবম সর্গের এক স্থানে বসন্তের বর্ণনা আছে। কুমারসম্ভবে সংযমী-শ্রেষ্ঠ ধ্যানরত মহাদেবের ধৈর্য্যচ্যুতিসম্পাদনে উদ্‌যোগী কুসুমায়ুধের সাহায্যার্থে অকালে সমুদ্গত বসন্তের যে মনোহারিণী বর্ণনা আছে, রঘু-বংশের এই বসন্তবর্ণন সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী। ভাষা, লালিত্য, বাক্যবিন্যাস-নৈপুণ্য, উপমাকৌশল প্রভৃতি গুণে ইহা অতুলনীয়। অংশবিশেষ এখনকার মার্জ্জিত রুচির বিরুদ্ধ হইতে পারে—বাদসাদ দিয়া আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম—

নয়গুণোপচিতামিব ভূপতেঃ
সদুপকারফলাং শ্রিয়মর্থিনঃ।
অভিযযুঃ সরসো মধুসম্ভৃতাম্
কমলিনীমলিনীরপতত্রিনঃ॥

শৌর্য্যাদি গুণকর্তৃক উপচিতা সদুপকার রূপ ফলপ্রসবিনী রাজশ্রীর প্রতি —অর্থিগণের ন্যায়, বসন্ত কর্তৃক সম্যক পুষ্টা, সরোবরে প্রস্ফুটিতা, কম-লিনীর প্রতি ভ্রমর এবং হংস সকল ধাবিত হইল।

বিরচিতা মধুনোপবনশ্রিয়াম্
অভিনবা ইব পত্রবিশেষকাঃ।
মধুলিহাং মধুদানবিশারদাঃ
কুরবকা রবকারণতাং যযুঃ॥

বসন্ত কর্তৃক বিরচিত, উপবনলক্ষ্মীর অভিনব পত্ররচনার ন্যায় প্রতীয়মান, মধুদানে বিশারদ তরুসমূহ ভ্রমরগণকে রব করাইতে লাগিল। ভ্রমরগণ মধু-পানে তৃপ্ত হইয়াই যেন মধুদাতা তরুগণের গুণগান করিতে আরম্ভ করিল।

অভিনয়ান্ পরিচেতুমিবোদ্যতা
মলয়মারুতকম্পিতপল্লবা।
অমদয়ৎ সহকারলতা মনঃ
সকলিকা কলিকামজিতামপি॥

কলিকাবিশিষ্ট সহকারলতা অভিনয় অভ্যাসকরণ মানসেই যেন মলয়মারুত কর্ত্তৃক কম্পিতা হইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরও মনকে মত্ত করিতে লাগিল।

শ্রুতিসুখভ্রমরস্বনগীতয়ঃ
কুসুমকোমলদন্তরুচো বভুঃ।
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ
কিসলয়ৈঃ সলয়ৈরিব পাণিভিঃ॥

শ্রবণসুখকর ভ্রমরঝঙ্কাররূপ সঙ্গীতকারিণী, কুসুমকোমল দন্তকান্তিবিশিষ্টা (হাস্যমুখী) উপবনান্তলতা পবনকম্পিত কিসলয়ের দ্বারা লয়যুক্ত করসঞ্চালনের শোভা দেখাইতে লাগিল।

শুশুভিরে স্মিতচারুতরাননাঃ
স্ত্রিয়ইব শ্লথশিঞ্জিতমেখলাঃ।
বিকচতামরসা গৃহদীর্ঘিকাঃ
মদকলোদকলোলবিহঙ্গমাঃ॥

বিকসিত পদ্মশোভী—অব্যক্তমধুরগায়ী উদকলোল বিহঙ্গমসঙ্কুল গৃহদীর্ঘিকা সকল, সুন্দর হাস্যমুখী লোলশিঞ্জিত মেখলাশোভিনী রমণীর ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিল।

উপযযৌ তনুতাং মধুখণ্ডিতা
হিমকরোদয়পাণ্ডুমুখচ্ছবিঃ।
সদৃশমিষ্টসমাগমনির্বৃতিম
বনিতয়ানীতয়া রজনীবধূঃ॥

বসন্তখর্ব্বা, চন্দ্রোদয়ে পাণ্ডুবর্ণমুখচ্ছবি রজনীবধূ, প্রিয়সমাগমসুখে হতাশা বনিতার ন্যায়, ঋজুতা প্রাপ্ত হইল।

উপচিতাবয়বা শুচিভিঃ কণৈঃ
অলিকদম্বযোগমুপেয়ুষী।
সদৃশকান্তিরলক্ষত মঞ্জরী—
তিলকজালকজালকমৌক্তিকৈঃ॥

শুভ্র রজঃসমূহে পুষ্টাবয়বা, অলিকদম্বযোগপ্রাপ্তা তিলকবৃক্ষোত্থিতা মঞ্জরী, রমণীগণের অলকাভরণবিশেষে মুক্তার সদৃশ শোভা ধারণ করিল।

প্রথমমন্যভৃতাভিরুদীরিতাঃ
প্রবিরলা ইব মুগ্ধবধূকথাঃ।
সুরভিগন্ধিষু শুশ্রুবিরে গিরঃ
কুসুমিতাসু মিতা বনরাজিষু॥

সুরভিগন্ধি, কুসুমিত বনস্থলীসমূহে কোকিলার পরিমিত প্রথম ঝঙ্কার, মুগ্ধ-বধূর প্রবিরল কথার ন্যায়, শ্রুত হইতে লাগিল।

কুমারে—

চূতাঙ্কুরাস্বাদকষায়কণ্ঠঃ
পুংস্কোকিলো যন্মধুরং কুকূজ।
মনস্বিনীমানবিঘাতদক্ষম্
তদেব জাতং বচনং স্মরস্য॥

অলিভিরঞ্জনবিন্দুমনোহরৈঃ
কুসুমপংক্তিনিপাতিভিরঙ্কিতঃ।
ন খলু শোভয়তি স্ম বনস্থলীম্
ন তিলকস্তিলকঃ প্রমদামিব॥

কুসুমশ্রেণীতে পতনশীল সুন্দর কজ্জল কণার ন্যায় ভ্রমরগণ কর্তৃক চিহ্নিত তিলক বৃক্ষ, প্রমদাকে তিলক রাগের ন্যায়, বনস্থলীকে শোভিত করে নাই এমন নহে।

কুমারে—

লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনভক্তিচিত্রম্
মুখে মধুশ্রী তিলকং প্রকাশ্য।
রাগেণ বালারুণকোমলেন
চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার॥

বসন্তশ্রী, কজ্জল রচনার ন্যায়, উপবিষ্ট ভ্রমরগণ কর্তৃক বিচিত্রীকৃত তিলক-বৃক্ষরূপ তিলকরাগ মুখে ধারণ করিয়া প্রভাত সূর্য্যের কিরণরাগে চূত প্রবালোষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন।—

হুতহুতাশনদীপ্তি বনশ্রিয়ঃ
প্রতিনিধিঃ কনকাভরণস্য যৎ।
যুবতয়ঃ কুসুমং দধুরাহিতম্
তদলকে দলকেশরপেশলম্॥

কুমারে—

বর্ণপ্রকর্ষেসতি কর্ণিকারম্
দুনোতিনির্গন্ধতয়া স্ম চেতঃ।
প্রায়েণ সামগ্যবিধৌ গুণানাম্
পরাঙ্মুখী বিশ্বসৃজঃ প্রবৃত্তিঃ॥

রঘুবংশে বনশ্রীর স্বর্ণালঙ্কারের প্রতিনিধি স্বরূপ কর্ণিকার কুসুম হুতহুতাশন-দীপ্তিতে রূপের ছটা বিকাশিত করিতেছে—নায়কেরা অতি যত্নসহকারে উহা আহরণ করিয়া প্রণয়িনীগণের অলকের অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে। আর কুমারের কর্ণিকার কুসুম কেবল বর্ণের উৎকর্ষ মাত্র দেখাইতেছে, হায়! এমন সুন্দর কুসুমে গন্ধ নাই! বিশ্বস্রষ্টা অনেক সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু একটীকেও সম্পূর্ণ গুণশালী করেন নাই। পাঠক দুইটী কবিতা তুলনা করিয়া দেখিবেন—একটী যৌবনসুলভ উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুখসঙ্গীত—অপরটী সংসারের অসম্পূর্ণতায় অসুখী বৃদ্ধের বিষাদ গীতি।—

রাবণের দৌরাত্ম্যে পীড়িত দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন করিলেন—

তস্মিন্নবসরে দেবাঃ পৌলস্ত্যোপপ্লুতা হরিম্।
অভিজগ্মুর্নিদাঘার্ত্তাঃ ছায়াবৃক্ষমিবাধ্যগাঃ॥

গ্রীষ্মপীড়িত পথিকেরা যেমন ছায়াবৃক্ষের নিকট গমন করে তদ্রূপ।

প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥

এই শ্লোকে বিষ্ণুর সহিত শারদীয় দিবসের তুলনা করা হইতেছে। বিষ্ণু প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষ—বিকসিত কমললোচন, বালাতপনিভাংশুক—পীতাম্বরধর, প্রারম্ভসুখদর্শন—যোগীগণের সুখদর্শন। শারদীয় দিবসও প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ—বিকসিত কমল উহার লোচন স্বরূপ, বালাতপনিভাংশুক—বালসূর্য্যরশ্মি

উহার পরিধেয় বসনস্বরূপ, প্রারম্ভসুখদর্শন—প্রভাতে মনোহর। এরূপ সম্পূর্ণ উপমা সচরাচর দেখা যায় না।

বাহুভির্বিটপাকারৈ র্দিব্যাভরণভূষিতৈঃ।
আবির্ভূতমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্॥

দিব্যাভরণভূষিত শাখাসদৃশ বাহুচতুষ্টয়ে উপলক্ষিত (বিষ্ণু) সমুদ্রমধ্যে আবির্ভূত দ্বিতীয় পারিজাত বৃক্ষের ন্যায়।

বভৌ সদশনজ্যোৎস্না সা বিভোর্বদনোদ্গতা।
নির্যাতশেষা চরণাৎ গঙ্গেবোর্দ্ধপ্রবর্ত্তিনী॥

বিষ্ণুর মুখনিঃসৃতা দন্তকান্তিসংযুক্তা সেই (ভারতী) চরণনিঃসৃতাবশিষ্টা ঊর্দ্ধপ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় শোভিতা হইল।

তেষাং দ্বয়োর্দ্বয়োরৈক্যং বিভিদে ন কদাচন।
যথা বায়ুবিভাবস্বোঃ যথা চন্দ্রসমুদ্রয়োঃ॥

উহাদের দুই দুই জনের (রামলক্ষ্মণের এবং ভরতশত্রুঘ্নের) ঐক্য, বায়ু-বিভাবসুর এবং চন্দ্র-সমুদ্রের সংযোগের ন্যায়, কখন বিভিন্ন হয় নাই।

সুরগজইব দন্তৈর্ভগ্নদৈত্যাসিধারৈঃ
নয় ইব পণবন্ধব্যক্তযোগৈরুপায়ৈঃ।
হরিরিব যুগদীর্ঘৈর্দোর্ভিরংশৈস্তদীয়ৈঃ
পতিরবনিপতীনাং তৈশ্চকাশে চতুর্ভিঃ॥

দৈত্যগণের অসিধারব্যর্থকারী দন্তচতুষ্টয়ের দ্বারা—ঐরাবতের ন্যায়, ফলসিদ্ধ্যনুমিতপ্রয়োগ সামপ্রভৃতি উপায় চতুষ্টয়ের দ্বারা—নীতির ন্যায়, এবং যুগপদ্দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয়ের দ্বারা—বিষ্ণুর ন্যায়, বিষ্ণুতেজাংশসম্ভূত সেই পুত্র চতুষ্টয়ের দ্বারা—রাজরাজ দশরথ শোভা পাইয়াছিলেন।

হরধনুর্ভঙ্গে রুষ্ট পরশুরাম মিথিলার পথে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইনি শান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় উগ্রস্বভাব।

পিত্র্যমংশমুপবীতলক্ষণং
মাতৃকঞ্চ ধনুরূর্জ্জিতং দধৎ।

যঃ সসোম ইব ঘর্ম্মদীধিতিঃ
সদ্বিজিহ্ব ইব চন্দনদ্রুমঃ॥

উপবীত চিহ্নিত পিত্র্যাংশ এবং ধনুরুর্জ্জিত মাতৃকাংশ ধারণ করায় যিনি (ভার্গব) চন্দ্রসংযুক্ত সূর্য্যের ন্যায় এবং সর্পবেষ্টিত চন্দনতরুর ন্যায় প্রতীয়মান।

পরশুরাম বলিলেন—

ক্ষত্রজাতমপকারবৈরি মে
তন্নিহত্য বহুশঃ শমং গতঃ।
সুপ্তসর্প ইব দণ্ডঘট্টনাৎ
রোষিতোঽস্মি তববিক্রমশ্রবাৎ॥

ক্ষত্রিয়েরা অপকারহেতু আমার বৈরি—অনেকবার উহাদের নিধনসাধন করিয়া আমি শমতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি তোমার বিক্রম শ্রবণে দণ্ডতাড়িত সুপ্তসর্পের ন্যায় রুষ্ট হইয়াছি।

বিদ্ধিচাত্তবলমোজসা হরেঃ
ঐশ্বরং ধনুরভাজি যত্ত্বয়া।
খাতমূলমনিলো নদীরয়ৈঃ
পাতয়ত্যপি মৃদুস্তটদ্রুমম্॥

জানিও, তুমি যে হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ বিষ্ণুর তেজে উহা হৃতসার ছিল। নদীর বেগে উৎখাতমূল তটবৃক্ষকে সামান্য বায়ুও পাতিত করিতে পারে:

তাবুভাবপি পরস্পরস্থিতৌ
বর্দ্ধমান পরিহীনতেজসৌ।
পশ্যতি স্ম জনতা দিনাত্যয়ে
পার্ব্বণৌ শশিদিবাকরাবিব॥

সেই পরস্পরাভিমুখী বর্দ্ধমানতেজসম্পন্ন (রামকে) এবং হীনপ্রভ (ভার্গবকে) লোকে পূর্ণিমার দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় দেখিল।

বসন্ত।

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি' উঠিল প্রাণ!
নব কিসলয়ে সাজি' পরাণে উছাস ব'য়ে
তরুকুল ওঠে জাগি বিচিত্র নিশান ল'য়ে ;

শীতল মলয় বায়
সুধীরে বহিয়া যায়,

নিশাসে নিশাসে করে ভূতলে সুরভি দান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

অলস শয়ন ত্যজি' পাখীরা জাগিল সব.
কোথা হ'তে ভেসে এল কত-কি-যে সুধারব ;

নন্দনের পথ ভুলে
সমীরণে দুলে দুলে

স্বপনে ভাসিয়ে এল কোকিলের কুহু তান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

সুদূর নিকুঞ্জ হ'তে শুনিয়ে এ কা'র বাঁশী,
আলো করি' বনালয় ফোটে ফুল রাশি রাশি ;

সুবাসে মোহিত অলি
ফুলে ফুলে পড়ে ঢলি',

প্রজাপতি করে সুখে ফুলে ফুলে মধুপান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

তুলিল কমলমুখ, নলিনী হরষ মাখি',
নবীন তৃণের বনে হরিণী সঁপিল আঁখি ;

তটিনী গায়িল ধীরে,
জোছনা হাসিল নীরে,

চাঁদের বদন হ'তে হিমছায়া অবসান—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান,
মেলিয়া অলস আঁখি চমকি' উঠিল প্রাণ!

আকাশে নবীন রবি,
প্রান্তরে নবীন ছবি,

নবীন নবীন সবি, নবীনে ডুবিল প্রাণ—
নীরস শীতের গৃহে আজি কে গায়িল গান!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শান্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিন যায়। একটি দুইটি করিয়া জীবনের কত দিনই চলিয়া গিয়াছে—আজি-কার দিনও যায়। দিন যায়, আবার দিন আইসে; কিন্তু যে দিনটি যায় সেটি আর আইসে কি? সেটি আর আইসে না; এ কথা কেনা বুঝে, কেনা জানে? কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন সূর্য্যদেবের অস্তগমন, বা সায়ংসন্ধ্যার সমাগম দৃষ্টে সংসারের কয় জন ইহা মনে করে? দিন তো যায়—আজিকার দিনও চলিল; কিন্তু বল দেখি প্রতিদিন, যাইবার সময়ে, আমাদিগকে কি বলিয়া যায়? সায়ংকালের বিহঙ্গম কূজন, অস্তোন্মুখ দিবাকরের আরক্ত লোচন, তামসী নিশার অগ্রদূতীগণের অপাঙ্গ দৃষ্টি, আমাদের বলিয়া দেয় না কি,—'হে মানব, এ ভবরঙ্গ ভূমে তুমি যে কয়দিনের জন্য লীলা খেলা করিতে আসিয়াছ তাহার একটি দিন অদ্য কমিয়া গেল।' এ চৈতন্য—এ অবশ্য-ম্ভাবী সহজ জ্ঞান যদি মানবের থাকিত, প্রকৃতির এই দৈনন্দিন উপদেশ যদি মানব প্রণিধান করিত, তাহা হইলে মানুষ এত দিনে দেবত্ব লাভ করিত এবং সংসার শান্তি ও পুণ্যের নিকেতন হইত।

কিন্তু আমরা বলিতে বসিয়াছি, দিন যায়। পুণ্য-সলিলা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষ ভেদ করিয়া দেশ বিদেশের কতই নৌকা চলিতেছে। হেলিতে দুলিতে ছোট বড় কতই তরণী গঙ্গাবক্ষে ভাসিতেছে। সন্ধ্যা হইলে নৌকায় নৌকায় প্রদীপ জ্বলিল। সেই আলোকের প্রতিবিম্ব জলে পড়িয়া জলমধ্যে প্রকাণ্ড আলোক-রেখা বিরচিত হইল। নৌকা ছুটিতেছে—জল-মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে তাহার আলোকাভাও ছুটিতেছে। জলমধ্যে অগ্নি খেলি-তেছে, কাঁপিতেছে, দুলিতেছে ও ছুটিতেছে। দুই বিধর্ম্মী জড়ের অদ্ভুত মিলন! ঝির ঝির করিয়া বারিকণা-সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল বসন্ত বায়ু বহিতেছে। অদ্য পূর্ণিমা। আকাশে তারা-দল-সম্বেষ্টিত শশধর, পারিষদ ও অনুচর

পরিবৃত নরপতির ন্যায় বিকসিত। সন্নিহিত গ্রামের দেবালয় হইতে সান্ধ্য দেবারতির বাদ্য-ধ্বনি সমুত্থিত ও নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে সুদূরস্থিত এক নৌকা হইতে দুইজন মাঝি সমস্বরে গীত ধরিল,—

"ও যে চন্দন কাঠের না,
ডুবেও ডোবে না,
ও সে হাল ধরে রয়েছে রে তার পরমা গোয়ালা।"

কি মধুর, কি অপূর্ব্ব, কি হৃদয়দ্রবকর! সেই অপূর্ব্ব গীত-ধ্বনি জাহ্নবীর পবিত্র বক্ষে নাচিতে নাচিতে, সেই সুস্নিগ্ধ মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলের সহিত খেলিতে খেলিতে, সেই চন্দ্রমার সুনির্ম্মল কররাশির সহিত মিশিতে মিশিতে তথায় অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সংগঠিত করিল। সেই ক্ষেত্রে তখন সুন্দরে সুন্দরে সৌন্দর্য্য সমষ্টির সুন্দর সম্মিলন হইল। সুন্দর শশধর, সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ, সুন্দর আলোকমালা, সুন্দর চন্দ্রকররাশি, সুন্দর নাবিকসঙ্গীত, সুন্দর জাহ্নবীজল, সুন্দর বসন্তানিল। বিধাতা সকলকে এই সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার সমান ক্ষমতা দেন নাই। যে ভাগ্যবান তাহা ভোগ করিতে সক্ষম, তিনি আপনার চিত্ত সেই মোহকর রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়া অবাক হইয়া রহিলেন।

গুর্ব্বিনী নারীর ন্যায় পণ্যভার সমাকুলিত নৌকাসমূহ মন্থর গতিতে চলিতেছে। এ জগতে যাহার বোঝাই হাল্কা তাহার চাল চলনও হাল্কা। হাল্কা নৌকা সকল ফর ফর করিয়া চলিতেছে। কিন্তু সকল নৌকার কথায় আমাদের কাজ কি? সম্মুখে ঐ যে নৌকাখানি ধীরে ধীরে যাইতেছে তাহাতে যে পুরুষ ও স্ত্রী বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কথাই আমরা এক্ষণে বলিব। সেই নৌকার আরোহী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নী সুকুমারী দেবী। রমাপতির বয়স ২৩।২৪ এবং সুকুমারীর বয়স অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়াছে বোধ হয় না। কাটোয়া নামক গ্রামে রমাপতি মাসিক পাঁচিশটি টাকা মাত্র বেতনে স্কুল মাষ্টারি করেন। এরূপ অবস্থার লোকে পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে থাকে না। কিন্তু কোন দিকে আর কেহ আপনার লোক না থাকায় রমাপতি সুকুমারীকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে অক্ষম। এই যুগলে বিধাতার অপূর্ব্ব সম্মিলনকৌশল অপূর্ব্বরূপ পরিস্ফুট

হইয়াছে। পুরুষ রমাপতি পৌরুষ শোভার আদর্শ এবং নারী সুকুমারী কামিনীকুল-কমলিনী। ক্ষুদ্র নৌকা এই দুই সৌন্দর্য্যসার বক্ষে লইয়া বুক ফুলাইয়া ভাসিতেছে। সুকুমারী নিরাভরণা, তাঁহার প্রকোষ্ঠে কালো হাড়ের চুড়ি ভিন্ন অন্য ভূষণ নাই। কিন্তু কি সুন্দর! সেই সুগোল হস্তে—সেই স্বর্ণবর্ণ সুকুমারীর সুকুমার প্রকোষ্ঠে সেই কৃষ্ণভূষণ কি সুন্দরই দেখাইতেছে! আর রমাপতি? তাঁহার সেই বিশাল বক্ষে অতি শুভ্র যজ্ঞোপবীত হেলিয়া দুলিয়া কত শোভাই পাইতেছে। ভূষণ নামে বর্ত্তমান কালে যে সকল সামগ্রী ব্যবহৃত হয় তাহাতে এমন অপার্থিব সৌন্দর্য্য বাড়ায় কি কমায় তাহা বিশেষ বিচার্য্য কথা। ভূষণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের সহায়তা করে। যাহার যাহা নাই তাহারই তাহা পাইবার জন্য সহায়তার আবশ্যক হয়। যাহাদের রূপ নাই, অথবা রূপের অভাব আছে বলিয়া যাহারা জানে, অলঙ্কার তাহাদের সহায়। কিন্তু এস্থলে—যেখানে রূপ পূর্ণিমার চাঁদের মত পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত, সেখানে ছার ভূষণের কি প্রয়োজন?

রমাপতি দরিদ্র, তাঁহার সাত রাজার ধন সুকুমারীকে লইয়া তিনি আনন্দে আপনার জন্মভূমি—পিতৃপিতামহাদির নিবাসস্থান হুগলিতে ফিরিতেছেন। নৌকামধ্যে একটী কাঠের বাক্স, দুইটী কাপড়ের মোট, কয়েক খানি লেপ ও তোষক, দুইটী বালিস এবং কিছু পিত্তল ও কাংস্যপাত্র রমাপতি ও সুকুমারীর বিষয় বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

সুকুমারী জিজ্ঞাসিলেন,

"উপর হইতে যে আরতির বাজনা শুনিতেছি, ও কোন্ গ্রাম?

রমাপতি উত্তর দিলেন,

"শান্তিপুরের নাম কখন শুনিয়াছ কি? মেয়ে মানুষ শান্তিপুরের বড় ভক্ত; কারণ শান্তিপুর তাহাদের জন্য পুরুষ ভুলাইবার ফাঁদ তৈয়ার করিয়া দেয়। শান্তিপুরের উলঙ্গিনী সাড়ী নামেও যা, কাজেও তা। যাহারা কাপড় পরিয়াও উলঙ্গ থাকিতে চাহে তাহারা, এখানকার তাঁতিদের আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, উলঙ্গিনী সাড়ী পরিয়া রূপের বাঁধন খুলিয়া দেয়। এই সেই শান্তিপুর। এখন তোমার জন্য সেই হাবুডুবু খাওয়ান, মন মজান সাড়ী একখানি সংগ্রহ করিতে হইবে কি?"

সুকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা কর। যদি তোমার হাবুডুবু খাওয়ার এখনও বাকী থাকে, যদি তোমার মন এখনও পুরাপুরি না মজিয়া থাকে তাহা হইলে কাজেই সে জন্য কলকৌশল সন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু কাপড়ে তাহার কি করিবে? কাপড় অলঙ্কার প্রভৃতি সামগ্রী বাহিরের শোভা বাড়ায়। কেবল বাহিরের শোভাতে কেবল বাহিরই মজে। সে মজা, সে হাবুডুবু কেবল নেশাখোরের নেশা। দুদিনেই তাহার শেষ হয়।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,

"তবে তুমি চাও কি?"

সুকুমারী সগর্ব্বে উত্তর দিলেন,—

"আমি যাহা পাইয়াছি।"

রমাপতি প্রীতিপূর্ণ হাসির সহিত বলিলেন,—

"তুমি পাইয়াছ কি? আমি তো দেখি তুমি কেবল সংসারের ক্লেশ ভুগিতে আসিয়াছ, মনের সাধে তাহাই ভোগ করিতেছ। আর আমার ভালবাসা? সত্য কথা বলিব নাকি? তুমি ছাড়া আর সকলকেই আমি খুব ভালবাসি।"

সুকুমারী বলিলেন,—

"আমার উপরে জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার এমনই নিগ্রহ থাকে। আমি জানি, তোমার যে ভালবাসার আমি অধিকারিণী জগতে নারীজন্ম লাভ করিয়া আর কখন কেহ তেমন প্রেম ভোগ করিতে পায় নাই। কত শত রাজরাণীর দশা দেখিয়া আমি হাসিয়া মরি। তাহারা সংসারে আসিয়া কতকগুলা সোণার ঢেলা গায়ে জড়াইয়া হাসিয়া বেড়ায়। কিন্তু যে অমূল্য সোণার শিকলে ইহলোক ও পরলোক বাঁধা আছে তাহা তাহারা জানিতেও পায় না। আমার কষ্টের কথা বলিতেছ? হে মধুসূদন, তোমার পাদপদ্মে দাসীর এই প্রার্থনা, যে যত বার আমাকে এই মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে, তত বারই যেন আমি এইরূপ কষ্টই পাই।"

সুকুমারীর চক্ষু জলভারাকুল হইল। রমাপতি মনে মনে বলিলেন,—

"হে ভগবন্, আমি কি তপস্যার বলে, কোন্ সুকৃতির ফলে এই দেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছি? সার্থক আমার জন্ম, সার্থক আমার দেহ। আমি তো ঐ দেবীর দাস।" সুকুমারী আবার বলিলেন,—

"আর তোমার ভালবাসার কথা তুমি নিজে কি বুঝিবে? যে যাহা ভোগ-করে সেই তাহা বুঝে। তোমার ভালবাসা বুঝাইয়া বলিবার কথা নাই। আমার রক্ত মাংস, মন প্রাণ তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া রহিয়াছে। হে নারায়ণ, কি পুণ্যে আমার এ সুখ? এ অধম নারীর প্রতি তোমার এ কি অতুল কৃপা?"

নৌকা চলিতে লাগিল। চাকদহের নীচে মাঝিরা রাত্রের মত নৌকা লাগাইয়া রাখিবে স্থির করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহসা পশ্চিম গগনে একটু কালো মেঘ দেখা দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু ঝড়ও উঠিল। রমাপতি মাঝিদিগকে নৌকা না চালাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা সামান্য ঝড় বুঝিয়া নৌকা লাগাইয়া রাখিবার কোনই দরকার মনে করিল না। চাকদহের এদিকে নৌকা লাগা-ইতে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। সুতরাং তাহারা রমাপতির কথা না শুনিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল।

সুকুমারী বলিলেন, "ঝড়ও উঠিয়াছে, মেঘও হইয়াছে। চাকদহ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে যদি ঝড় খুব বাড়িয়া উঠে তাহা হইলে কি হইবে?"

রমাপতি বলিলেন, "তাহা হইলে নৌকা ডুবিয়া যাইবে, সেটা কি বড়ই ভয়ের কথা নাকি?"

সুকুমারী বলিলেন,—"ভয়ের কথা নহে সত্য। কারণ তোমার সাক্ষাতে তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে মরিব তাহার অপেক্ষা ভাগ্য আর কি আছে? কিন্তু মরণের পর তোমার কাছে তো আর থাকিতে পাইব না।"

রমাপতি কহিলেন,—“মরণ যদি তোমার হয় তাহা হইলে আমারই কি জীবন থাকিবে পাগলিনি? আজিকার ঝড়ে যদি নৌকা ডুবিয়া যায় তাহা হইলে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি। আমরা জীবনে ও মরণে একই থাকিব। আজি যদি দেবতা আমাদের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি করিবার অধিকার নাই। কিন্তু এটুকু তুমি স্থির জানিও, যে আমরা উভয়ে একসঙ্গে ডুবিব, একসঙ্গে যাতনা ভোগ করিব, একসঙ্গে এই ধূলার দেহ ছাড়িব, উভয়ে একসঙ্গে ইহার অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ দেহ ধরিব, তাহার পর উভয়ে একসঙ্গে এই যন্ত্রণার রাজ্য ছাড়িয়া পরম আনন্দরাজ্যে বেড়াইব ও সকল আনন্দের যিনি মূল এবং সকল প্রেমের যিনি নিদান উভয়ে একসঙ্গে সেই সর্ব্বফল দাতার গুণ গান করিব। অতএব মরণে আমাদের দুঃখের কথা কি আছে?”

সুকুমারী কোন উত্তর দিলেন না; কিন্তু রমাপতির নিকটে আর একটু সরিয়া আসিলেন। ক্রমে ঝড় আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল; মেঘে সমস্ত গগন ছাইয়া গেল; সেই শোভাময় চন্দ্রতারা কোথায় লুকাইল, এবং প্রকৃতি অতি বিকট বেশে সাজিয়া দাঁড়াইল। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ছড়াইয়া অট্টহাসি হাসিতে লাগিল। প্রবল বাত্যার শাঁ। শাঁ। শব্দে এবং মেঘের তীব্র গর্জ্জনে সেই রণোন্মাদিনী হুঙ্কারিতে লাগিল। মাঝিরা নৌকা স্থির রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু বিফল সে চেষ্টা। নদীবক্ষে বড় বড় ঢেউ উঠিল। সেই সকল তরঙ্গের জল নৌকার উপরেও উঠিতে লাগিল। মাঝিরা আগে কথা শুনে নাই, এখন নৌকা তীরে আনিবার জন্য কত চেষ্টাই করিতে লাগিল। কিন্তু নৌকাচালনা তাহাদের পক্ষে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল। রমাপতি সকলই জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। তিনি মাঝিদের জিজ্ঞাসিলেন,—

“গতিক কি?”

প্রধান মাঝি বলিল,—

“ঠাকুর, গতিক বড় মন্দ। এখন যা হয় কর।”

সুকুমারীর চক্ষু বাহিয়া তখন ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। তিনি তখন দুই কর ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"হে অনাথনাথ, হে দীনবন্ধু, আমি মরি তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু দয়াময়, এই কর যেন আমার ঐ দেবতা, আমার ঐ গুরুর গুরুর কোন বিপদ না ঘটে। আমার মত একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মরা বাঁচায় সংসারের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, কিন্তু ভক্তবৎসল দয়াময়, আমার ঐ দেবতা অসময়ে সংসার ত্যাগ করিলে তোমার রাজ্যের অনেক ক্ষতি হইবে। হে মধুসূদন, প্রেমে যাঁহার হৃদয় পূর্ণ তিনি যদি থাকিতে না পান তবে সংসারে থাকিবে কি? হে বিপন্নবান্ধব, এ অধম নারী তোমার চরণে আর কখন কোন ভিক্ষা চাহে নাই। তুমি কাতরের সহায়, আজি তুমি এ অধম নারীকে এ ভিক্ষা দিবে না দয়াময়? দিবে, দিবে, অবশ্যই দিবে।"

তাহার পর রমাপতির দিকে ফিরিয়া সুকুমারী তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—

"আমার সর্ব্বস্ব, তুমি তো মরিতে পাইবে না। যিনি এই ভবনদীর প্রধান কর্ণধার আমি সেই দয়াময় হরির চরণ ধরিয়া কাঁদিয়াছি। তিনি তোমাকে রাখিবেনই রাখিবেন। আমাকে তুমি যত ভালবাস তাহা স্মরণ করিয়া দেখ। আমার কোন্ প্রার্থনা তুমি কবে না শুন? এই অন্তিমকালে হে স্বামিদেব, তোমার চরণে আমার এক প্রার্থনা আছে। তুমি তাহা রক্ষা করিবে জানিলে আমি হাসিতে হাসিতে মরি। আমি মরিয়া যাওয়ার পর তোমাকে আবার বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে।"

রমাপতি তখন সুকুমারীকে সস্নেহে প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"চল সুকুমারি, নৌকার ছাতের উপর গিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব শুন।"

তাহার পর উভয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বাহিরে আসিলেন। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"শুন দেবি, তোমাকে চিরদিন দেবীই জানিয়া কায়মনোবাক্যে তোমার উপাসনা করিয়াছি। আজি যদি তোমারই মরণ হয় তাহা হইলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিব কেন? এই তোমাকে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি এখনই নৌকা ডুবে, তাহা হইলে জানিও, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার দেহে শেষ নিশ্বাস রহিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বাঁচাইতে যত্ন

করিব। কিন্তু তাহাতেও যদি তোমাকে বাঁচাইয়া উঠিতে না পারি, তাহা হইলে জানিবে তোমারও যে গতি আমারও সেই গতি।"

সুকুমারী একটা উত্তর দিবার ইচ্ছা করিলেন কিন্তু তখনই একটা অতি ভয়ানক বাত্যা আসিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। সুকুমারীর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

নৌকা তো ডুবিয়া গেল, কিন্তু কোথায় রমাপতি—কোথায় সুকুমারী? ঐ যে—ঐ যে রমাপতি সেই তরঙ্গায়িত জাহ্নবী-বক্ষে সুকুমারীকে পৃষ্ঠে লইয়া সাঁতার দিতেছে। কখন জল তাঁহাদের উপর দিয়া চলিতেছে, কখন তাঁহারা জলের উপর দিয়া চলিতেছেন। নিবিড় অন্ধকার চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। কোথায় কোন্ দিকে যাইতেছেন তাহা রমাপতি জানেন না। প্রবল ঝড়ে ও খর-স্রোতে কখন বা তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া দিতেছে, কখন বা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। অনবরত জলোচ্ছ্বাস তাঁহাদের মুখে আসিয়া লাগিতেছে ও উদরস্থ হইতেছে। তথাপি রমাপতি পূর্ণ উদ্যমে সকল বিঘ্নের সহিত ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে যে ভার রহিয়াছে তাহার কল্যাণকামনায় তিনি কোন বিপদকেই বিপদ বলিয়া মনে করিতেছেন না। কিন্তু সকল বিষয়েরই সীমা আছে। মানব দেহের ক্ষমতাদিরও একটা সীমা আছে সন্দেহ নাই। বহুক্ষণ এইরূপ বিজাতীয় শ্রমে রমাপতি নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। সুকুমারী তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,

"আমাকে ছাড়িয়া দেও, হয় ত আমিও সাঁতার দিতে পারিব।"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাতর স্বরে রমাপতি বলিলেন,—

"কাহাকে ছাড়িয়া দিব? তোমার ঐ শরীর? মরণের পর।"

কিন্তু ক্রমশই রমাপতি অধিকতর ক্লান্ত ও অক্ষম হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন সুকুমারী অন্য উপায়াভাবে কৌশল করিয়া রমাপতির পৃষ্ঠাশ্রয় ত্যাগ করিলেন এবং তখনই ডুবিয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ প্রায় রুদ্ধশ্বাস রমাপতি "সুকুমারি, সুকুমারি" শব্দে চীৎকার করিয়া সেই স্থলে ডুবিয়া গেলেন। অচিরকাল মধ্যে সুকুমারীকে লইয়া রমাপতি পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং পাছে সুকুমারী আবার ফাঁকি দেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার প্রকোষ্ঠ আপনার দন্ত

মধ্যে কঠিনরূপে ধারণ করিলেন। কোমলাঙ্গীর হস্ত দন্তাঘাতে কাটিয়া গেল এবং সেই ক্ষতমুখ হইতে দরদরিত ধারায় রুধির প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথী নীরে মিশিতে লাগিল। সুকুমারী রমাপতির পৃষ্ঠত্যাগ করিবার জন্য কোন প্রকার বল প্রয়োগ করিলেন না। তিনি বুঝিতেন, এসময়ে জোর করিলে, রমাপতির জীবনের এখনও যদি কোন আশা থাকে তাহাও আর থাকিবে না। রমাপতি ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং সময়ে সময়ে সুকুমারীর সহিত ডুবিয়া পড়িতে লাগিলেন। শরীর আর বহে না হাত আর উঠে না, পা আর নড়ে না, নিশ্বাস আর চলে না। তিনি বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই। তখন তিনি বলিলেন,—

"সুকুমারী, আর বাঁচাইতে পারিব না। তোমারও যে গতি, আমারও—"

তিনি যেই কথা কহিতে গেলেন সেই তাঁহার দন্তমধ্য হইতে সুকুমারীর হস্ত খুলিয়া গেল। তখনই সুকুমারী আবার জলে ডুবিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া জলে ডুব দিলেন।

এদিকে ঝড় একটু থামিল; মেঘ ক্রমে ক্রমে উড়িয়া যাওয়ায় আকাশ মণ্ডল আবার পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ক্রমে চন্দ্র ও তারা উকি দিতে দিতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং জাহ্নবী-বক্ষ আবার চন্দ্রকরোজ্জ্বল হইয়া হাসিতে লাগিল। পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি দেবী আবার শোভাময়ী সুন্দরীর বেশ ধারণ করিলেন। আকাশ বেশ খোলসা হইয়াছে এবং আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই দেখিয়া দুই এক খানি নৌকাও লগী উঠাইয়া, কাছি খুলিয়া, গা ভাসাইয়া দিল।

রমাপতি ভাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? রমাপতি সাধ্যমত উচ্চস্বরে ডাকিলেন,—

" সুকুমারী, সুকুমারী ! "

কিন্তু কোথায় সুকুমারী ?

আবার রমাপতি ডুবিলেন এবং আবার উঠিয়া ডাকিলেন,—

" সুকুমারী, সুকুমারী ! "

" কিন্তু কোথায় সুকুমারী ? "

তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, মর্ম্মাহত, রুদ্ধশ্বাস রমাপতির চৈতন্য তিরোহিত হইল এবং তাঁহার শেষ নিশ্বাস শ্বাসনলী ত্যাগ করিল।

কিছু দূরে একখানি নৌকা আসিতেছিল। তদুপরিস্থিত লোকেরা তাঁহার শব্দ শুনিয়া স্থির করিল এই ঝড়ে যাহাদের নৌকা ডুবিয়াছে তাহার মধ্যে তিনিও একজন। তাহারা দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে আপনাদের নৌকায় তুলিল এবং বহু কৌশলে সুশ্রুষায় তাঁহাকে আবার চেতন করিল। চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তখন রমাপতি একে একে নৌকার তাবৎ লোকের মুখের দিখে চাহিলেন। দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে সুকুমারী নাই। তখন কেহ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবার পূর্ব্বেই তিনি গঙ্গা-প্রবাহে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নাবিকও জলে পড়িল এবং শীঘ্রই তাঁহাকে উঠাইয়া আনিল। এবার নৌকার লোকেরা তাঁহাকে ধরিয়া রহিল। তিনি চীৎকার করিতে লাগিলেন:—

"সুকুমারী, সুকুমারী!"

কিন্তু কোথায় সুকুমারী?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুকুমারীকে হারাইয়াও রমাপতির মরা হইল না। তাঁহার যে অবস্থা তাহাতে বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা এবং মৃত্যু তাহার তুলনায় পরম সুখ। অনেক শত্রু মিলিয়া তাঁহাকে সে সুখ ভোগ করিতে দিল না। যেখানে মৃত্যুর নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, মৃত্যু সে স্থলে অগ্রেই উপস্থিত। যেখানে মৃত্যু দেখা দিলে আত্মীয়বর্গ শোকে আকুল হইবে, রোদনে ও আর্ত্তনাদে বসুধা প্লাবিত হইবে, জীবিত স্বজনগণ যাতনায় অবসন্ন হইবে, সেখানে মৃত্যু, তস্করের ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে সমাগত হইয়া সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর। আর যেখানে মানব মৃত্যুকে শান্তিনিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে, মৃত্যুর

নিমিত্ত লালায়িত, সেখানে শত সাধনাতেও মৃত্যুর দেখা নাই। মৃত্যুর নিমিত্ত লালায়িত রমাপতি মরিতে পাইলেন না। সুকুমারীকে হারাইয়াও তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইল। অনেক শত্রু আত্মীয়তা করিয়া যাতনা-ক্লিষ্ট রমাপতিকে মরিতে দিল না।

যে নৌকা আসিয়া রমাপতিকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিল তাহাতে রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় নামে এক প্রভূতধনসম্পন্ন অতি অমায়িক স্বভাব ব্যক্তি আপনার দলবল সহ আরোহী ছিলেন। সেই রাধানাথ বাবু ও তাঁহার অনুগত জনেরা রমাপতিকে দুঃসহ যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে দিলেন না। তিনি অতি যত্নে রমাপতিকে সঙ্গে লইয়া হালিসহরে আসিলেন। সেখানে রাধানাথের অতি প্রকাণ্ড বাসভবনে রমাপতি অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ ও বিনোদিত করিবার নিমিত্ত রাধানাথ নানা সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবের কোমলতা, অবস্থার নিতান্ত হীনতা, বিপদের যৎপরোনাস্তি প্রগাঢ়তা, সংসারে স্বজনবিহীনতা প্রভৃতি তাঁহার প্রতি রাধানাথের অমিত স্নেহ আকর্ষণ করিল। রাধানাথ তাঁহাকে পুত্রবাৎসল্যে পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার অপরিসীম শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত ও প্রশমিত হইলে তাঁহাকে পুনরায় বিবাহিত করিয়া সংসারী করিয়া দিবেন সংকল্প করিলেন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে সমবয়স্ক সদালাপী লোক এবং শরীর রক্ষার্থ দ্বারবান ফিরিতে লাগিল, রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী, তিনি না খাইলে, আপনারা অন্নজল ত্যাগ করিবেন ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে যথাসময়ে আহার করাইতে লাগিলেন, অধ্যয়নে তাঁহার অনুরাগ ছিল জানিয়া রাশি রাশি নূতন পুস্তক তাঁহার জন্য সমানীত হইতে লাগিল, সংগীতে মানব মন মুগ্ধ হয় বিশ্বাসে তাহারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হইল, সংক্ষেপতঃ একদিনে একবারে মরিতে না দিয়া তাঁহার নিত্যমৃত্যুর বিশেষ আয়োজন করা হইল। সুকুমারী হারা হইয়াও রমাপতি বাঁচিয়া রহিলেন।

কিন্তু তোমরা যাহাই বল, সকল কাণ্ডেই বিধাতার অতি আশ্চর্য্য বিধি আছে। শোক, যতই কেন কঠোর হউক না, তাহার নিবারণ পক্ষে সময় অমোঘ মহৌষধ। তীব্র শোক—অপরিসীম প্রেমাস্পদের বিয়োগজনিত

দুঃসহ জ্বালা হৃদয়ে যে অনপনেয় অঙ্কপাত করে তাহার বিলোপ করিতে কালের সাধ্য নাই। কিন্তু শোকের পরুষতা, দিনে না হউক মাসে, মাসে না হউক বৎসরে, অবশ্যই মন্দীভূত হইয়া আইসে। উপদেশ বা শিক্ষা সর্ব্বত্র শোকের প্রখরতা নষ্ট করিতে সক্ষম নহে। তাহা হইলে,

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"*

স্বয়ং ভগবানের এই মহদুপদেশ বিদ্যমান থাকিতে লোকে শোকে বিহ্বল হয় কেন?

দেখিতে দেখিতে বৎসর অতীত হইল। রমাপতি সুকুমারী হারা হইয়াও এই সুদীর্ঘ কাল অবিচ্ছেদে মৃত্যুযাতনা সহিতে সহিতে জীবন বাহিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার ব্যবহার, তাঁহার সততা, তাঁহার বিদ্যা, তাঁহার শোক, তাঁহার রূপ সকলই তাঁহাকে তাঁহার আশ্রয়দাতার পরিবার মধ্যে আত্মীয় হইতেও আত্মীয় করিয়া তুলিল। ক্রমে ক্রমে রমাপতি যেন সেই পরিবারের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার স্নেহবন্ধনে সামান্য ভৃত্য হইতে গৃহস্বামী পর্য্যন্ত এবং সামান্যা দাসী হইতে গৃহিণী ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত সকলেই বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। সেই বিশাল পুরীর সর্ব্ব-ভাগই তাঁহার নিমিত্ত উন্মুক্ত; সেই বিপুল বিভব তাঁহার সুখ সম্বিধানে নিয়োজিত, সেই অগণ্য দাসদাসী তাঁহার প্রীতি সমুৎপাদনে সচেষ্টিত, এবং সেই গৃহস্বামী তাঁহার সন্তোষ সংসাধনে ব্যতিব্যস্ত। হে অনাথ নাথ, ইচ্ছাময়, হরি! তোমার একি কৌশলময় ব্যবস্থা? তুমি একদিকে মারিতেছ, আর একদিকে রাখিতেছ এবং এক দিকে ভাঙ্গিতেছ, আর এক দিকে গড়িতেছ। হে নারায়ণ, তুমি রাখিলে তাহাকে মারে কে? তুমি মারিলে তাহাকে রাখে কে? হে সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম, এ সংসারে কেবল তুমিই সার ও সত্য। কবে সে দিন হইবে যখন আমরা অমেয় শোকে বা বিপদে, অসীম সুখে বা আনন্দে তোমার নাম স্মরণ করিতে ভুলিব না?

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সাংখ্যযোগ। ২৭ শ্লোক।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"পোড়ামুখো পাখি! পড়িতে পারেন না, কিছু না, কেবল ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিস তো ভাল, নহিলে তোকে আজি আর ছোলা দিব না।"

একটী ইন্দীবরাননা, দ্বাদশবর্ষীয়া, পরমাসুন্দরী বালিকা আপনার সুবৃহৎ, সমুজ্জ্বল কাকাতুয়া পক্ষীর দাঁড় হাতে লইয়া তাহাকে এইরূপে তিরস্কার করিতেছিলেন। পাখী এ তিরস্কারের মর্ম্ম বুঝিল কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যাঁ।"

"মা গো, কাণ ঝালা পালা করিয়া দিল। থাক্ তুই আমি চলিলাম।"

এই বলিয়া সেই সুন্দরী কাকাতুয়ার দাঁড় তাহার শিকে ঝুলাইয়া দিয়া সে দিক হইতে যেমন ফিরিলেন অমনই সম্মুখে এক দেবকান্তি যুবকমূর্ত্তি তাঁহার নয়নে পড়িল। যুবককে দর্শনমাত্র বালিকা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিল। যুবক সুন্দরী বালিকাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"সুরবালা, আজি আর তবে আমার সঙ্গে বিবাদ হইবে না বোধ হয়। আজিকার ঝোঁক কেবল পাখীর উপর—কেমন?"

সুরবালা উত্তর দিল,—

"তা বই কি? রমাপতি বাবু, আজি আপনার সঙ্গে ভারী ঝগড়া করিব ঠিক করিয়া আছি।"

এই বলিয়া বালিকা অতি আদরের সহিত রমাপতি বাবুর হাত ধরিয়া তত্রত্য এক খানি সুন্দর কৌচে বসাইল এবং আপনিও তাহারই একদিকে বসিল।

এই স্থানে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে এই সুন্দরী বালিকা রাধানাথ বাবুর একমাত্র সন্তান। তাঁহার বিপুল বিভব, এবং নানা সুখৈশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী। সুরবালা অবিবাহিতা। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী যেরূপ পাত্র পাইলে কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া আছেন, তাহা সহজে মিলে

না। পাত্র অতি রূপবান, সুশীল, শান্ত ও বিদ্বান হওয়া চাই, নিঃস্ব, নিরাশ্রয়, ও নিরবলম্বন হওয়া চাই ; তাহার আর কেহ আপনার লোক না থাকে এবং সুরবালাকে কখন পিতৃগৃহ হইতে আর কোথাও লইয়া যাইতে না চাহে এমন পাত্র চাই। এরূপ অষ্টবজ্র সংমিলন সহজ নহে। সুতরাং বিবাহযোগ্য বয়স উত্তীর্ণ হইতেছে, তথাপি সুরবালার বিবাহ হইতেছে না।

আসনে উপবেশন করিয়া রমাপতি বাবু বলিলেন,—

"আজি আমার এমন কি দোষ হইয়াছে যে ভারী ঝগড়া না করিলে চলিবে না ?" সুরবালা বলিলেন,—

"দোষ আজি একটা নাকি ? সারাদিন পরে বিকালে একবার দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন কি দোষ হইয়াছে ?" আজি এত দোষ হইয়াছে যে উপরি উপরি তিন দিন ঝগড়া না করিলে চলিবে না।"

রমাপতি বলিলেন,—

আরম্ভ কর তবে—দেরি কেন ? যখন ঝগড়া না করিলে চলিবে না ঠিক করিয়াছ তখন আর দেরি করিয়া কাজ কি ? আমি প্রস্তুত।"

বালিকা বলিল,—

অমন করিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না—হঁা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"তা কি চলে ? তুমি আরম্ভ কর, আমি বাঁধন দিতেছি।"

বালিকা ঝগড়া করিতে পারিল না। এমন করিয়া কখন কি ঝগড়া করা যায় ? ঝগড়া শাস্ত্রে সুরবালা সুপণ্ডিতা হইলে যাহার সহিত ঝগড়া করিতে হইবে তাহার সহিত এমন করিয়া পরামর্শ করিতে আসিত না। তখন সুরবালা অতি চেষ্টায় মুখের সমস্ত হাসি লুকাইয়া যতদূর সাধ্য গম্ভীর হইয়া এবং কণ্ঠস্বর বিশেষ ভারী করিয়া বলিল,—

"আচ্ছা—আচ্ছা—আজি হইতে আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।"

বালিকা আড়ির প্রগাঢ়তা বুঝাইবার জন্য দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ আপনার চিবুকে স্পর্শ করাইয়া মুখ ফিরাইল। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে আড়ি সাব্যস্ত হইয়া গেল।

পাকাপাকি রকম আড়ি হইল দেখিয়া রমাপতি বলিলেন,—

" আমি বাঁচিলাম। অনেক দিন না কাঁদিয়া আমার প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে। এখন তুমি যদি দুই তিন দিন কিছু না বল তাহা হইলে আমি একটু কাঁদিয়া বাঁচি। "

সুরবালা ফিরিয়া বসিল। তাহার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে বদন হইতে তিরোহিত হইল। তখন প্রকৃত গাম্ভীর্য্যের রেখা সমূহ সেই বালিকার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল। ক্রমে তাহার চক্ষু ঈষৎ জলভারাকুল হইল। তখন সে বলিল,—

" রমাপতি বাবু, চিরকালই কি কাঁদিতে হইবে? এ কাঁদার কি শেষ নাই? আপনার যতই কষ্ট হউক, আপনাকে আমি আর কখনই কাঁদিতে দিব না। আপনি যদি আর কাঁদেন দেখিতে পাই তাহা হইলে আমি এবার জলে ডুবিয়া মরিব।"

রমাপতি সস্নেহে বলিলেন,—

" ছি সুরো, ও কথা কি বলিতে আছে? তোমার কথায়—আমি তো কান্না ছাড়িয়া দিয়াছি। আর আমি কখনই কাঁদিব না সুরো। "

সুরবালা বলিল,—

কাঁদিবেন না যেন; কিন্তু আমি দেখিতে পাই সারাদিনই আপনি বড়ই কাতর থাকেন। আপনি খান কেবল আমাদের দায়ে, শয়ন করেন কেবল আমাদের জ্বালায়, কথাবার্ত্তা কন আমাদের কেবল দৌরাত্ম্যে, আমাকে পড়া বলিয়া দেন ছাড়িনা বলিয়া। আমি সারাদিন দেখি আর ভাবি দুঃখে আপনার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া আমি কতদিন লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদি। "

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকার উজ্জ্বল, আয়ত লোচনদ্বয় হইতে স্থূল অশ্রুবিন্দু সমূহ ঝরিতে লাগিল। সুরবালা অঞ্চলের কাপড় দিয়া বদন আবৃত করিলেন। ধন্য সে মানব যে শোকে এরূপ সহানুভূতি পায়!

তখন অতি কোমলতার সহিত রমাপতি সুরবালার মুখের কাপড় খুলিয়া তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিলেন এবং অতি প্রীতিময় স্বরে বলিলেন,—

না সুরো না—আমি আগে যেমন ছিলেম এখন তো আর তেমন নাই। তোমার স্নেহ, তোমার দয়া এখন আমাকে সকল দুঃখ ভুলাইয়া দিতেছে।

আমার এখন কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাও না? তোমার হাসি কান্না এখন আমাকে হাসাইতে কাঁদাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তোমার ভালবাসা ক্রমে আমাকে সকলই ভুলাইয়া দিতেছে।”

সুরবালার মুখে হাসি আসিল। কিন্তু তিনি অন্য কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সেই সুবিস্তৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে আর দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। সেই দুই জনের মধ্যে যিনি পুরুষ তিনিই রাধানাথ। উজ্জ্বল ও উন্নত ললাট, পরিপুষ্ট দেহ, আয়ত লোচন, গৌর বর্ণ, তাঁহার সুপরিণত কলেবরের শ্রী প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার বয়স ৪০ ছাড়ায় নাই; কিন্তু মাথায় রজত সূত্রবৎ পক্ক-কেশের ঘটাটা খুব বেশি। সঙ্গে তাঁহার অন্ধের যষ্টি, অন্ধকারের আলো, ভবনদীর ভেলা, সাগর সেঁচা মাণিক, বুড়া বয়সের সম্বল ভুবনেশ্বরী—রাধানাথের ব্রাহ্মণী। ভুবনেশ্বরীর বয়স ৩৫ ছাড়ায় নাই। রূপে ও গুণে ভুবনেশ্বরী অতুলনীয়া। এই প্রৌঢ় প্রৌঢ়া দম্পতীর সমাগমে ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল। যাঁহারা নবীন নবীনার শোভায় বিমোহিত, তাঁহারা হয়ত এ মন্দভাগ্য গ্রন্থকারকে নিতান্ত বৃদ্ধ বলিয়া মনে করিবেন এবং যৎপরোনাস্তি অরসিক বলিয়া গালি দিবেন। কিন্তু তাহা হউক, আমি আবার বলিতেছি, সেই প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পূর্ণাঙ্গ সমূহের যে সুপরিণত শোভা তাহার তুলনাস্থল অতি বিরল।

রাধানাথ আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—

“একি সুরো, তুমি কাঁদিতেছিলে নাকি?” সুরবালা দৌড়িয়া পিতার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—

“দেখ দেখি বাবা, রমাপতি বাবু আজিও কাঁদিতে চাহিতেছেন। মা, তুমি তো আর কিছু বল না। তোমার কথাই কেবল উনি শুনেন।”

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

“তুই যেমন পাগ্‌লী, তোকে তেমনই ক্ষেপায়। রমাপতি কাঁদিবে কি দুঃখে? কেন বাবা, তুমি আবার কাঁদার কথা বল?”

রমাপতি বলিলেন,—

“না মা, আপনি সুরোর কথা শুনিবেন না।”

ভুবনেশ্বরী বলিলেন,—

আজি সারাদিনটি তোমাকে একবারও দেখিতে পাই নাই। কালি বৈকালে বড় মাথা ধরিয়াছিল বলিয়াছিলে, আজি কেমন আছ? তুমি এদিকে আসিয়াছ শুনিয়া তোমাকে দেখিতে আসিলাম।"

রাধানাথ বলিলেন,—

"আর আমি আসিলাম সুরোকে এক খবর দিতে। সুরো যদি সন্দেশ খাওয়ায় তবে বলি।"

সুরো ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

"কি বাবা, কি বাবা?"

রমানাথ বলিলেন,—

"রমাপতি, সম্প্রতি তোমার, আমার, সুরোর এবং গৃহিণীর যে ছবি প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলাম, তাহা আজি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তোমরা দেখিবে চল।"

সুরবালা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসিল,—

"কোথায় আছে বাবা?"

পিতা উত্তর দিলেন,—

"তোমার জন্যই আসিয়াছে, তোমারই ঘরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

সুরবালা মহাহ্লাদে রমাপতির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ভুবনেশ্বরী দেবী একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"রমাপতি যদি আমাদের ছেলে হইত।"

রাধানাথ বলিলেন,—

কেন রমাপতিকে কি এখনও আপনাদের ছেলে বলিয়া লওয়া যায় না?"

কালিদাসের উপমা।

সীতা গ্রহণজন্য প্রজাবর্গ রামের অপবাদ করে, রঘুকুলে কলঙ্ক রটিয়াছে শুনিয়া যশোধন রাম অনুজগণকে বলিলেন ঃ—

রাজর্ষিবংশস্য রবিপ্রসূতেঃ
উপস্থিতঃ পশ্যত কীদৃশোঽয়ম্।
মত্তঃ সদাচারশুচেঃ কলঙ্কঃ
পয়োদবাতাদিব দর্পণস্য॥

মেঘ বায়ু হইতে দর্পণের ন্যায়, আমা হইতে এই শুদ্ধাচারসম্পন্ন রবিপ্রসূত রাজর্ষিবংশের কীদৃশ কলঙ্ক উপস্থিত হইল দেখ।

পৌরেষু সোঽহং বহুলীভবন্তম্
অপাং তরঙ্গেষ্বিব তৈলবিন্দুম্।
সোঢ়ুং ন তৎপূর্ব্বমবর্ণমীশে
আলানিকং স্থানুমিব দ্বিপেন্দ্রঃ॥

হস্তী যেমন বন্ধনস্তম্ভ সহ্য করিতে পারে না তেমনি আমি জলস্রোতে একবিন্দু তৈলের ন্যায় পৌরজনসমূহে ক্রমশঃ সম্বর্দ্ধনশীল এই অপবাদ সহ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না।

লক্ষ্মণ সীতাকে বনে পরিত্যাগ করিবার জন্য ভাগিরথীতীরে উপস্থিত।

গুরোর্নিয়োগাদ্বনিতাং বনান্তে
সাধ্বীং সুমিত্রাতনয়ো বিহাস্যন্
অবার্য্যতেবোত্থিতবীচিহস্তৈঃ
জহ্নোর্দুহিত্রা স্থিতয়া পুরস্তাৎ॥

গুরুর নিয়োগানুযায়ী—সাধ্বী বনিতাকে বনান্তে পরিত্যাগী সুমিত্রাতনয় অগ্রেস্থিত জহ্নুর দুহিতা কর্ত্তৃক উত্থিত তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা যেন নিবারিত হইতে লাগিলেন।

দারুণ নির্ব্বাসনবার্ত্তা শ্রবণে সীতা মূর্চ্ছিত হইলেন।

ততোভিষঙ্গানিলবিপ্রবিদ্ধা
প্রভ্রশ্যমানাভরণপ্রসূনা।

স্বমূর্ত্তিলাভপ্রকৃতিং ধরিত্রীম্
লতেব সীতা সহসা জগাম॥

অনন্তর অভিষঙ্গরূপ অনিল কর্ত্তৃক অভিভূতা, আভরণরূপ প্রসূন বিকীর্ণ-কারিণী লতার ন্যায় সীতা স্বীয় শরীরের আকররূপিণী—ধরিত্রীতে পতিতা হইলেন।

সীতা, দুঃখকাতরা, লতা অনিলতাড়িতা। সীতার আভরণ সমূহ স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, লতার প্রসূনসমূহ বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। ধরিত্রী সীতার জননী, লতা পৃথিবী হইতে উদ্ভূতা।

মহারাজ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে বাল্মীকি নিমন্ত্রণে আসিলেন। সঙ্গে লব এবং কুশ শিষ্যদ্বয় আসিল। লবকুশের রামায়ণগানে রামের সভাসদ্গণ নিস্তব্ধ——

তদ্গীতশ্রবণৈকাগ্রা সংসদশ্রুমুখী বভৌ।
হিমনিষ্যন্দিনী প্রাতঃ নির্ব্বাতেব বনস্থলী॥

তাহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে একাগ্রচিত্তা এবং অশ্রুমুখী সভা, প্রভাতে শিশির বর্ষিণী বায়ুসঞ্চারশূন্যা বনস্থলীর ন্যায় হইল।

রামের দুই পুত্র কুশ এবং লব। কুশ কুশাবতী এবং লব শরাবতী নগরীতে রাজা হইলেন। ভরতের দুই পুত্র, পুষ্কল এবং তক্ষক, পুষ্কলাবতী এবং তক্ষশীলায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের দুই পুত্র, অঙ্গদ এবং চন্দ্রকেতু, কারাপথের অধীশ্বর হইলেন। এবং শত্রুঘ্নের দুই পুত্র শত্রুঘাতী এবং সুবাহু যথাক্রমে মথুরা এবং বিদিশা শাসন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যা নগরীতে রাজা রহিল না—শ্রীভ্রষ্ট হইয়া উহা ক্রমে জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। দেখিযা সেই অনাথা অযোধ্যা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা একদিন কুশাবতী নিবাসী মহারাজ কুশের নিকট গমন করিলেন। নিশীথ সময়ে যখন দীপসমূহ নির্ব্বাণোন্মুখ, প্রাণীগণ নিদ্রাভিভূত, চতুর্দ্দিক নীরব, নির্জ্জন—মহারাজ কুশ প্রবুদ্ধ হইযা শয্যাগৃহে প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশধারিণী অদৃষ্টপূর্ব্বা এক মনোহারিণী রমণীমূর্ত্তি দেখিলেন।——

অথানপোঢ়ার্গলমপ্যগারম্
ছায়ামিবাদর্শতলং প্রবিষ্টাম্।

সবিস্ময়ো দাশরথেস্তনুজঃ
প্রোবাচ পূর্ব্বার্দ্ধবিসৃষ্টতল্পঃ ॥

আদর্শতলে ছায়ার ন্যায় অনুদ্ঘাটিত অর্গলযুক্ত গৃহে প্রবিষ্টা সেই রমণীকে দাশরথিপুত্র শয্যা হইতে অর্দ্ধাঙ্গ উত্থিত করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লব্ধান্তরা সাবরণেঽপি গেহে
যোগপ্রভাবো নচ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষিচাকারমনির্বৃতানাম্
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্ ॥
কা ত্বং শুভে!————

মৃণালিনী, হিমকৃত উপদ্রবের ন্যায়, তুমি দুঃখিতের আকার ধারণ করিতেছ, যোগপ্রভাব তোমার কিছু দেখিতেছি না, কিন্তু অর্গলবিশিষ্ট গৃহে প্রবেশ লাভ করিয়াছ! হে শুভে! তুমি কে?

কুশ অযোধ্যায় আসিয়া বাস করিলে সেই পুরী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ সমৃদ্ধি-শালিনী হইয়া উঠিল।

সা মন্দুরাসংশ্রয়িভিস্তুরঙ্গৈঃ
শালাবিধিস্তম্ভগতৈশ্চ নাগৈঃ।
পুরাবভাসে বিপণিস্থপণ্যা
সর্ব্বাঙ্গনদ্ধাভরণেব নারী ॥

অশ্বশালায় সংস্থিত তুরগগণে, হস্তিশালায় যথাবিধি স্থাপিত স্তম্ভে বদ্ধ হস্তিসমূহে এবং বিপণিমালায় সুসজ্জিত ক্রয়বিক্রয় দ্রব্যসমূহে শোভিতা সেই পুরী সর্ব্বাঙ্গে আভরণধারিনী নারীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

এক দিন নিদাঘ সময়ে কুশের অন্তঃপুরসুন্দরীগণ সরযুপ্রবাহে বারি-বিহারে প্রবৃত্ত। কুশ নৌকা হইতে উহাদের জলক্রীড়া দেখিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তিনী চামরব্যজনকারিণীকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

পশ্যাবরোধৈঃ শতশো মদীয়ৈঃ
বিগাহ্যমানো গলিতাঙ্গরাগৈঃ।

সন্ধ্যোদয়ঃ সাভ্র ইবৈষ বর্ণম্
পুষ্যত্যনেকং সরযূপ্রবাহঃ॥

দেখ আমার শত শত গলিতাঙ্গরাগ অবরোধসুন্দরীগণ কর্ত্তৃক বিলোড়িত এই সরযূপ্রবাহ সমেঘ সন্ধ্যাসমাগমের ন্যায় নানারূপ বর্ণ বিকশিত করিতেছে।

অমী শিরীষপ্রসবাবতংসাঃ
প্রভ্রংশিনো বারিবিহারিণীনাম্।
পারিপ্লবাঃ স্রোতসি নিম্নগায়াঃ
শৈবাললোলান্ ছলয়ন্তি মীনান্॥

এই সকল বারিবিহারিণীগণের অঙ্গভ্রষ্ট শিরীষপুষ্পের কর্ণভূষণ স্রোতে ভাসমান জলনীলীলোভী মৎস্যগণের ভ্রম সম্পাদন করিতেছে।

আবর্ত্তশোভানতনাভিকান্তেঃ
ভঙ্গো ভ্রবাং দ্বন্দ্বচরাস্তনানাম্।
জাতানি রূপাবয়বোপমানা
ন্যদূরবর্ত্তীনি বিলাসিনীনাম্॥

নিম্ননাভিশ্রীর—আবর্ত্তশোভা, ভ্রূর তরঙ্গ, স্তনদ্বয়ের চক্রবাক যুগল, এইরূপে বিলাসিনীগণের রূপাবয়বসকলের উপমান বস্তুসমূহ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

অনন্তর কুশ নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই সুন্দরীগণের সহিত বারিবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

স নৌবিমানাদবতীর্য্য রেমে
বিলোলহারঃ সহতাভিরপ্সু।
স্কন্ধাবলগ্নোদ্ধৃতপদ্মিনীকঃ
করেণুভির্ব্বন্য ইব দ্বিপেন্দ্রঃ॥

তিনি নৌকাবিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, করিণীগণের সহিত স্কন্ধে উৎপাটিত নলিনী সংলগ্ন বন্য হস্তীর ন্যায়, চঞ্চলহারযুক্ত হইয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

ততো নৃপেণানুগতাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ
ভ্রাজিষ্ণুনা সাতিশয়ং বিরেজুঃ।

প্রাগেব মুক্তা নয়নাভিরামাঃ
প্রাপ্যেন্দ্রনীলং কিমুতোন্ময়ুখম্ ॥

তদনন্তর প্রকাশনশীল রাজা কর্তৃক মিলিতা হইয়া সেই স্ত্রীগণ সাতিশয় শোভিতা হইল। মুক্তা সহজেই নয়ন প্রীতিকর—আবার যখন ময়ূখশালী ইন্দ্রনীলের সহিত যুক্ত হয় তখন আর কথা কি?

তেনাবরোধপ্রমদাসখেন
বিগাহমানেন সরিদ্বরাং তাম্।
আকাশগঙ্গারতিরপ্সরোভিঃ
বৃতো মরুত্বাননুযাতশীলঃ ॥

অন্তঃপুরসুন্দরীগণের সহিত নদীশ্রেষ্ঠ সরযূতে বিগাহনশীল সেই কুশ কর্তৃক অপ্সরাগণ পরিবেষ্টিত, মন্দাকিনীবারিবিহারী ইন্দ্র অনুকৃতশ্রী হইয়াছিলেন।

বারিবিহারকালে কুশের হস্তস্থিত দিব্য বলয় স্খলিত হইয়া সরযূতে পতিত হয়। অনুচরবর্গ অনেক অনুসন্ধানে উহা না পাইয়া নিবেদন করিল হ্রদান্তবাসী কুমুদ নামক নাগ উহা অপহরণ করিয়াছে। নাগ বধার্থে কুশ হ্রদমধ্যে অস্ত্র প্রয়োগ করিলে কুমুদ স্বীয় ভগ্নী কুমুদ্বতীকে লইয়া হ্রদ হইতে উত্থিত হইল।

তস্মাৎ সমুদ্রাদিব মথ্যমানাৎ
উদ্বৃত্তনক্রাৎ সহসোন্মমজ্জ।
লক্ষ্মেব সার্দ্ধং সুররাজবৃক্ষ
কন্যাং পুরস্কৃত্য ভুজঙ্গরাজঃ ॥

মথ্যমান সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীর সহিত সুররাজের পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় সেই ক্ষুভিতগ্রাহ হ্রদ হইতে কন্যাকে অগ্রে করিয়া নাগরাজ কুমুদ সহসা উত্থিত হইলেন।

কুমুদ্বতীকে কুশ বিবাহ করিলেন।

কুশ কুলোচিত প্রথানুসারে ইন্দ্রের সাহায্যার্থে এক দুর্জ্জয় দৈত্যকে সংগ্রামে বধ করেন এবং তিনিও সেই দৈত্যকর্তৃক নিহত হন। কুমুদ্বতী কুশের সহমৃতা হইলেন।

তং স্বসা নাগরাজস্য কুমুদস্য কুমুদ্বতী।
অন্বগাৎ কুমুদানন্দং শশাঙ্কমিব কৌমুদী॥

কৌমুদী, কুমুদানন্দ শশাঙ্কের ন্যায় নাগরাজ কুমুদের ভগ্নী কুমুদ্বতী তাঁহার (কুশের) অনুগমন করিলেন।

পিতার অকাল মৃত্যুপ্রযুক্ত রাজা ধ্রুবের পুত্র সুদর্শন অতি শৈশবাবস্থাতেই রাজ্যে অভিষিক্ত হন।

নবেন্দুনা তন্নভসোপমেয়ম্
শাবৈকসিংহেন চ কাননেন।
রঘোঃ কুলং কুট্মলপুষ্করেণ
তোয়েন চাপ্রৌঢ়নরেন্দ্রমাসীৎ॥

বালকনৃপ (যুক্ত) রঘুকুল নবেন্দুশোভী আকাশের, একমাত্র সিংহশাবক শোভী কাননের,এবং কুট্মলাবস্থপঙ্কজশো,ভী জলাশয়ের উপমেয় হইয়াছিল।

"রঘুর উনবিংশ" বিখ্যাত জিনিষ। সেই উনবিংশ স্বর্গে "উনবিংশ শতাব্দী" সুলভ আচার সম্পন্ন রাজা অগ্নিবর্ণের কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা। এ বর্ণনা বড় বৈচিত্র্যময়ী, ললিত, হৃদয়স্পর্শী এবং প্রাঞ্জল—কিন্তু নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন। উৎকৃষ্ট উপমা ইহাতে অনেকগুলি আছে; কিন্তু একটীও উদ্ধৃত করিবার মত নহে।

স্ত্রীমদ্যব্যসনাশক্ত রাজা যৌবনাবস্থাতেই উৎকট যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

ব্যোম পশ্চিমকলাস্থিতেন্দু বা
পঙ্কশেষমিব ঘর্ম্মপল্বলম্।
রাজ্ঞি তৎকুলমভূৎ ক্ষয়াতুরে
বামনার্চ্চিরিব দীপভাজনম্॥

রাজা ক্ষয়াতুর হইলে সেই (রঘু) কুল স্বল্পমাত্র কলাবশিষ্ট চন্দ্রযুক্ত আকাশের ন্যায়, পঙ্কাবশিষ্ট গ্রীষ্মকালীন জলাশয়ের ন্যায় এবং অল্পশিখ দীপাধারের ন্যায় হইল।

স ত্বনেকবনিতাসখোপি সন্
পাবনীমনবলোক্য সন্ততিম্।

বৈদ্যযত্নপরিভাবিনং গদম্
ন প্রদীপ ইব বায়ুমত্যগাৎ ॥

অনেক বনিতার সখা হইয়াও সেই অগ্নিবর্ণ পূতকারী সন্ততি না দেখিতে দেখিতেই—বায়ু প্রদীপের ন্যায়—বৈদ্যযত্নপরিভবকারী রোগকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

গিরিমূলে—সন্তাপী।

মাধুর্য্যে জড়িত তরু, মাধুর্য্যে জড়িত লতা,
ক্ষুদ্র নদী ছোটে গান গেয়ে,
তপে রত শৈল গুলি, অজ্ঞানে রয়েছে বসি,
প্রশান্ত কল্পনা সুখ পেয়ে।
ফুলের হৃদয় হ'তে শান্তির নিশ্বাস বয়,
উল্লাসে বিহঙ্গ করে গান,
স্পর্শময়ী স্তব্ধতার আনন্দে সিহরে তনু
সংগীত অমৃত করি পান।
শুষ্ক কণ্ঠে, দগ্ধ চিতে, প্রকৃতি তোমার দ্বারে
এসেছি মা শান্তির কারণ,
চরণ পরশ করি শোক তাপ গ্লানি মোহ
বহিতেছে ফাটিয়া নয়ন।
এমন সরল ভাবে এ জীবনে এক দিন
পারি নাই অশ্রু ফেলিবারে!
সরল শিশুর মত অগুরু সরল চিত
অকস্মাৎ কে দিল আমারে!
দুঃখ নাই—সুখে ভরা হৃদয় আমার আজ,
দুঃখে—সুখ করে আবাহন;—
আপন সোদরে যেন না দিলে হর্ষেরি ভাগ
তাহার হরষ অকারণ।

তাই আজ এত সুখে স্মৃতির আলেখ্য পানে
অনিমিষে চাহিতেছে প্রাণ।
সুখে দুঃখে জড়াজড়ি দুঃখে সুখে গলাগলি
এ আনন্দ মরি কি মহান্!
শীতের অন্তিম কালে সরস বসন্ত স্পর্শে
শীত যথা হয় মধুময়,
সুখের পরশে আজি মুমূর্ষু যাতনা রাশি—
মাধুর্য্যেতে ঢেকেছে হৃদয়।
গিরিশ্রেণী, পুষ্পরাজি, লতিকাবেষ্টিত তরু,
নিরমল নিঝর বাহিনি,
ক্ষুদ্র অঙ্গে অনন্তের পরিষ্কার সংক্ষেপনী
সুরময়ি বন বিহঙ্গিনি!
এই স্থানে হৃদয়ের অতি প্রিয় সখা মোর
কত দিন একাকী আসিয়া,
সৌন্দর্য্যের চলস্রোতে হৃদয় উচ্ছ্বাস তার
দিয়াছিল যতনে ঢালিয়া।
সেই স্বর, সেই ভাষা, সেই হাসি, সেই আশা,
তোমাদের সরস অন্তরে
লুকান যদ্যপি থাকে, শ্যামল হৃদয় খুলি
একবার দেখাও আমারে।
প্রত্যেকের মুখ পানে, যেই আঁখি ফিরাতেছি
অনুভূত হতেছে সে সব,—
সেই হাসি, সেই ভাষা, স্থির নয়নের উর্ম্মি,
ভোগযোগ্য প্রাণের বিভব।
ছায়ার ছবিটি মোরে, দেখাইয়া কাজ নাই,
শোনায়ো না স্বপনের গান।
অজানা হৃদয় রাজ্যে, কোথা সে রবির কর,
কোথা সেই স্নেহ-মাখা প্রাণ?

হৃদয় বালির বনে, চারুতায় পরিপূর্ণ,
মমতা শিশির রাশি তার,
স্বার্থ পিপাসায় মাতি, সকলি করেছি পান,
তাই বহে নয়নের ধার।
বিরসনা প্রতিধ্বনি! বিজন-চারিনি নদি!
স্বরপানে নিরতা সতত,
সখার কণ্ঠের স্বরে একবার গাও গান
অভিলাষ হউক জাগ্রত।
স্তরীভূত বিস্মৃতির— নাম বুঝি মৃত্যু হবে;
স্মৃতি শুধু আবদ্ধ পরাণ,
স্মৃতির বিকৃতি সনে মৃতের আবদ্ধ প্রাণ
দিন দিন পায় পরিত্রাণ।
শান্তির চরণ স্পর্শি প্রকৃতি তোমার কাছে
কহিতেছি হৃদয়ের কথা,
প্রাণের মাঝারে মোর স্মৃতির যে জ্বালা আছে
না যায় জীবনে যেন ব্যথা।
এই প্রাণে সেই প্রাণে যে যোগ তখন ছিল,
এখনও তেমতি যেন থাকে,
পঞ্চত্বে মিশায়ে গেলে ধূলার বিগ্রহ মোর
এই প্রাণ পায় যেন তাকে।
কোন স্তরে রম্য বন সখার সুষমা লয়ে
করিয়াছ সমাধি রচনা?—
সেই স্থানে একবার নয়ন মুদিয়া বসি,
বিশ্লেষণ করিব যাতনা।
প্রতিধ্বনি তোরে আজ মধুর যাতনা রাশি
দুঃখে সুখে করাইব পান,
আনন্দের স্মৃতি ল'য়ে এতদিন ছিলি তুই,
আজ শোন্ বিষাদের গান।

কাঁদিতে কাঁদিতে যবে চির ঘুমে হব ভোর
তোর মনে রবে স্মৃতিছায়া;
প্রাণের সহিত তুই অবশ্যই মিশাইবি
ধরিব নূতন যবে কায়া।
মধুর লহরী লীলা শান্তির বিমল সুধা;
হৃদয়ের মাঝারে পশিয়া—
বিষাদেরে আবাহন যতনে এনেছে করি—
তাই প্রাণ উঠেছে জাগিয়া।
রম্য বন! সৌম্য গিরি! মিষ্ট কণ্ঠ বিহঙ্গিনি!
প্রেমময়ি তটিনি সুন্দরি!
তোমাদের কাছ হতে হতেছি বিদায় আজ
দারুণ যাতনা বুকে ধরি।
মাধুর্য্যের চলস্রোতে দুই বিন্দু প্রণয়ের
স্বার্থহীন নিরমল জল,
যখন তখন এসে বর্ষণ করিয়া যাব,
ম্লান চিত্ত হইবে উজ্জ্বল।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

ইঙ্গরেজের লিখিত ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে ও ইঙ্গরেজের রণকৌশলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত, এই কথাটা এখন প্রায় সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে যখনই কোন বিষয়ে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তখনই ঐ কথার বলে ইঙ্গরেজের সর্ব্বপ্রকার প্রধান্য স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইতিহাস প্রতিপন্ন করি-

তেছে, ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন। ভারতবাসীরাই আপনাদের দেশ আপনারা অধিকার করিয়া, ইঙ্গরেজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সুতরাং ইঙ্গরেজ বিজেতা বলিয়া, কখনও আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে পারেন না—ভারতবাসীকে বিজিত বলিয়াও ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতে পারেন না। আজ কাল অনেক ইঙ্গরেজ এ বিষয় স্বীকার করিয়া আপনাদের উদারতার পরিচয় দিতেছেন। ১৮৫৭ অব্দের সিপাহিযুদ্ধ একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। কিরূপে ঐ যুদ্ধের উৎপত্তি হয়, কিরূপে উহার বিকাশ দেখা যায়, কিরূপে উহা সংহারিণী মূর্ত্তি বিস্তার করিয়া চারিদিক শোণিতে রঞ্জিত করিয়া ফেলে, শেষে ইংরেজ কিরূপে ঐ ভয়ঙ্কর বিপ্লব হইতে রক্ষা পাইয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন, তাহা অনেক ঐতিহাসিক ঘৃণা, ক্রোধ, বিস্ময় ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলেও অনেক ইঙ্গরেজ ইতিহাসের প্রকৃত সম্মান রাখিতে পারেন নাই। অনেক ইংরেজ কোন ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা করিতে গিয়া, ভারতবাসীদিগের পাশব প্রকৃতির চিত্রই বেশ করিয়া আঁকিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের স্বজাতির অনেকে যে ঐরূপ কার্য্যে আপনাদের নিষ্ঠুরতার একশেষ দেখাইয়াছেন, তাহা চাপা দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সুখের বিষয়, সমদর্শী ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকও এইরূপ একদেশদর্শিতার প্রতিবাদ করিয়াছেন। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে দিল্লীর ঘটনা-প্রসঙ্গে একজন সহৃদয় ইঙ্গরেজ স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে, "নাম মাত্র খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতারা ইউরোপের যুদ্ধে নগরসমূহ যেরূপে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার যে লোমহর্ষণ চিত্র ইতিহাসে রহিয়াছে, তাহার তুলনায় দিল্লীর উপস্থিত সময়ের দৌরাত্ম্য ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ যে অধিকতর ভয়ঙ্কর, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" বস্তুতঃ সে সময়ে ইঙ্গরেজ ও ভারতবাসী উভয়ই উত্তেজনার আবেগে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল, উন্মত্ত ভারতবাসী যেমন ইঙ্গরেজের বিনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল, কোমলপ্রকৃতি ভারত-বাসী তেমনি মূর্ত্তিমান দয়া স্বরূপ হইয়া নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। এ বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর ভারতবর্ষীয়গণ পর্য্যন্ত আত্মস্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া যেরূপ দয়া ও কোমলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার জগতে তুলনা রহিত। ভারতবাসী সহায় না হইলে ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য

স্থাপন করিতে পারিতেন না—আর ভারতবাসীরা আশ্রয় না দিলে ইঙ্গরেজ কখনও ১৮৫৭ অব্দের ভয়ঙ্কর ঘটনা হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না। এই পরোপকারকাহিনী বিবৃত করিলে অনেক লাভ আছে। আমাদের দেশের যাহারা কেবল ইঙ্গরেজের গ্রন্থে বিদেশীদিগের কৃত উপকারের কথা পড়িয়া আমোদিত হন, স্বদেশীয়দিগের এই জ্বলন্ত সদয় ব্যবহারের কাহিনীতে তাঁহাদের আত্মসম্মান ও আত্মাদরের আবির্ভাব হইবে। আর যাঁহারা ভারতবাসীদিগকে ক্ষুদ্র প্রাণী ভাবিয়া, নিরন্তর নিপীড়িত ও নির্জ্জীত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও বুঝিবেন যে, এক সময়ে এই ক্ষুদ্র প্রাণীর মহাপ্রাণতায় ও অনন্ত করুণায় তাঁহারা ভারতে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিয়া ছিলেন। এজন্য ঐ সকল কাহিনী এ স্থলে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

উন্মত্ত সিপাহিগণ যখন দিল্লী আক্রমণ ও অধিকার করে, তখন দিল্লীর ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া, পলায়ন করিতে থাকে। পলায়ন সময়ে ইহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। এই সময়ে ৩৮ গণিত পদাতিক-দলের একজন আফিসর আপনাদের পলায়ন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।—"আমরা তাড়াতাড়ি পলায়নের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলাম। বিশ্বস্ত সিপাহিরা তাহাদের আফিসরদিগকে শীঘ্র শীঘ্র পলাইয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিল। এমন কি তাহারা আপনাদের কুটীরেও বিপন্ন আফিসর-দিগকে আশ্রয় দিতে চাহিয়াছিল। * * আমরা দৌড়িতে লাগিলাম। অবশেষে পরিশ্রান্ত হইয়া একটি বৃক্ষের তলায় বসিয়া পড়িলাম। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে চন্দ্র উঠিয়াছিল। সৈনিকনিবাস অগ্নিশিখায় আচ্ছাদিত হইয়াছিল। জ্বলন্ত হুতাশনের প্রভাবে রাত্রিতেও দিবসের ন্যায় আলোক বিকাশ পাইয়াছিল। আমরা সমস্ত রাত্রি এইরূপে হাঁটিয়া অতিবাহিত করিলাম। কিয়দ্দূরে মাটীর একটি ভগ্ন গৃহ ছিল। আমরা সকলে সেইখানে গিয়া লুকাইলাম। এই সময় কয়েক জন ব্রাহ্মণ আপনাদের কার্য্যে যাইতেছিলেন। ইঁহারা আমাদিগকে এইরূপ কদর্য্য স্থানে লুক্কায়িত দেখিয়া, আমাদের সকলকেই তাঁহাদের পল্লীতে লইয়া আসিলেন এবং সকলকেই চপাটি ও দুগ্ধ দিয়া সন্তৃপ্ত করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আমরা ইঁহাদের সাহায্যে পদব্রজে

যমুনার একটি শাখা পার হই। * * পথে এক দল গুজর আমাদের দুরাবস্থার একশেষ করে। শেষে কয়েকজন পরদুঃখকাতর দয়াপর ব্রাহ্মণ আমাদিগকে ভিকানামক একটি পল্লীতে লইয়া আইসেন। ইঁহারা বিশ্রামের জন্য আমাদিগকে খাটিয়া দেন এবং আহারের জন্য আমাদের সম্মুখে রুটি ও ডাল আনিয়া উপস্থিত করেন। পল্লীবাসীরা নিরক্ষণ হইলেও আমাদের সহিত বড় সদয় ব্যবহার করে। * * কিন্তু একদল উত্তেজিত লোক হঠাৎ আসিয়া আমাদের দুরবস্থা ঘটায়। এই সময়ে একজন সন্ন্যাসী আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহে লুকাইয়া রাখেন। দিল্লী হইতে পলায়নের দুই দিন পরে একজন ভারতবর্ষীয় আমাদের সাহায্যার্থ মিরাটে সংবাদ লইয়া যাইতে উদ্যত হয়। ফরাসী ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ঐ ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হয়। * * এই পত্র পহুঁছিলে মিরাট হইতে দুইজন সৈনিক পুরুষ ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। দিল্লী হইতে পলায়নের অষ্টম দিন রাত্রিকালে আমরা ইহাদের সঙ্গে মিরাটে উপনীত হই।"

সম্ভ্রান্ত হিন্দুমহিলাগণও উপস্থিত সময়ে অসহায় ইউরোপীয়দিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। বুঁদীর রাজার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা এই শ্রেণীর রমণীগণের অগ্রগণ্যা। বুঁদীরাজ সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে তাঁহার দয়াশীলা পত্নী শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীয়গণ দলে দলে নিহত হইতেছে। যে সকল কুলকন্যা ও শিশু সন্তান এক সময়ে সুখ সৌভাগ্যে লালিত হইয়াছিল, তাহারা এখন খাদ্য বিহীন ও বস্ত্র বিহীন হইয়া, আশ্রয় স্থানের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় দারার্দ্র হইল। বুঁদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিকট আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সঙ্গে পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও প্রেরিত হইতে লাগিল। বুঁদীর অধিপতি যুদ্ধে গিয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের

প্রতি পত্নীর এই সদ্ব্যবহার তাঁহার গোচর হইল না। রাজমহিষীর সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থ শরীরে দিল্লীস্থিত ইঙ্গরেজ সেনানিবাসে উপস্থিত হইল। রাণী যথা সময়ে সাহায্য না করিলে ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত। এইরূপ সাহায্য দানে যে, আপনার প্রাণ হানির সম্ভাবনা আছে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু তাহা জানিয়াও, তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈষিণী নারী বিপন্নের সাহায্য করিয়া হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। কিন্তু এই হিতৈষিতা, সদাশয়তা ও উদারতাই রাণীর প্রাণনাশের কারণ হইল। বুঁদী রাজের প্রত্যাগমনের কিছুকাল পরে রাণীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যার হিউরোজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কি কারণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহা ভালরূপে জানা যায় নাই। অনেকে সন্দেহ করেন, বুঁদীর অরণ্যস্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাতে রাজার আদেশে রাণীকে বধ করা হয়।

সিপাহি যুদ্ধের পূর্ব্বে একটি ভারত মহিলা অযোধ্যায় একজন ইংরেজ সেনার পরিবার মধ্যে ধাত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সেনাপতি আপনার সন্তান দিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটী কুড়িমাসের শিশু তাঁহার নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময় উক্ত ধাত্রীর প্রতি এই শিশুটির প্রতি-পালন ভার সমর্পিত হয়। একদা প্রাতঃকালে ধাত্রী শিশুটিকে লইয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময়ে চারিদিকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল। কোলাহল শ্রবণে সে দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া শুনিতে পাইল, সিপাহিগণ সম্পত্তি লুঠিয়া লইতেছে এবং ইউরোপীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা সকলকেই মৃত্যুমুখে পাতিত করিতেছে। স্নেহময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার আর সময় পাইল না; আপনার বস্ত্রে তাড়াতাড়ি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া গৃহের এক প্রান্তে চাপিয়া রাখিল এবং সাহসে ভর করিয়া তাহার সম্মুখে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিপাহিরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ধাত্রীকে কহিল, "আমরা বিদেশী বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলকেই বধ করিব, শিশুটি কোথায় অগ্রে শীঘ্র বাহির করিয়া দাও"। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে বাঙনিষ্পত্তি করিল না,

কেবল নিজের সম্বন্ধে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। সিপাহিগণ এই প্রার্থনায় সম্মত হইল না, কহিল, "বালকটিকে বাহির করিয়া না দিলে নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে"। অসহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চাদ্‌ভাগে বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। ধাত্রী ইচ্ছা করিলেই তাহাকে সিপাহির হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু অনুপম হিতৈষিতা তাহাকে এই নৃশংস কার্য্য হইতে বিরত করিল। ধাত্রী শিশুর সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না, কেবল পূর্ব্বের ন্যায় আপনার জন্য করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

একজন সিপাহি জিজ্ঞাস্য বিষয়ে ধাত্রীকে নিরুত্তর দেখিয়া সক্রোধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত করিল। আহত স্থান হইতে রক্তধারা অনর্গল নির্গত হইতে লাগিল। ধাত্রী নীরবে এই আঘাত সহ্য করিল, রক্ষাধীন বালক কোথায় আছে, কহিল না। ঘাতকের উত্তোলিত অসি উপর্য্যু-পরি তাহার দেহে পতিত হইতে লাগিল। অসহায় অবলা আপনার বাহুদ্বারা তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার সমস্ত দেহ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া উঠিল। অবলা আর সহিতে পারিল না, হতচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িল। এ দিকে সিপাহিরা লুণ্ঠনাসয়ে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল। স্নেহময়ী ধাত্রীর প্রাণাধিক স্নেহের ধন রক্ষাকারিণীর পার্শ্বে নিরাপদে বস্ত্রাচ্ছাদিত রহিল।

ধাত্রী সংজ্ঞালাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া আপনার বাটীতে উপস্থিত হইল, এবং লোকে ইংরেজ বালক বলিয়া মনে করিতে না পারে, এই অভি-প্রায়ে উহার গায়ে এক প্রকারের রঙ্গ মাখাইয়া দিল। কিছুদিন পরে সে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই লক্ষ্ণৌ নগরে আছেন: এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বাসিনী পরিচারিকা, শিশুটিকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে প্রভু ও প্রভুপত্নীর হস্তে তাহাদের হৃদয়রঞ্জন স্নেহের পুত্তলী সমর্পণ করিল। সেনাপতি ও তাহার বনিতা, আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতার সহিত শিশুটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক, শান্তি স্থাপিত হইলে ধাত্রীকে সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

আহত স্থান ভালরূপে শুষ্ক না হওয়াতে ধাত্রী লক্ষ্ণৌ হইতে আপনার

স্বাসগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। যতদিন সিপাহিরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, ততদিন সে ঐ স্থানেই অবস্থিতি করে। ইহার পর উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইলে ধাত্রী অনুসন্ধান করিয়া জানিল, তাহার প্রভু ও প্রভুপত্নী, উভয়েই আক্রমণের সময় হত হইয়াছেন। যাহাকে সে শরীরের শোণিতপাত করিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল এবং অপরিসীম সাহস ও দৃঢ়তার সহিত লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, সে অপরাপর অনাথ শিশু সন্তানের সহিত ইঙ্গলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

১৭৬৫ অব্দে এই সদাশয়া মহিলা অযোধ্যার ডেপুটি কমিশনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত ছিল। অনেকেই তাহার নিকট উক্ত ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছেন এবং অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত স্থান দর্শন করিয়াছেন। ঐ ক্ষতগুলি তাহার অসীম সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি, অপরিমেয় বিশ্বাস ও অলৌকিক দয়ার গৌরবসূচক অমূল্য ভূষণস্বরূপ ছিল। এই গৌরবকাহিনী বলিবার সময়ে তাহার মুখমণ্ডলে কোন প্রকার গর্ব্বের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরতিশয় বিনয়নম্রভাবে সকলের নিকট উহা ব্যক্ত করিত।

দিল্লী হইতে যে সকল ইঙ্গরেজ ভিন্ন ভিন্ন পথে পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বল্লভগড় নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। বল্লভগড়ের রাজা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় পলাতকদিগকে কহেন যে, ৫০ জন সোয়ার তাহাদের বিরুদ্ধে আসিতেছে। তিনি ইহা কহিয়া পলাতকদিগকে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, ভৃত্যের বেশে তাঁহার দুর্গে আসিয়া থাকিতে পরামর্শ দেন। নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ এই পরামর্শ অনুসারে দুর্গে প্রবেশ করেন। দেখিতে দেখিতে ৫০ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ তীর বেগে তথায় উপনীত হয়। রাজার ভৃত্যেরা তাহাদিগকে কহে যে, ইঙ্গরেজগণ সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে। অশ্বারোহী সৈনিকদল এই কথায় দুর্গ হইতে প্রস্থান করে। ইহার পর বিপন্ন ইঙ্গরেজগণ স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহার্য্য গোযানে ৬ মাইল অতিক্রম করিয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। এই সময়ে রাজার শ্যালক তাঁহাদের রক্ষকস্বরূপ ছিলেন। উক্ত পল্লী হইতে তাঁহারা যখন প্রস্থান করেন, তখনও বল্লভগড়ের সদাশয় রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য

কয়েকটী উট দেন। একটী বিশ্বস্ত লোক রাজার আদেশে তাঁহাদের রক্ষক স্বরূপ হইয়া যাইতে প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত রাজা মিবেল নামক একজন ইঙ্গরেজকে কতকগুলি ঘোড়া এবং ঋণ স্বরূপ দুই শত টাকা দেন। হিতৈষী রাজার হিতৈষিতাগুণে বিপন্নগণ নিরাপদে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হন। পথে ইঁহাদের পরিচালক ও রক্ষকগণ ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। শত্রুপক্ষ নিরন্তর ভয় দেখাইলেও ইহারা নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিতে কাতর হয় নাই।

ইঙ্গরেজের লিখিত বিবরণে ভুক্তভোগীদিগের বর্ণিত দুঃখকাহিনীতে বল্লভগড়ের রাজার এইরূপ হিতৈষিতা ও পরোপকারিতার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গরেজ বিচারকগণ শেষে রাজদ্রোহিতার সন্দেহে এই হিতৈষী ও পরোপকারী রাজার ফাঁসীর আদেশ দিয়াছিলেন। যিনি আপনাকে বিপদাপন্ন করিয়াও বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন—ইঙ্গরেজের অধিকারে ইঙ্গরেজের আদেশে শেষে ফাঁসীকাষ্ঠে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছিল! [ক্রমশঃ]

মহাশক্তি।

এই জগৎ কেবল মাত্র একটী মহতী শক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। সে শক্তিটী কি, বা কোথা হইতে উৎপন্ন, সে বিষয়ে আমরা সবিশেষ অনুসন্ধিৎসু নই; কিন্তু তাহার ব্যাপকতা যে অত্যন্ত প্রশস্ত তাহার প্রভূত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই শক্তি কতকটা (কার্য্যকারী) Physical কতকটা জ্ঞানকারী (Psychical)। প্রথমটী বাহ্য জগৎকে, দ্বিতীয়টী অন্তর্জগৎকে শাসন করিতেছে। মনুষ্যশরীর স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়গুণ বিশিষ্ট বলিয়াই মনুষ্যদেহরাজ্যে উভয় শক্তিরই বিকাশ দৃষ্ট হয়। স্থূল শরীরের উপরে কার্য্যকারী শক্তি (Physical force) টী কার্য্য করে, সূক্ষ্ম শরীরটীর উপর জ্ঞানকারী (Psychical force) কার্য্য করে। কাজে কাজেই আমাদের দেহের যে যে স্থানে কেবলমাত্র জ্ঞানের (Consciousness) বিকাশ দেখিতে

পাই সেই সেই স্থানে যদিও উভয় শক্তিরই কার্য্য গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি কোন অদৃষ্টনিয়মবশে কৃৎশক্তির (Physical force) কার্য্য টুকু দেহে গ্রাস করিয়া চিৎশক্তির (Psychic force) কার্য্যটুকু প্রকাশ করি; ইহাতেই আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তি, ইহাতেই Consciousness without motionএর উৎপত্তি। তদ্রূপ যেখানে শুদ্ধ কৃৎশক্তির (Phisical force) কার্য্য বিকাশিত হয় সেই খানেই Motion without consciousness এর উৎপত্তি দেখিতে পাই। শেষোক্ত কার্য্যফলগুলিকেই মনোবিজ্ঞান reflex actions অর্থাৎ spontaneons actions কহে। বস্তুতঃ আমাদের সমস্ত জ্ঞানকৃৎ ও অজ্ঞানকৃৎ কার্য্যের কারণ এই দুইটীর একটী বা উভয়টীই হইবে। যেখানে কোনটীই বিকাশিত হয়না সেই স্থানেই উভয়শক্তির গুণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যত্র নয়।

অদৃষ্ট শক্তিটী কোন অদৃষ্ট নিয়মবশে বাহ্য ও অন্তর্জগৎ উভয়কেই চালিত করিতেছে। এই শক্তিটীর কিছুতেই বিনাশ নাই কিন্তু ইহার অসংখ্য রূপান্তর ও ভাবান্তর পরিদৃষ্ট হয়। একাংশে ইহার বিনাশ দৃষ্ট হইলে অপরাংশে ইহার বিকাশ দৃষ্ট হইবে। ইহা কোন কোন স্থলে অলক্ষিতভাবে কোন কোন স্থলে প্রকাশ্যভাবে কার্য্য করে। যাহা হউক, ইহার বিনাশ নাই বলিয়াই ইংরাজিতে এই মূল সূত্রটীর নাম Conservation of Energy বা শক্তির অক্ষয়ত্ব। ইহার প্রধান আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা Newton। পরে বহুশাস্ত্রবিৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি Helmholtz ইহাকে বিশেষ পরিণতাবস্থায় আনয়ন করেন। তিনিই প্রথমে বলিয়াছিলেন "Conservation of energy holds not only in our own planetary system; but also in the distant double stars * * * Every great deed of which history tells us every mighty passion which art can represent, every picture of manners, of civic arrangements, of the culture of peoples of distant lands or of remote times seizes and interests us, even if there is no exact scientific connection among them."

উপরি উক্ত কথাগুলি কতদূর সত্য তাহাই প্রতিপন্ন করা আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বিষয়টী অতি বিস্তীর্ণ ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। এক্ষণে

প্রথম জিজ্ঞাস্য এই, এই শক্তি দ্বারা আমাদের শরীর কিরূপে চালিত হয়। শরীরের উপর মনের আধিপত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাই আমরা পরিশ্রমের পর ক্লান্তি ও অঙ্গশৈথিল্য অনুভব করি, কলহের পর দৈহিক বৈকল্য অনুভব করি, ইত্যাদি। এগুলি হইবার আর কিছুই কারণ নয়, কেবল একমাত্র ঐ শক্তির অপূর্ব্ব কার্য্যকারী ক্ষমতা। শারীরিক বা দৈহিক ফলগুলি এত অনায়াসলভ্য ও অনায়াসবোধ্য যে তাহার উদাহরণ ও ব্যাখ্যা বেশী আবশ্যক করে না। কিন্তু আর এক প্রকার দৈহিক ক্রিয়া আছে যেগুলি আন্তরিক বা আভ্যন্তরিক। যেরূপ আহারের দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করি, ঔষধের দ্বারা রোগের শান্তি করি, ইত্যাদি। এস্থলে বক্তব্য এই যে আমরা দৈহিক যন্ত্রাদির সমস্ত বিষয়ই অতি সামান্য বা অসম্পূর্ণ ভাবে জ্ঞাত আছি বলিয়া আভ্যন্তরিক কোন প্রয়োগেই আমাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই—অন্ততঃ না থাকাই উচিত। Carlyle বলিয়াছেন "A Physician is one who pours medicine, of which he knows little, into a body, of which he knows less"। বাস্তবিক আমরা আহার, পথ্য, ঔষধের বিষয়ে যে প্রকার সূক্ষ্ম বিচার করিয়া থাকি সেরূপ করা " অতি বুদ্ধির " কাজ। অর্থাৎ আমরা ঐ সমস্ত বিষয়ে এইরূপ করিয়া থাকি যেন আমরা শরীরের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী বিশেষ রূপে অবগত আছি। এরূপ করা কোন মতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আজ আমরা শুদ্ধ ঐ শক্তিটীকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিব—যেখানে দেখিব ঐ শক্তির বিপরীত ভাবে বিকাশ হইবে সেই স্থলেই এ কার্য্যে নিবৃত্ত হইব, অন্যত্র নয়। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমাদের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। এস্থলে অধিক না বলিয়া পরে আমরা উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টী আলোচনা করিব। প্রত্যেক কার্য্যে ও প্রত্যেক চিন্তাবিন্দুতে ইহার কার্য্যকারিতার উদাহরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক মনোবৃত্তিতে, প্রত্যেক স্বাভাবিক প্রবণতায়, (natural tendency) প্রত্যেক হৃদয়োহিত স্বাভাবিক ভাবে ইহার আভাস পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতেও প্রতীয়মান হইতেছে বিষয়টী কত বিস্তীর্ণ, কত মহান্। সেই জন্যই ক্রমশঃ আমরা ইহার এক একটী কথা উপলক্ষ করিয়া ধীরে ধীরে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়া যাইব।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই. ইহা দ্বারা মন কি প্রকারে চালিত হয়। মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলি পরিণতির জন্য পরস্পরের সাহায্য আকাঙ্ক্ষা করে। বৃত্তিগুলি একদিনে পরিণতাবস্থায় আসেনা। প্রথমতঃ অবস্থাচক্রে কিয়ং-পরিমাণে গঠিত হইয়া পুনরায় চঞ্চল ও তরল অবস্থা হইতে ক্রমশ দৃঢ় ও প্রকৃত পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয়। এই মানসিক বৃত্তির সঙ্গে শারীরিক পরিণতি সম্ভবে না, তজ্জন্য শারীরিক সুখ, স্বচ্ছন্দ, অগ্রাহ্য করিয়া যে সময় মানসিক উন্নতির সময়, সেই যৌবনের প্রারম্ভেই মনের স্ফূরণ আবশ্যক। এই স্ফূরণ সহজে হয় না বলিয়াই, নানা প্রকার অবস্থাচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতে, নানা প্রকৃতির লোকের সহিত মিশিতে, মানবের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা প্রকার ভাবগতিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে শিক্ষা করা উচিত। এই সময় বাহ্যিক দেহের সৌন্দর্য্যে মোহিত না হইয়া আন্তরিক সৌন্দর্য্য শিক্ষা করা উচিত। দেহের সুখান্বেষণে রত না হইয়া হৃদয়ের অনন্ত সুখান্বেষণে যত্নবান হওয়া উচিত। সামান্য দেহের কষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া মানসিক বিকার ও ব্যাধি হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করা উচিত। দেখ রামপ্রসাদ বলিয়াছেন

মন করোনা সুখের আশা,
যদি অভয় পদে লবে বাসা।
* * * * *
ওরে সুখেই দুঃখ দুখেই সুখ ডাকের কথা আছে ভাষা,
মন ভেবেছ কপট ভক্তি কোরে পূরাইবে আশা,
লবে কড়ার কড়া তস্য কড়া এড়াবেনা রতি মাসা।

অতএব, যখন মানসিক উন্নতিই আমাদিগের অধিকতর বাঞ্ছনীয়, তখন শারীরিক সুখেচ্ছাকে আপাততঃ তত প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। মানসিক শক্তির অদ্ভুত বিকাশ শারীরিক শক্তির বিকাশকে আচ্ছন্ন করে না। এদিকে শরীরের ক্রিয়া মনের উপর নির্ভর করে। এই দুইটী বাক্য আপাততঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটী বড় চমৎকার সামঞ্জস্য আছে। অবশ্যই একটী আর একটীর কিয়দংশে অধীন।

একটী অপরটী কর্ত্তৃক চালিত হয়, অথচ দুইটীই স্বাধীন। যেমন অন্ধ ও খঞ্জ উভয়ে চলিতে অক্ষম হইলেও অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জ আরোহণ করিয়া পথ-প্রদর্শন করিলে অনায়াসেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তদ্রূপ এই দুইটী বাক্য পরস্পব বিরুদ্ধ হইলেও যুক্তকার্য্যে কার্য্যফলের কোন প্রকার হানি হয় না। তবেই দেখা গেল মনকে ও শরীরকে এই শক্তিটী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শাসন করিতেছে। মনের কার্য্যগুলি Psychic force টী দ্বারা সম্পাদিত হয়, আর দেহের কার্য্যাবলী Physical force টী দ্বারা সম্পাদিত হয়। আর এই দুইয়ের পরস্পর সাহায্যে যে শক্তিতন্মাত্র উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাই জগতের কার্য্য সম্পাদিত হয়। জগতের কতকগুলি কার্য্যের কারণ আমরা সহজবুদ্ধিতে নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম নহি। এই গুলিই অদৃষ্ট বশে হইয়া থাকে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। বাহ্য জগতের কার্য্যাবলীর ফল ও কারণ নির্দ্দেশ করা সর্ব্বকালে মানুষের সম্ভব নয়। তবে যতদূর পারা যায় ও গিয়াছে তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই শক্তির কার্য্য বিশ্ব-জনীন (Universal)। বাস্তবিক আমাদের ও ধারণা এই যে এইরূপ একটী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া কার্য্য প্রণালীর অবস্থা ও গতি নির্ণয় করিলে যখন জগতের সমস্ত কার্য্যকারণতত্ত্ব প্রাঞ্জল ও বিশদ হইয়া আসে, যখন ঈশ্বরের সত্তা বিষয়েও এতদ্দ্বারা কতকটা প্রতীতি জন্মায়, তখন তাহা স্বীকার না করিব কেন? যখন এই শক্তিটীই সমস্ত জগৎকে নিজবশে রাখিয়াছে ও স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতেছে, যখন ইহার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই, যখন ইহা এক ও অদ্বিতীয়, কেবল রূপান্তর ও ভাবান্তর ভাবী মাত্র, তখন এই শক্তিকেই ঈশ্বর বলিয়া হৃদয়ে বিশ্বাস করিনা কেন? যখন স্থূল সূক্ষ্ম. গুরু লঘু, ক্ষুদ্র বৃহৎ, শারীরিক, মানসিক, পার্থিব ও অপার্থিব সমস্ত বৃত্তিকেই এই অবিনশ্বর, অক্ষয়, অচিন্ত্য শক্তি অনুশাসিত করিতেছে, যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা জ্ঞাত হই যে ঈশ্বরের কার্য্যও কতকটা এইরূপ তখন এই অদ্বিতীয় শক্তিটীকে ঈশ্বর বলিতে হানি কি? অন্ততঃ ঈশ্বর যে অলক্ষিতভাবে এই শক্তি দ্বারা জগৎ প্রণোদন করিতেছেন, কিম্বা এই শক্তিই যে ঐশ্বরিক শক্তি তাহা বলিতে হানি কি? বিশেষতঃ যৎকালে এই শক্তিটীর অসংখ্য রূপান্তর বা ভাবান্তর প্রত্যহ আমাদের সম্মুখে পরিদৃশ্য-

মান রহিয়াছে, তখন এই এক একটী রূপান্তরকেই ঐ ঈশ্বরের রূপান্তর বলিয়া মনে করিনা কেন ? কেন আমরা হিন্দুর তেত্রিশকোটী দেবতার উপর তাদৃশ শ্রদ্ধা আস্থা ও বিশ্বাস করিনা ? তেত্রিশকোটীও সামান্য কথা। ইহার কোটী কোটী রূপান্তর ঈশ্বরের শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সেই সমস্তগুলি বর্ণনা করা আজ কাল আমাদের সাধ্যাতীত। প্রাচীনঋষিগণ বিশেষ বহুদর্শী সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন বলিয়াই তাঁহারা তেত্রিশ কোটী দেবতার রূপ বর্ণনা বা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তেত্রিশ কোটীর পরিবর্ত্তে কোটী কোটী রূপ হইলেও ঈশ্বরের রূপ বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। যখন অদৃষ্টবাদ, প্রায়শ্চিত্ততত্ব, প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলি এই একটী মাত্র শক্তির বলেই মীমাংসিত হইতেছে, তখন এই শক্তিই যে ঈশ্বর নয় তাহা কে বলিবে ? মানুষের সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, নিরন্তর চক্রপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। অনভ্যস্ত পাপ করিলেই শাস্তি আছে, অন্তরে অন্তরে তজ্জনিত বিষম যাতনা আছে । উচ্চ হইলেই নীচ হইতে হয় নীচ হইলেই উচ্চ হওয়া যায়। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা যে এই একমাত্র ঐশ্বরিক শক্তিদ্বারা সংঘটিত হইতেছে ইহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে এইরূপ আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক ঘটনাগুলি কিরূপে সংঘটিত হয় তাহা আমরা নানা বিষয়ক উদাহরণ দ্বারা একে একে প্রমাণীকৃত করিব। বাস্তবিক ইহা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণ না হইলেও Induction দ্বারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধা কি ?

আমাদের একটী ডাকের কথায় আছে "ছোট হবি ত বড় হ, বড় হবি ত ছোট হ" এটী একটী বিশেষ সারবান কথা। একদিকে আধিপত্য বা সম্পদ আকাঙ্ক্ষা করিলে অপর দিকে প্রকারান্তরে বিপদ বা স্বার্থত্যাগ অবশ্যম্ভাবী। একটী গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিতে হইলে অপর স্থানের মৃত্তিকা আবশ্যক। নিক্তির এক দিক্ ঝুলিয়া পড়িলে অপর দিকটী উচ্চ হয়। ইত্যাদি। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া আমরা মনে করিব যে সুখেই আমাদের এই শক্তির বিকাশ, দুঃখেই ইহার হ্রাস বা বিনাশ। আমরা পদে পদে দেখিতে পাই যে পরিশ্রমই ভাবী পুরস্কারের, ও আলস্যই যাবতীয় অনিষ্টের মূল কারণ। কারণ একটী জীবনে ঐ শক্তির যে অংশটুকু মনুষ্যের উপর কার্য্য করে তাহার কিয়-

দংশ পরিশ্রমরূপে ব্যয়িত হয়, অর্থাৎ পরিশ্রমটাই ঐ শক্তির হ্রাস ও বিনাশ, সেই হেতু পরে ইহার ফল হইবে ঐ শক্তির বিকাশ অর্থাৎ সম্পদ অথবা সুখ। তদ্রূপ আলস্য পরিশ্রমের বিপরীত ভাব বলিয়া উহার ফলও বিপরীত হইবার কথা। আমাদের মতে অহঙ্কারদমন, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি পরকালে না হইয়া ইহজন্মেই হইয়া থাকে, কারণ মৃতদেহে এই শক্তির কার্য্যকারিতা ততদূর প্রবল নয়। এমন কি কিছুই নয় বলিলেও হয়। তবে যদি প্রেতাত্মার অবিণাশিত্ব স্বীকার করা যায় তাহা হইলে জীবনান্তেও ফল অনুভূত হয়। সেই জন্যই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে পরকাল স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ নয়। তবে সমস্ত reaction গুলি যাহাদের ইহজীবনে হইয়া উঠে না তাহাদিগকেই আবার পরকালে কষ্ট ভুগিতে হয়। সেই কষ্ট ভোগ করিবার জন্যই মরণান্তে প্রেতরূপে তাহারা কখন কখন সেই যন্ত্রণাফল ভোগ করিয়া থাকে। তাই বলিয়াই কি পুণ্যাত্মা লোকের প্রেত দৃষ্ট না হইয়া পাপীর প্রেত দৃষ্ট হইয়া থাকে?

[ক্রমশঃ]

মহাশক্তি।

(২) আমাদের দেশে, এমন কি যে দেশে ভাষার প্রচলন আছে, সেই দেশেই, একটী কথায় আছে "সবুরে মেওয়া ফলে" (English version:—Patience is bitter but its fruits are sweet)। এটীর অর্থ আর কিছুই নয়, কেবল ধৈর্য্যে যে পরিমাণে মানসিক বলের ও শক্তির প্রয়োজন তাহাতে পরে সেই পরিমাণে সেই বলের কার্য্য ও ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। আপাততঃ কিয়ৎ পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক ত্যাগস্বীকার করিলে, পরে তাহার ফল অতি সুস্বাদু হইবারই কথা, কারণ ঐ শক্তির অনুরূপ পরিমাণ (Equivalent) পরে সুস্বাদু ফলে পরিণত হইবে। একটী পাঠ একশত বার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, একবার কাগজে কলমে করিলে ঠিক তদনুরূপ ফল হয়। ইহার অর্থ এই যে একশত বার পড়িতে যে শক্তি আবশ্যক হয় একবার মাত্র লিখিতে তত টুকুর প্রয়োজন, অতএব দুইয়েরই ফল সমান। (এস্থলে আমরা শ্রুতধরের কথা বলিতেছি না) এই জন্যই আমরা যৌবনপ্রাপ্ত লোকদিগকে বারম্বার বলিয়া আসিতেছি যেন তাঁহারা এককালে সুখপঙ্কে নিমজ্জিত না হন। এই সময় সুখাস্বাদ করিলে তাহার বিষময় ফল পরে পরিলক্ষিত হইবে। সুখের দোলায় দোলায়মান থাকিলেও, অন্ততঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক একটু কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করিবে। মানুষ সর্ব্বদাই দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সুখান্বেষণেই রত হয় বটে, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মবশে, মনুষ্যজীবন সমভাবে সুখদুঃখময়। নিরবচ্ছিন্ন সুখ এ জীবনে মরীচিকাবৎ। এই জগতে অধিকাংশ লোকই দুঃখটুকু ছাঁকিয়া সুখটুকু আস্বাদন করিতে ইচ্ছা করেন, দুঃখকে স্বকরে আলিঙ্গন করিতে কেহই ইচ্ছা করে না। কেবলমাত্র তিনটী শ্রেণীর লোক দুঃখকে প্রধান শিক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। কোনটী স্বাভাবিক তাহা আমরা বিশেষ যত্ন করিয়াও স্থির করিতে পারি নাই। বাস্তবিক জগতে থাকিয়া ভাল আশা করা কেবল আশা মাত্র। সেই তিন শ্রেণীর লোক এই:—

(ক) যাহারা ভোগে ও ভোগাভিলাষে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, দুঃখের নানাপ্রকার

সুমিষ্ট ফলগ্রহণ ও আস্বাদন করিয়াছে, ইহার যাবতীয় আনুষঙ্গিক ব্যাপার বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা ও নিরীক্ষণ করিয়াছে, শেষে সুখে বিতৃষ্ণ হইয়া এক্ষণে এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান রহিত।

(খ) যাহারা সন্তোষ শিক্ষা করিয়াছে অর্থাৎ যাহাদের কিছুতেই কষ্ট নাই, বেগ নাই, চাঞ্চল্য নাই, কি সুখে কি দুঃখে, যাহারা সর্ব্বত্রই সমান আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে।

(গ) যাহারা এরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বিজাতীয় উৎকট সুখের ফল সন্দর্শন করিয়া সুখে এক প্রকার বিতৃষ্ণ হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই স্থিরনেত্র ও সূক্ষ্মদর্শী, ইহারা সর্ব্বদাই দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে। ইহারা নিজে সুখজিত না হইলেও অপরের কথা ও বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একপ্রকার জয়ী হইয়াছে। এইরূপ শিক্ষালাভের ফল পরে দেখান যাইবে। ইহাতে বিশেষ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণতা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এক্ষণে ধৈর্য্যশিক্ষার দুই একটী দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের নবীনা যুবতীরা ও নব্য যুবকগণ অধিকাংশ সময়ই নভেল ইত্যাদি সুখ ও সহজপাঠ্য পাঠে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। নভেল পঠন দুই প্রকার—(১) আমোদের জন্য (২) শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। প্রথমটীতে কিছুই ফল নাই, কারণ তাহাতে ধৈর্য্যের আবশ্যক করে না। দ্বিতীয়টীর ফল অতি উত্তম ও মধুর, কারণ তাহাতে বিশিষ্ট শ্রম, শক্তি, বিবেচনা ও মস্তিষ্কচালনার আবশ্যক। প্রথমটীর ফল এক প্রকার মানসিক বিকার মাত্র। দ্বিতীয়টীতে মনঃসংযোগ, ধৈর্য্য আবশ্যক করে বলিয়াই ইহার ফল মানসিক উন্নতি ও শিক্ষালাভ। প্রথমটীতে এইগুলি প্রয়োগ করিতে হয় না বলিয়াই ঐরূপ পাঠের ফলোদয় কিছুমাত্র হয় না, পাঠের কার্য্যকারিতা বিশেষ উপলব্ধ হয় না। আবার দেখ, ধর্ম্মোপার্জ্জনের পথে কত বিঘ্ন, কত বিপত্তি, কত আশঙ্কা, কত লজ্জা, কত সংশয়, কত কষ্ট। এইগুলিকে জয় করিতে যে শক্তির প্রয়োজন ঠিক তাহার অনুরূপ শক্তির বিকাশ পুণ্য-ফলরূপে সঞ্চিত হয়। এই শক্তির এবম্বিধ স্ফূরণই জীবনের প্রধানতম ও প্রিয়তম লক্ষ্য। পাপকর্ম্মে বাধা নাই, ব্যাঘাত নাই বরং উপস্থিত আমোদ আছে ও উৎকট আকাজ্ক্ষা আছে, এই জন্যই ইহার ভবিষ্যৎ এত শোচনীয়। এই জন্যই

অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, গরিমার পতন হয়, কামের ফলভোগ হয়, উচ্চাশার ব্যাঘাত হয়।

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে সুখ দুঃখ, সম্পদ্ বিপদ্, আত্মাদর, অভিমান প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের মন যৎকালে একই প্রকার নিয়মবশে বাহ্যজগতের ন্যায় চালিত হইতেছে তখন সুখ দুঃখ ইত্যাদি মনুষ্যেরই বা কতটা অধীন আর অদৃষ্টেরই বা কতটা অধীন? এ প্রশ্নের উত্তরের আমরা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি। এক্ষণে বলিব যে, যে সুখ শরীরকে সুখী করে তাহা মনুষ্যের অর্থাৎ কৃৎশক্তির (Physical-force) অধীন। আর যে সুখ মনকে সুখী করে তাহা চিৎশক্তির (Psychical-force) অধীন। এই Psychic force আমাদের জ্ঞান (Consciousness) উৎপাদন করে বলিয়াই আমরা শারীরিক কষ্টকে দূরে ঠেলিয়া মানসিক সুখের আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই সুখ দুঃখ ক্রমশঃ আমাদের শরীরে অভ্যস্ত হইয়া যায়। অপরের স্বাভাবিক হৃদয়ভেদী ক্রন্দন দর্শনে আমরাও নয়নজলে অভিষিক্ত হই; আবার শিশুর স্বাভাবিক মধুর হাসি দর্শন করিয়া আমাদের মনে অপার আনন্দ আসিয়া জুটে। এরূপ হয় কেন? যখন ঐ অদ্বিতীয় শক্তিটী একবারে হঠাৎ কার্য্য না করিয়া ক্রমশঃ ধীরে ধীরে কার্য্য করে, তখনই আমাদের প্রকৃত অভ্যাস আরম্ভ হয়। আর যখন সহসা আসিয়া ইহার প্রচণ্ড কার্য্যকারিণী শক্তি দেখাইতে যায়, তখনই আমাদের হৃদয়ে এক একটী উচ্ছ্বাসের স্বজন হয়। যে শক্তি শিশুর হাসিটী উত্থিত করিতেছে তাহা এত স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্য করিতেছে যে, তাহার এক অংশ আমাদের হৃদয়তন্ত্রীকে বাজাইয়া দেয়—তাহাতেই আমাদের ঐরূপ আনন্দ উপস্থিত হয়। যাহার হৃদয় নাই, মমতা নাই, প্রেম নাই, সহানুভূতি নাই, তাহার মন ঐ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইতে পারে না বরং বিকৃত ভাবে কার্য্য করিয়া হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তির উদ্রেক করায়। সে হৃদয় স্বাভাবিক হৃদয় নয়। আজ কাল একপ্রকার সভ্যতার গুণে এই হৃদয় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। আজ কালকার সভ্যতালোকে আলোকিত হৃদয়ে মমতা, দয়া শূন্য হইয়া পড়িতেছে। আজ অভ্যাগত অতিথি মুষ্টিভিক্ষা পায় না, আজ অর্থ দিয়া ভাসা ভাসা

পরোপকার হয়, কিন্তু হৃদয় দিয়া পরোপকার অতি বিরল। আজ ধনীর মানই মান, গরীবের মান ছাই—তাহারা আজ সমাজের একঘরে। তাই কি মেকলে (Macaulay) বলিয়াছেন "As civilisation gradually advances poetry begins necessarily to decline.

এইরূপ হইবার বিশেষ কারণ আছে। আমরা সচরাচর কৃৎশক্তিটী অনায়াসেই আয়ত্ত ও উন্নত করিতে পারি। এটী বাহ্যিক শক্তি বলিয়া আমরা সাধারণ বাহ্যিক নিয়মে, প্রত্যক্ষ প্রণালীমতে পরিণত করিতে সমর্থ হই। উপযুক্ত আহার দ্বারা, উপযুক্ত অভ্যাস দ্বারা, উপযুক্ত ব্যায়াম দ্বারা, উপযুক্ত সদনুষ্ঠান দ্বারা, আমরা কৃৎশক্তির অতি সহজেই উন্নতি সাধন করিতে পারি, কিন্তু চিৎশক্তির উন্নতি তত সহজে হয় না। সেটী আন্তরিক শক্তি, তাহার ভিতর অনেক গূঢ় কাণ্ড নিহিত আছে। কার্য্যদ্বারা তাহার বাহ্যিক স্ফূরণ বা বিকাশ হয় না। কি উপায়ে তাহার উন্নতি ও পরিণতি হয় আমরা সবিশেষ তাহা অবগত নই। কিন্তু ঐ সমস্ত অবক্তব্য উপায়গুলি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষা করা বহু শ্রমসাপেক্ষ। বাস্তবিক চিৎশক্তির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত গুরু ও দেশ কাল পাত্রের প্রয়োজন, সেই জন্যই আমরা বলিতেছিলাম কৃৎশক্তির স্ফূরণ যত শীঘ্র হয়, চিৎশক্তির স্ফূরণ তত শীঘ্র হয় না।

উনবিংশ শতাব্দীর বাহ্যিক উন্নতিবিধান করিতে—আহারের তদ্বির, বসন ভূষণের পারিপাট্য, স্কুল, কালেজ, পাঠশালা, আশ্রম, রাস্তা ঘাট, রেল, ডাক, তার, সভা, সমিতি, সম্বাদ ও সাময়িকপত্র, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা, বক্তৃতা ইত্যাদির জন্য চিৎশক্তির কিছুই প্রয়োজন নাই। এ গুলি পার্থিব উন্নতি, এগুলি অর্থের দ্বারা বিস্তীর্ণ হয় ও প্রাপ্ত হওয়া যায়। আবার যে প্রকার উন্নতি কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা লাভ হয় তাহাই পার্থিব উন্নতি। আজকাল নব্য বাবুরা যে উন্নতির জন্য কণ্ঠস্বর বহির্গত করিয়া থাকেন তাহা পার্থিব উন্নতির আদর্শ। স্বর্গীয় উন্নতির চরমসীমায় ভারতবর্ষ এককালে উঠিয়াছিল। সে উন্নতি অন্য দেশের পক্ষে অভিনব বোধ হইলেও ভারতের পক্ষে নয়। আজ কালের বশে ও অভ্যাসের দোষে, সে উন্নতি আর উন্নতি বলিয়া গণ্য হয় না বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কারণেই হউক, ঐ উন্নতির

ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। অদ্যাপি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্ট হয় তাহাও লোক বিশেষের মধ্যে। সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের মধ্যে সে উন্নতির আদর আমরা কই দেখিতে পাই? শেষোক্ত উন্নতির আদর নাই বলিয়া ও পূর্ব্বোক্ত উন্নতির শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়াই মেকলে বলিয়াছেন "—যে দেশে পার্থিব উন্নতি প্রবেশ করিয়াছে সে দেশ হইতে হৃদয় চলিয়া গিয়াছে, উন্নত গভীর ভাব সে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। দয়া মায়া সে দেশের বক্ষঃস্থল পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, সে দেশের অন্তঃসারবত্তা কিছুই নাই"।

(৩)। অঙ্কশাস্ত্রে বলে "Friction adapts itself to motion" অর্থাৎ গাড়ীখানি প্রথমে চালাইতে ঘোড়ার যতটুকু কষ্ট হয় শেষে তত হয় না, ক্রমশঃ গতি সহজ হইয়া আইসে। এইরূপ misery adapts itself to progressin this world অর্থাৎ সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হইলে কষ্ট ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যায়, যদিও প্রারম্ভে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। যাহার হৃদয় স্বাভাবিক, তাহার হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে আবিষ্ট হইলে স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। এই হেতু স্বাভাবিক কার্য্যাবলী অভ্যাস দ্বারা অনায়ত্ত থাকে না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য স্বাভাবিক বলিয়াই সে গুলি আয়াসসাধ্য। ঈশ্বর লোক বিশেষকে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি ও প্রবৃত্তি দ্বারা ভূষিত করিয়া সৃজন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সেই সেই বৃত্তি গুলির সম্যক্ পবিচালনা করিলেই সেইগুলি সফলতা প্রাপ্ত হয়, নচেৎ হয় না। এই বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি স্বাভাবিক নিয়মে হয় ও সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য ঐ ঐ বৃত্তিসাপেক্ষ বলিয়াই সমস্ত ধর্ম্মই অভ্যাসদ্বারা লব্ধ হইতে পারে।

(৪) আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক ভেদে দুইটী স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে। সামাজিক কঠোরতায় ও সামাজিক নীতি পদ্ধতির (etiquette) সুদৃষ্টান্তে মানুষের অন্তরে যে ক্ষণিক ভাবমূলক প্রকৃতির উৎপত্তি হয় তাহাই বাহ্যিক প্রকৃতি। অবশ্যই আন্তরিকের সহিত ইহার বহুল পরিমাণে সম্বন্ধ থাকিলেও ঐ সমস্ত ব্যবহারিক ক্রিয়া দ্বারা সেই সমস্ত ভাবের পরিণতি ও স্ফূর্ত্তি হয়। আন্তরিক প্রকৃতিটী স্বভাব ও কতকটা সংস্কারজাত। অবস্থাভেদে প্রথমটীর পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু শুদ্ধ অভ্যাস

ব্যতীত, অন্য কোন শক্তিদ্বারা দ্বিতীয়টীর পরিবর্ত্তন নাই, ও সম্ভবও নয়। আন্তরিক প্রকৃতি বাহ্যিক প্রকৃতিটীকে কখন কখন চালিত করে, কিন্তু সকল সময় নয়, কারণ সময়ে সময়ে শেষোক্তটিই বেশী প্রবল হইয়া উঠে। আন্তরিক প্রকৃতিটী নিজবশে রাখিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রয়োগভেদে শিক্ষাও আবার দ্বিবিধ—Practical ও Theoretical। মন যাহা ইচ্ছা করে, শরীর যদি তাহা সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা হইলেই শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইল। শিশুগণ ইচ্ছাসত্ত্বেও একটী রমণীয় দ্রব্য ধরিতে পারে না, কারণ শিশুদের উভয় শিক্ষাই অসম্পূর্ণ। শুদ্ধ theoretical শিক্ষার দোষ এই যে মনের ভাব মনেই বিলীন হইয়া যায়, বাহিরে তাহার স্ফূরণ হয় না। লোকে জানে " কখনও মিথ্যা কথা কহিওনা "—ইহাতে দোষ আছে তাহাও বিশেষরূপে জানে। কিন্তু তথাপি মিথ্যা কয় কেন? কারণ তাহাদের এ বিষয়ে Practical শিক্ষা হয় নাই। যে বালক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছে, সেই ত অধিকাংশ নীতিবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে কয় জন? যদ্যপি কাহারও একটী অসৎকার্য্যে মতি হয় তাহা হইলে তাহার সেই কুমতি শুষ্ক শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ফিরিলে বা ফিরাইলে যত উপকার হয়, কার্য্যে (Practically) অর্থাৎ নিজের অভিজ্ঞতা বলে ও নিজে সেই অসৎকার্য্যের ফলভোগ করিয়া ফিরিলে বা ফিরাইলে তাহার অপেক্ষা শতগুণ উপকার দর্শে। সেই জন্যই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে দেশপর্য্যটন (continental tour) শিক্ষার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কারণ ইহাতে কার্য্যতঃ অনেক শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুবিধা আছে। আমাদের একটা কথায় আছে—

একবার যোগী, দুবার ভোগী,
তিন বার হ'লেই, হ'ল রোগী।

অর্থাৎ লোকে একবারমাত্র পাপকরিলে তাহাকে যোগী বলা যাইতে পারে, দুইবার পাপ করিলে পাপের ভোগ হইল বটে কিন্তু প্রকৃত পাপী নাম হইল না। তিন বার পাপ করিলেই আর নিস্তার নাই, ঐ কার্য্যটী তাহার রোগের মধ্যে হইয়া গেল—সে কখনও আর এ পাপ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। ইহার কারণ এই যে একটী লোক একবারমাত্র পাপ করিলে সে একটী

অবৈধ শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিল। কিন্তু পরে তাহার জ্ঞানোদয় হইলে তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত যেটুকু ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগ আবশ্যক তাহা যদি করে তাহা হইলে ঐ ধৈর্য্যের ফলস্বরূপ সে পরে ততোধিক সাধু হয়। কারণ যদি সে এককালেই অধর্ম্ম না করিত তাহা হইলে তাহাকে আর ধৈর্য্য প্রকাশ করিতে হইত না। তাহা হইলে সেই শক্তির ততটা আবশ্যক হইত না, তাহা হইলেই তাহার যোগী নাম সার্থক হইল। দুই বার প্রলোভনে পড়িয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে যোগী নামের আরও সমধিক সার্থকতা হয় বটে, কিন্তু তখন তাহাকে ভোগী বলিতে হইবে। কিন্তু তিনবার প্রলোভনে পড়িলে, মনুষ্যের এরূপ দৃঢ় মানসিক শক্তি নাই যে তদ্দ্বারা সে সেই প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন সে একবারে রোগী অর্থাৎ পাপব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ বারম্বার পাপ করিলে সেই শক্তিটী ধৈর্য্যশক্তিটীর উপর বিশেষরূপ আধিপত্য করিয়া বসে, তখন তাহার উদ্ধারের পথ কণ্টকাবৃত হইয়া পড়ে। তাই Shakspere বলিয়াছেন "Best men are moulded out of faults"। তাই, নিজে শিক্ষার গুণে ভাল হইলে উত্তম; অন্যের দেখিয়া চরিত্রসংস্কার করিলে উত্তমতর; নিজের ফলভোগ দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলে উত্তমতম। কারণ শেষটীতেই Practical শিক্ষার প্রাপ্ত হইল। Theoretical শিক্ষার প্রয়োগ আমাদের মনোবিজ্ঞানে (Philosophy), আর Practical শিক্ষার প্রয়োগ সাহেবদের ডাক্তারী বিদ্যায় (Medical science) ও আমাদের হিন্দুর কার্য্যকলাপে। সেই হেতু Bain বলিয়াছেন "morality is a department of *practice* or it is a knowledge applied to pratice or useful ends, like medicine or politics."

(৬)। আজকাল আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকের ইহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই। না থাকিবারই কথা। ঔষধের ক্রমানুযায়ী তেজঃবৃদ্ধি ইহা সহজে কে বিশ্বাস করিবে? সাধারণতঃ লোকে জানে মাত্রানুসারে ঔষধ কার্য্য করে। কিন্তু আমাদের সম্প্রতি ইহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার হানিমান সমস্ত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ

পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কোন দ্রব্য স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কোন শক্তির দ্বারা রূপান্তরিত হইলে তাহার তেজ বর্দ্ধিত হয় কি না? আমরা আমাদের সামান্য সূত্র (principle) ধরিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে বাস্তবিক হানিমানের ঔষধের ক্রমপ্রণালী একেবারে ভ্রান্ত নয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একটী দ্রব্যের পরমাণুগুলির মধ্যে কোন প্রকার শক্তিই বিকাশিত হয় না কিন্তু তাহার উপর বাহ্যিক কোন শক্তি প্রয়োগ পূর্ব্বক পরমাণুগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা করিলে সেই শক্তিটী গুপ্তভাবে ঐ বস্তুতে নিহিত থাকে, পরে তাহা দেহের ভিতর প্রকাশ পায়। এই হেতু লঙ্কা কি অন্য দ্রব্যকে যতই পরমাণুসাৎ করা যায় ততই তাহার কটু আস্বাদন বৃদ্ধি পায়। এইটীই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মুল সূত্র—ইংরাজীর strains ও stresses কতকটা এইরূপ, অন্ততঃ এই গুপ্ত শক্তির বিকাশ strain ও stress নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভূত বলিলেও বেশী ক্ষতি হয় না।

(৭)। দৃঢ়সঙ্কল্প এত বলবান্ কেন? আমরা কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি, মানুষ সঙ্কল্পগুণে নিজের ও পরের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হয়। সঙ্কল্প না থাকিলে আমরা কোন কাজই করিতে পাইতাম না। একটু বাধা দেখিলে ভীত হইতাম, একটু বিঘ্ন দেখিলে পশ্চাদ্‌পদ হইতাম, লোকের বিদ্রূপে জড় হইয়া পড়িতাম, তাহা হইলে আর আমাদের কার্য্যকারিণী শক্তি কোথায় থাকিত? অতএব Intensity of will এবং অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্পের এত ক্ষমতা কেন? আমরা এই সঙ্কল্প দ্বারা প্রবল যথেচ্ছাচারী রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে পারি—এই রূপে সেইগুলি সুপ্রণালী পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সম্মুখে ধাবমান হইয়া সঙ্কল্পরূপে অন্যদিকে পরিণত হয়। এই সঙ্কল্পের কত ক্ষমতা তাহা একটী প্রবন্ধে দেখান যায় না। তবে আমরা শুদ্ধ দেখাইব যে অন্যের বিশ্বাসটা এই সম্বন্ধে কতদূর আবশ্যকীয়। আমরা বলিয়াছি অন্যের ইচ্ছায় আর একজনকে বশীভূত করিতে গেলে শেষোক্ত ব্যক্তির বিশ্বাস (faith) আবশ্যক। যে শক্তি প্রথম- ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে সেই শক্তিই বা তাহার কোন অংশ সঙ্কল্পরূপে অন্য দিকে চালিত হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাসন করিতেছে। তবেই প্রথমের সঙ্কল্প যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসের বল প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইচ্ছানুরূপ

ফল পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির বিশ্বাসরূপিণী শক্তি না থাকিলে প্রথমটীর সঙ্কল্পরূপিণী শক্তি তাহার সহায় না হইয়া তাহার কতকটা প্রতি-কূলে গিয়া দাঁড়াইল। তাহা হইলেই সঙ্কল্প শক্তির একটু হ্রাস হইয়া কার্য্য পক্ষে একটু অন্তরায় হইয়া উঠে। এই রূপ বিশ্বাস থাকিতে সঙ্কল্প না থাকিলে একটু শক্তি হ্রাস হইয়া যায় তাহার ফল ও তদনুযায়ী শুভ বা ইচ্ছা-মত হয় না। আমাদের স্বস্ত্যয়ন, যজ্ঞ প্রভৃতি এই নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে। যাজকের সঙ্কল্প ও যজমানের স্থির বিশ্বাস বা ভক্তি এই উভয়ে মিলিত হইয়া ঈপ্সিত ফল প্রদান করে। কিন্তু আজকাল যাজকেরও সঙ্কল্প নাই, যজমানেরও ভক্তি নাই, কাযে কাযেই ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। যাহা হউক ইহাতে প্রতীয়মাণ হইতেছে যে একদিকে শুদ্ধ সঙ্কল্প কিম্বা শুদ্ধ ভক্তি থাকিলেও ঈপ্সিত ফলের অৰ্দ্ধেক লাভ করা যায়। কারণ একটী মাত্র শক্তিই যৎকালে বিভিন্নরূপ ধারণ পূর্ব্বক একজনকে ইচ্ছা রূপে এক জনকে ভক্তিরূপে শাসন করিতেছে তখন তাহার অংশের দ্বারা আংশিক ফল লাভ করিব না কেন? এই শক্তির আর একটী বিশেষ গুণ আছে। যদ্যপি সঙ্কল্প-কারী ও ভক্তিদায়ী এই দুইএর মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা কিম্বা অন্য কোনরূপ অবিচ্ছেদ্য বন্ধন থাকে তাহা হইলে এই শক্তি আরও বেশী কার্য্য-কারী হয়; কারণ এই নূতন শক্তিটী আবার সেই দুইএর শক্তিটীকে অধিকতর সম্বদ্ধ করে। কাযেই ফল বেশী হইবার সম্ভাবনা। তাই কোন কবি বলিয়াছেন—

"আমি ভক্তির জোরে কিন্‌তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী।"

ভক্তির আর একটী উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই, সকল ধর্ম্মের সার ভক্তি। ভক্তিতে লাভ করা যায় না এমন ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ। যাহার হৃদয়ে শুদ্ধ ভক্তিরূপা শক্তি আছে, তাহার সমস্তই আছে। সকল ধর্ম্মের মূল, সকল ধর্ম্মের সার, সকল ধর্ম্মের অন্ত যে ভক্তি—সে ভক্তি যার আছে তাহার কিসের অভাব?

আভীরা।

(১)

দূর শূন্যে নীলছবি পাহাড়ের তলে
ছেয়ে আছে শ্যামল প্রান্তর!
দূরে দূরে সারিগাঁথা তালরাজি শিরে
কাঁপিতেছে ক্ষীণ রবিকর!

(২)

দিশাহারা ভাসি চলে মেঘ-পোত গুলি
গগণের নীলিমা-সাগরে!
চমকি দেখিছে ধীরে জ্বলিতেছে দূরে
কনকাদ্রি পাহাড়ের শিরে।

(৩)

আভীরা কিশোরী বসি সপ্ত পর্ণ মূলে
কাছে বসি নওল কিশোর!
বিচরিছে কাছে কাছে গাভী বৎস গুলি
দুঁহে দোঁহা নেহারিতে ভোর।

(৪)

বালিকা মাধুরী নামে, কিশোর রাখাল,
প্রতিবেসী কুটুম্বের ছেলে—
চির সাথী-সখী সখা, শিশুকাল হতে,
দিবস কাটিছে হেসে খেলে।

(৫)

প্রীতিসরলতামাখা মাধুরীর মুখে—
ভাসিতেছে হাসির কিরণ!
মুক্ত অনিলের সখী, বনের ব্রততী,
তেমনি সে ভোলা খোলা মন।

(৬)

চাহি চাহি সে আননে সুখে ভরা বুক
সখা বলে " সইলো মাধুরি !
প্রভাতে শুনেছি আজি সুখের বারতা "
মাখা তাহে আনন্দ লহরী !

(৭)

" মাথা খাস্, কি কথাটী বল্ না, রাখাল ! "
ঝরে মধু ধীর মৃদুভাষে !
সখা হেরে নব শোভা মাধুরী-আননে
আগ্রহের আলু থালু বেশে।

(৮)

বলে সখা—" শুয়েছিনু কুটীরে যখন,
মা বাপের কথা গেল কানে !
দোঁহে বলিছেন, হবে সুখপরিণয়,
রাখালের মাধুরীর সনে ! "

(৯)

পলকে শুকায়ে গেল মধুর মাধুরী,
মেখে হায় সলিল দর্পণ !
আবার ভাসিল হাসি তখনি পলকে
চাহি চাহি সখার আনন।

(১০)

" দাসী তোর পরিণয়ে হব কেন ভাই,
তেয়াগিয়ে বাপের ভবন ?
ঘোমটায় মুখ তবে হবে আবরিতে—
আমা হতে হবে না তেমন !

(১১)

" এমূনি করে দুর্ব্বাদলে গোঠের বাতাসে
দুজনে কি ছুটিবারে পাব ?

না রাখাল, ও সব কথা শুনিস্‌নে ভাই,
মা বলিলে আমি তাই কব ! ’”

(১২)

শ্যাম তরঙ্গের রাজি উঠিছে পড়িছে
শস্যক্ষেত্রে অনিল হিল্লোলে !
রাখালে মাধুরী ভোর অবসর বুঝি,
বুধি শনি ধায় কুতূহলে !

(১৩)

তখন চাহিয়ে বালা হেরে গোঠ পানে
অমনি সে লইল পাঁচনী !
নিথর গগণতল কাঁপাইয়ে ডাকে—
“ ফিরে আয় ওলো বুধি শনি ! ”

(১৪)

ছুটি চলে তড়িতের লতিকার মত
আভীরা সে মধুর মাধুরী !
রাখাল চাহিয়ে রহে অনিমেষ আঁখি,
মরমেতে বাসনা লহরী !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সমাজ তত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জড় জগতের যেমন বিজ্ঞান আছে, তেমনই মনুষ্য জগতের বিজ্ঞান আছে। জড় জগতের যেমন কতকগুলি শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে ; সেইরূপ মনুষ্য জগতের শক্তি আছে, নিয়ম আছে, তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রত্যেক

জড় পদার্থের যেমন কতকগুলি শক্তি বা গুণ আছে, তাহার সংশ্লেষ ও বিশ্লেষ প্রাকৃতিক ঘটনার মূল, সেইরূপ প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্মের সংশ্লেষ ও বিশ্লেষই সামাজিক ঘটনা সমূহের মূল। সংক্ষেপতঃ প্রাকৃতিক ঘটনাসকলের ন্যায় সামাজিক ঘটনাসকলও নিয়মাধীন।

মনুষ্য জাতির আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অজ্ঞাত ছিল। কোন মহান ব্যাপার দেখিলেই মনে ভয় ও বিস্ময় হইত। প্রবল বাত্যা, বৃষ্টি, জলপ্লাবন অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত, কার্য্যকারণজ্ঞানবিহীন আদিম মনুষ্য এই সকলকে দৈব কার্য্য বিবেচনা করিত এবং ক্রোধোপশান্তির জন্য অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতিকে দেবতা জ্ঞানে উপাসনা করিত। ক্রমে জ্ঞান বৃদ্ধির সহিত প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। এখন আর সভ্য জাতিরা গৃহদাহে অগ্নিদেবের পূজা করে না, প্রবল বাতবিক্ষোভিত সমুদ্রে ভাসমান পোতাধ্যক্ষ পবনদেবের স্তব পাঠ করেন না। প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া যেমন বাহ্য জগতের দুর্ঘটনার প্রকৃত প্রতিকার হইতেছে, সেইরূপ সমাজতত্ত্বের অনুসন্ধান ও নিরূপণ হইলে সামাজিক বিশৃংখলার প্রকৃত প্রতিকার হইবে। সামাজিক দুঃখ ক্লেশের কারণ জানা যাইবে, সমাজ সভ্যতার পথে দ্রুত গতিতে যাইতে থাকিবে। জ্ঞান ও সত্য প্রচারিত হইবে, সামাজিক সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

এক্ষণে জানা আবশ্যক সমাজ কি ও তাহার প্রকৃতি কি? আমরা এ স্থলে ইহার নৈয়ায়িক সংজ্ঞা দিব না। সাধারণতঃ সমাজ কাহাকে বলে তাহা সকলেই জানেন। তবে প্রস্তাবোচিত একটি সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যক। বিষয় বিশেষে একতা বিশিষ্ট জনসমূহকে সমাজ বলা যাইতে পারে। যেমন দেশ বিষয়ের একতা লইয়া ইংলণ্ড দেশীয়দিগকে ইংরেজসমাজ, সমস্ত য়ুরোপবাসীদিগকে য়ুরোপীয়সমাজ, বঙ্গবাসীদিগকে বাঙ্গালীসমাজ, বলা যায় সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে একতা লইয়া খৃষ্টিয়সমাজ, হিন্দুসমাজ, মুসলমানসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে। এবং মানব জাতীয়ত্ব লইয়া সমগ্র পৃথিবীর মনুষ্যকে মনুষ্য সমাজ বলা যায়।

এই মনুষ্য সমাজকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১মতঃ, অসভ্য,

বা বর্ব্বর জাতি ; ২য়তঃ, অর্দ্ধ সভ্য বা অর্দ্ধ বর্ব্বর জাতি ; ৩য়তঃ, সভ্য জাতি। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মনুষ্যের অন্তর্নিহিত কতকগুলি শক্তি বা ধর্ম্ম আছে। সেই গুলির বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগের পরিচালনা ও পরিপুষ্টি সাধন করিতে হয় এবং জড় জগতে প্রকৃতির নিয়ম ও পদার্থসকলের কার্য্যোপযোগিতা জানিতে হয়। এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞান মনুষ্যের অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায়। যাহারা ইহা না জানিয়া এবং জানিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল জীবন ধারণের জন্য পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদিগকে অসভ্য বা বর্ব্বর বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ আহার নিদ্রা প্রভৃতিতে মনুষ্য পশুর সহিত সমান, কেবল ধর্ম্মই মনুষ্যকে পশু হইতে বিশেষ করে ; এমন ধর্ম্মে যাহারা বিহীন তাহারা পশু ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তবে যদি মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত করা যায় তাহা হইলে যে অসভ্য শ্রেণী নিবিষ্ট করা হয় তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

যাহারা উপরোক্ত বিষয়গুলি কতকাংশে অবগত কিন্তু এরূপ অনভিজ্ঞ অনুৎসাহী ও অনৈক্যশালী যে অন্যে তাহাদিগকে বলে বা কৌশলে—যাহাতে শাসিতদিগের না হউক শাসনকর্ত্তাদিগের উপকার ও লাভ হয়—এরূপ ভাবে শাসিত ও চালিত করে, তাহাদিগকে অর্দ্ধসভ্য বলা যাইতে পারে। যে সমাজ এরূপ স্থাপিত, গঠিত ও চালিত যে যাহারা স্থাপয়িতা তাহারাই চালক ও যেখানে জাতিগত ব্যতীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, স্বত্ব, স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহাকে সভ্য-সমাজ বলা যায়। বলা বাহুল্য যে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের জ্ঞানে এ সমাজ জ্ঞানী এবং অধিক জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় নূতন তত্ত্বের আবিষ্করণে যত্নবান্। সেই নিমিত্ত প্রকৃতির শক্তির ও উপকরণের নানা কার্য্যে প্রয়োগ ; সময় ও শ্রম লাঘব করিবার জন্য নানা গঠন ; জলে স্থলে আরামের জন্য আশ্চর্য্য অশ্চর্য্য নানা যান, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুশৃংখলা ও ন্যায়পরতা ; বিধি, বিজ্ঞান ও শিল্প, সাহিত্য—এ সমাজে সকলই সমুৎপন্ন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুইটী উপাদানে সমাজ সংগঠিত—একটি পুরুষ জাতি অপরটি স্ত্রীজাতি। এই দুইএর প্রকৃত সম্বন্ধ বিচার সমাজ তত্ত্ববিদের প্রধান কর্ত্তব্য—কারণ এই সম্বন্ধ সমাজসৌধের ভিত্তি।

সাম্য ও স্বাধীনতা সামাজিক নীতির মূল। পূর্ব্বে স্বাধীনতা দাতব্যের সামগ্রী ছিল। যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হইত, সেই পাইত, কাহারও তাহাতে অধিকার ছিল না। কোন কোন সম্প্রদায়ের আবার কোন কোন বিশেষ অধিকার থাকিত—যেমন শাসন করিবার অধিকার, কর নির্দ্ধারণের অধিকার, দণ্ডবিধানের অধিকার। প্রকৃত প্রস্তাবে এ সকল কাহারও অধিকার নয়—অধিকারী কৃত অনধিকার।

এই অত্যাচার সকল দেশে সকল সমাজে চলিয়া আসিতেছিল—অপ্রতিহত প্রভাবে চলিয়া আসিতেছিল। সমাজতত্ত্ববিদগ্রনী সাম্যবাদী মহাত্মা রুসো ইহার প্রতিবাদ করিয়া এক নূতন তত্ত্ব প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন মনুষ্য জন্মিয়াই স্বাধীন। এই তত্ত্ব যে দিন জগৎ সমক্ষে প্রচারিত হইল সেই দিন যেন জগতে স্বাধীনতার সূর্য্য উঠিল। যে স্বাধীনতায় এতদিন সম্প্রদায় বিশেষের একাধিপত্য ছিল তাহা এখন জনসাধারণের হইল। ১৭৯০ খৃঃ অঃ এই সত্য য়ুরোপীয় অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। এই বৎসর আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের জাতীয় সমিতি (National Assembly) প্রচার করিলেন যে মনুষ্য জন্মাবধিই স্বাধীন ও সমস্বত্ব। এই স্বাভাবিক স্বত্বসংরক্ষণই রাজনৈতিক সভার উদ্দেশ্য। এই সকল স্বত্ব—স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধান।

এই রূপে মনুষ্যের স্বত্ব সকল জগতে পরিচিত হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে উহা এখনও বিশ্বজনীন হইল না। আজিও সমগ্র মানবজাতি ইহা পাইল না। আমরা এখানে কেবল সভ্য জাতির কথাই বলিতেছি। সভ্য জাতির মধ্যেও ইহা সকলে পান নাই। এ পর্য্যন্ত কেবল পুরুষজাতিই এই স্বত্বের অধিকারী, স্ত্রীজাতি ইহাতে বঞ্চিত।

আমরা এ প্রস্তাবে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত, স্ত্রীপুরুষগত

প্রভেদই হইার বিচার্য্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য প্রথমে নির্ণীত না হইলে তুলনায় বিচার যথার্থ হইতে পারে না। এই জন্যই মূল সত্যের আলোচনায় কয়েকটি কথা সংক্ষেপেও বলা হইল। এক্ষণে দেখা যাউক স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ আপাততঃ কি রূপ অবস্থায় আছে এবং কি রূপ হওয়া উচিত।

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট" ইহাই সাম্যতত্ত্বের মূল সত্য। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্য সুতরাং উভয়েরই তুল্য অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু সভ্য সমাজেও অদ্যাপি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ সত্য স্বীকৃত হয় নাই। এবং যত দিন না তাহা হইবে তত দিন সমাজ স্থায়ী ভিত্তিতে সংস্থাপিত হইতে পারে না। কারণ যাহা সত্য নয় তাহা স্থায়ীও হইতে পারে না।

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণীকৃত হইবে যে স্ত্রীজাতির ও পুরুষজাতির ন্যায় সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার আছে। পুরুষেরও যেমন স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচারের প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে, স্ত্রীর ও সেই রূপ স্বাধিনতা, সম্পত্তি, নির্ব্বিঘ্নতা ও অত্যাচার প্রতিবিধানের স্বত্ব আছে। পুরুষ ও যেমন কেবল স্বকৃত অপরাধ হেতু পূর্ব্বোক্ত স্বত্বে বঞ্চিত হইতে পারে, স্ত্রীও কেবল সেইরূপ স্বকৃত অপরাধ হেতু তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে পারে—অন্যথা নহে। যদি অন্যথা তাহাদিগকে ইহাতে বঞ্চিত করা হয় তাহা হইলে বলিতে হয়, যে কতকগুলি মনুষ্য ব্যতীত মনুষ্যে মনুষ্যে সমনাধিকার বিশিষ্ট নহে। অথবা স্বীকার করিতে হয় যে স্ত্রীজাতি মানব জাতির অন্তর্গত নয়। স্ত্রী জাতির স্বত্ব অস্বীকৃত হইলে পুরুষজাতির স্বত্বের কোন ন্যায়ানুগত ভিত্তি থাকে না। তাহা হইলে অত্যাচার আর অন্যায় বলিয়া গণিত হইতে পারেনা, দাসত্ব আর সভ্য সমাজে ঘৃণার পদার্থ বলা যায় না। হয় সকল মনুষ্যের সমান অধিকার আছে, অথবা কাহারও কিছুই নাই।

ইহাতে অনেকে এরূপ তর্ক করেন যে যখন স্ত্রী পুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে তখন অধিকারগত সাম্য থাকিবে কি প্রকারে?

আমরা বলি যাহাকে প্রকৃতিগত বৈষম্য বলা হইতেছে তাহা প্রকৃত প্রকৃতিগত বৈষম্য নহে (বলা বাহুল্য আমরা শারীরিক বৈষম্যের কথা বলিতেছি না, অনেকাংশে তাহা অভ্যাস ও শিক্ষার ফল। অভ্যাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, তাহার উপর আবার শিক্ষার দ্বারা দৃঢ়ীভূত হইলে, প্রায়

প্রকৃতিই হইয়া যায়। আশৈশব একটি বালক ও একটি বালিকার শিক্ষার প্রভেদ দেখুন। বালক খেলা করিবে—দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ছুটাছুটি করিয়া—বালিকা গৃহপ্রাঙ্গনে খেলাঘর পাতাইয়া তখন হইতে গৃহকর্ম্ম অভ্যাস করিবে, মেয়ে ছেলের বিবাহ দিবে, রাঁধিবে, ঘর পরিষ্কার করিবে। বালক বয়োবৃদ্ধির সহিত সংসারের নানা স্থানে যাইবে, নানা লোকের নিকট যাইবে, নানা ঘটনা দেখিবে, নানা সংবাদ, নানা উপদেশ শুনিবে। আর বালিকা বয়োবৃদ্ধির সহিত বহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে, আর দেখা শুনা চতুঃপ্রাচীর-বেষ্টীত প্রাঙ্গন মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহাই হইবে। ইহাতে কি পুরুষ বলবান্ স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী স্ত্রী ভীরু, পুরুষ অভিজ্ঞ স্ত্রী অজ্ঞ, পুরুষ কঠোরতাসহিষ্ণু স্ত্রী কোমলা হইবে না? এরূপ শিক্ষায় এরূপ ফল যদি না ফলিবে ত কি হইবে বলিতে পারি না। আমরা লেখাপড়ার কথা অধিক বলিব না, কারণ প্রকৃত শিক্ষা কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া হয় না। জগতের প্রকৃত ঘটনা সমুহ হইতে অন্তরিত হইয়া জগতের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়া অসম্ভব। মনে করুণ একজন বহুদর্শী কৃতকর্ম্মা লোকের যে পরিমাণে জ্ঞান আছে তাহা হইতে যদি তাহার জগতের প্রকৃত ঘটনার সংস্রবে, সংঘাতে আসিয়া যে বহুদর্শিতা জন্মিয়াছে সেই বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞান বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে যে জ্ঞানটুকু থাকে সে কতটুকু? সেই পুস্তকজ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিতে পারে? যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার নিতান্ত অনিচ্ছুক নহেন কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতার নামে খড়্গাহস্ত তাঁহাদিগকে আমরা বুঝাইতে ইচ্ছা করি যে প্রকৃত স্বাধীনতা না দিলে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যদি শিক্ষা অর্থে এরূপ বুঝিতে হয় যে যাহাতে গৃহে বসিয়া উপন্যাস পাঠ করিতে পারিবে, দুই চারিটী নীরস, অর্দ্ধঅশ্লীল শ্লোক শিখিতে পারিবে এবং শব্দসাগরের বাছা বাছা রত্নগুলিন অযথা প্রয়োগ করিয়া পত্র লিখিতে পারিবে তাহা হইলে আমরা স্বীকার করি যে পিঞ্জরবদ্ধার এরূপ শিক্ষা অসম্ভব নয়।*

---

* প্রচারে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধের সকল কথার সহিতই যে আমাদের মতের ঐক্য আছে এরূপ কেহ মনে না করেন। কেহ কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রচারেই করিতে পারেন।—প্রঃ-সং।

স্ত্রীস্বাধীনতার কথা অন্যত্র বলা যাইবে। স্ত্রীজাতির পুরুষোচিত কার্য্যে উপযোগিতা আমাদের অনুসরণীয় বিষয়—তাহারই প্রসঙ্গে এতদূর আসা গিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে—তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারই করা যায় যে স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি পুরুষজাতির মানসিক শক্তি অপেক্ষা স্বভাবতঃই নিকৃষ্ট, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল সময়ে ও সকল দেশেই এই নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কারণ যাহা স্বাভাবিক প্রকৃতির নিয়মাধীন, তাহা এক সময়ে এক দেশে এক প্রকার, অন্য দেশে অন্য সময়ে অন্য প্রকার—ইহা অসম্ভব। সত্যযুগে ভারতবর্ষে যে অগ্নির দাহিকা শক্তি ছিল এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকাতে তাহার দাহিকা শক্তি আছে। প্রাকৃতিক নিয়মের বশে যাহা চলিতেছে তাহার আর দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তন ঘটে না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই ভাব।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির এই কথিত নিকৃষ্টতা এত প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছে কি না, যাহাতে ইহাকে প্রকৃতিগত বলা যাইতে পারে। এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিক বিচারে বিচার্য্য বিষয়গুলি সমাবস্থাপন্ন না হইলে পরস্পর তুলনীয় হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রীপুরুষগত বৈষম্য বিচার করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা সর্ব্ব বিষয়ে সমান কি না? আমাদিগের যত দূর জানা আছে তাহাতে একরূপ অসংকোচে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থা সমান নয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির আপাততঃ যদি কিছু বা যাহা কিছু নিকৃষ্টতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে প্রাকৃতিক বলা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পর ইহাও বলিতে হইবে যে, সর্ব্বদেশকালপাত্র-প্রযুজ্য প্রাকৃতিক নিয়মতুল্য স্ত্রীজাতির নিকৃষ্টতাও কোথাও দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। আবার য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে না, বা করে না, আমেরিকার স্ত্রীলোক তাহা করিতে পারে বা করে। ইহার কারণ সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে উক্ত দেশ সকলের সামাজিক আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও শিক্ষা এই রূপ উপযোগি-

তার হেতু। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণ হইতেছে ও ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতির যে নিকৃষ্টতা দেখা যায়, তাহা কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া প্রকৃতিগত নহে—সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, শিক্ষা ও সাধারণ অবস্থাগত। শিক্ষা ও অবস্থার প্রভাবে পুরুষজাতির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দেখা যায়, স্ত্রীজাতির মধ্যেও তাহাই। স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ যাহা কিছু দেখা যায় তাহা অবস্থা ও শিক্ষাগত প্রভেদজনিত—তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে।

এক্ষণে নৈয়ায়িক তর্ক ছাড়িয়া দেখা যাউক স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা কার্য্যতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। স্ত্রীজাতি অতীতে যাহা হইয়াছে বা বর্ত্তমানে যাহা আছে তাহাই বিবেচনা করা যাউক। কারণ ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে, যাহা তাহারা হইয়াছে তাহা তাহারা হইতে পারে—যদিই একান্ত তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু না হয়। তাহারা কালিদাস বা সেক্ষপীয়রের মত কাব্য প্রণয়ণ করিতে পারে কি না অথবা গৌতম বা মিলের মত ন্যায়-শাস্ত্র লিখিতে পারে কি না এরূপ তর্কে এই মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় যে, তাহা অনিশ্চিত—অন্ততঃ সে বিষয়ের মীমাংসা স্বতঃসিদ্ধ নয়—তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু তাহারা যাহা হইয়াছে ও করিয়াছে তাহা কল্পনা বা তর্কের বিষয় নহে—বাস্তব ঘটনা।

যত প্রকার কার্য্য আছে তাহার মধ্যে রাজ্যশাসন সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ। রাজনৈতিক ব্যাপারে যেরূপ বুদ্ধির পরিচালনা আবশ্যক সেরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই নয়। বৈদেশিক রাজগণের সহিত প্রকৃত সম্বন্ধ রক্ষা, তৎ-সম্বন্ধে যুদ্ধবিগ্রহসন্ধির বিষয় আলোচনা করা, সমগ্র দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি বিধানে চেষ্টা করা, কার্য্যবিভাগে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করা, আরও কত সহস্র কার্য্যে দৃষ্টি রাখা—এ সকলে অসাধারণ বুদ্ধির এবং উন্নত, প্রশস্ত, দৃঢ় ও কার্য্যকুশল মনের আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। অতীতসাক্ষী ইতিহাস বলিয়া দিতেছে এরূপ কার্য্যও স্ত্রীলোক দ্বারা নির্ব্বাহিত—অতি দক্ষতা, নিপুণতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত—নির্ব্বাহিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী এলিজাবেথ, স্পেনের ফার্ডিনেণ্ড-মহিষী মেরি ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের বর্ত্তমান সময়েও সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইহার জাজ্জ্বল্যমান

উদাহরণ। জন ষ্টুয়ার্ট মিল এই কথায় বলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই বিষয়টী বিশেষরূপে সত্য। যখনই দেখা যায় যে, কোন হিন্দুরাজ্য তেজস্বিতা, সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার সহিত শাসিত হইতেছে, যখনই দেখা যায় বিনা পীড়নে শান্তি স্থাপিত হইতেছে, কৃষি বিস্তীর্ণ হইতেছে, প্রজা সমৃদ্ধিশালী হইতেছে, তখনই অনুমান করা যাইতে পারে এই রাজত্ব স্ত্রীলোকের দ্বারা হইতেছে, অন্ততঃ এইরূপ প্রত্যেক ৪টার মধ্যে ৩ টা নিশ্চিত। মিল বলেন ইহা তাঁহার কাল্পনিক কথা নহে। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত কার্য্যসম্বন্ধে তাঁহার এই জ্ঞান হইয়াছে। যদিও হিন্দু নীতি অনুসারে স্ত্রীলোক রাজত্ব করিতে পারে না তথাপি অনেক সময়ে তাহাকে রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আলস্যে ও ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন হইয়া অনেক রাজাই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন উত্তরাধিকারীর অপ্রাপ্তবয়স্কতার সময় রাজ্ঞীকেই রাজ্যের তত্ত্বাবধান করিতে হয়। ইহার উপর বিবেচনা করিতে হইবে যে উক্ত রাজ্ঞীরা কখন প্রকাশ্য স্থানে বাহির হয়েন না, পর্দ্দার অন্তরাল ব্যতীত কখন কাহারও সহিত কথা কহেন না, রীতিমত লেখা পড়া জানেন না, জানিলেও ভাষায় রাজনীতিবিষয়ক এমন কোন পুস্তক নাই যাহা হইতে উপদেশ পাইতে পারেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে আরও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, রাজ্যশাসনে স্ত্রীলোকের এক রূপ স্বাভাবিক ক্ষমতাই আছে।* (১)—[ক্রমশঃ।]

শ্রীহৃষীকেশ সেন।

---

(১) "Especially is this true if we take into consideration Asia as well as Europe. If a Hindoo principality is strongly, vigilantly, and economically governed, if order is preserved without oppression, if cultivation is extending, and the people prosperous, in three cases out of four that principality is under a woman's rule. This fact, to me an entirely unexpected one, I have collected from a long official knowledge of Hindoo Governments. There are many instances: for though, by Hindoo institutions, a woman can not reign, she is the legal regent of a kingdom during the minority of the heir; and minorities are frequent, the lives of the male rulers being so often prematurely terminated through the effect of inactivity and sensual excesses. When we consider that these princesses have never been seen in public, have never conversed with any man not

রুদ্ধপ্রাণ।

ধর মা ধরারাণি তুলেনে কোলে ছেলে,
বিদেশে কত আর রাখিবি একা ফেলে!
অচেনা ঠাঁই এ যে অচেনা লোক জন,
ধূ ধূ ধূ চারি ধার মরভূ বিভীষণ।
কেহ না ডাকে কারে কেহ না কহে কথা,
চাহিয়ে চ'লে যায় চাপিয়ে মনোব্যথা।
আপন কেহ নাই—জানি না থাকে যদি,
চিনিতে দেয় নাক মাঝেতে মহানদী।
কেবলি ঝরে বারি কেবলি বহে শ্বাস,
কেবলি দুখ-গান এমনি বার মাস।
এমনি দিন রাত কাটিছে কেঁদে কেঁদে,
বল্ মা কত আর রাখিবি হেথা বেঁধে!
সহে না এত আর কঠোর এত এরা,
দুখেব নাগপাশে জীবন এত ঘেরা।
এতই বিভীষিকা এতই হা হুতাশ,
এতই ভুরুকুটি অপ্রেম উপহাস।
এতই পরভাব এতই ছাড়াছাড়ি,
তুচ্ছ কথা নিয়ে এতই বাড়াবাড়ি।
তুচ্ছ ধন-আশে এতই উনমাদ্,
তুচ্ছ ধন নিয়ে এতই দুরবাদ!
তুচ্ছ যার আশা তুচ্ছ তার প্রাণ,
সহে না আর মাগো প্রাণের অপমান।

---

of their own family except from behind a curtain, that they do not read, and if they did, there is no book in their languages which can give them the smallest instruction on political affairs ; the example they afford of the natural capacity of woman for government is striking."—*Subjection of Women.* By J. S. MILL, page 103.

সহে না অবিচার জীবন অপচয়,
কথারি কোলাহল কাজে ত কিছু নয়।
যেখানে যাব ভাবি সে পথ নাহি পাই,
আলোর আশা ক'রে আঁধারে ডুবে যাই।
নে না মা কোলে তুলে দিন ত ব'য়ে গেল,
প্রাণের চারিধারে আঁধার ঘিরে এল।
হাসি ত ডুবে এল ভাঙ্গিল ধূলাখেলা,
কেবলি মিছামিছি কেটেছি সারাবেলা।
মিছা এ দেহ ব'য়ে কেবলি ঘুরে মরি,
ধাঁধাঁয় বাঁধা প্রাণ আধার পরিহরি।
বেঁধো না বাঁধা প্রাণে বাঁধন সয় কত ?
শরীর দুরবল অবশ গতিহত।
বাসনা জাগে শুধু জীবন করি জয়,
তোমাতে জনমি মা তোমাতে হই লয়।
তোমাতে মিশে গিয়ে তোমারি কাজ করি,
মিছা এ বাঁধা প্রাণে আঁধারে ঘুরে মরি।
প্রাণ ত সঙ্কোপ আঁধার কারাগারে,
রহিতে নারে আর বদ্ধ চারি ধারে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

সিপাহিযুদ্ধের সময় যখন সকলে আপন আপন সম্পত্তি রক্ষায় ব্যস্ত ছিল, ভয়ঙ্কর বিপ্লবে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যখন সকলে আপনাদের বহুমূল্য দ্রব্যাদি নির্জ্জন স্থানে গোপনে রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছিল, তখন একটি দরিদ্রা মহিলা এ বিষয়ে যেরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়, তাহা সুনীতি, সদভিপ্রায় ও সাধু চরিত্রের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সেই দুঃসময়ে যখন

সকলেই আপনার বিষয় লইয়া বিব্রত ছিল, তখন বিশ্বাসিনী বামনী পরের বিষয়ের জন্য যত্নবতী হইয়া উঠেন।

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তারের পরিচারিকা। সিপাহিযুদ্ধের সময় ডাক্তার অযোধ্যাস্থিত সৈনিক নিবাসে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা নিশীথ সময়ে সংবাদ আসিল অযোধ্যার সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে তিনটী শিশু সন্তানের সহিত অবিলম্বে শকটারোহণে লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক-পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাইয়া তিনটি সন্তানের সহিত লক্ষ্ণৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে ডাক্তার অপরাপর ইঙ্গরেজেরা যেখানে সজ্জিত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল, ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অগ্নিশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। চিকিৎসক-রমণী এই ভয়ঙ্কর সময়ে তিনটি শিশু সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সভয়ে রাজপথ অতিবাহন করিয়া লক্ষ্ণৌ গমন করিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না। অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের সহিত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এ দিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিষ্কর্ম্মা ছিল না। তাহার প্রভুপত্নী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন তাহা সে জানিত। এখন কালবিলম্ব না করিয়া সেই সমস্ত মূল্যবান্ আভরণরাশি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে অগ্নি দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার গৃহ করাল অনলশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনী যে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; সুতরাং সে ইচ্ছা করিলেই ঐ সমস্ত মহামূল্য দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণ গুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনী আপনার জীবিতকাল মধ্যে কখনই উপার্জ্জন করিতে

পারিত না; কিন্তু প্রভুপরায়ণা বিশ্বস্তা অবলা এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা বামনী অনায়াসে লোভ সংবরণ করিয়া প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে একটি সামান্য পল্লীতে বামনীর আবাসগৃহ ছিল। বামনী আপনার গৃহে আসিয়া এক খানি ফ্লানেলের কাপড়ে অলঙ্কার গুলি জড়াইয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখিল। সে কেবল আপনার উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আপনার ন্যায় আত্মীয়দিগকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদিগের নিকট ঘুণাক্ষরেও এ বিষয় প্রকাশ করিল না। এক বৎসরের অধিক কাল এই ভাবে অতিবাহিত হইল, এক বৎসরের অধিক কাল চিকিৎসক পত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্তা বামনীর কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্ণৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনস্থাপিত হইল এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিতা হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনানিবাসে চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বামনী এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল এবং প্রভু ও প্রভুপত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিল। যখন আর কোনও সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে ফিরিয়া আসিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল ও নীরবে সাবধানে তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বামনী অক্ষত শরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন তাঁহারা দেখিলেন বামনী তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদয় আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমুদায় অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন অলঙ্কারাদি কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কারস্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে তাহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বামনী এই রূপে প্রভুপরিবারের বিশ্বাসভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

যখন সিপাহিরা কানপুর অবরোধ করে, তখন একটি নীচজাতীয় দরিদ্রা হিন্দু রমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের পিতা মাতা উভয়েই অবরোধের সময় নিহত হইয়াছিল। এই দরিদ্রা নারীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল। দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটিকে তাহার জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং সে তাহাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। পিতৃমাতৃহীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ক্রমে কানপুরের অবরোধকার্য্য শেষ হইয়া আসিল। সিপাহিদিগকে প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া জুন মাসের শেষে ইঙ্গরেজ সেনাপতি এই নিয়মে নানা সাহেবের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাদিগের সহিত তাঁহার সৈন্যগণ নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে, সিপাহিরা তাহাদের কোনও বিঘ্ন জন্মাইবে না। নানা সাহেব ইহাতে সম্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিনীগণ বিমুক্তির সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

ফিরিঙ্গী সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রীও সজ্জিত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশবর্ষবয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীকূলে গমন করিল। সকলেই নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, এমন সময় সিপাহিরা তটদেশ হইতে আরোহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। দুইটি কামান নদীতটে লুক্কায়িত ছিল, এখন উহা বাহির করিয়া নৌকার সম্মুখবর্ত্তী করা হইল। ধাত্রী উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সন্তানটিকে বক্ষস্থলে চাপিয়া রাখিয়া পুত্রের সহিত সিঁড়িতে নামিল এবং ঐ সিঁড়ি দিয়া সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামানধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহিদিগের কলরবমধ্যে অসহায়া রমণী দুইটি সন্তান লইয়া তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহিগণ নিষ্কোশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ফিরিঙ্গী সন্তানকে ধরিবার জন্য

বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না। নিজের অঙ্গাচ্ছাদন মধ্যে তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া বাহুদেশমধ্যে চাপিয়া রাখিল।

নরহন্তা সিপাহি অসি আস্ফালন করিয়া তীব্রভাবে কহিল—"বালকটিকে হাতে দাও, তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।"

তেজস্বিনী নারী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না, ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়া কর।

"বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই" সিপাহি সরোষে ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল—"মা, শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।"

পুত্রের কাতর প্রার্থনায়ও দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না। নির্ভয়ে অটল সাহসে উত্তর করিল—"না, তাহা কখনই হইবে না।"

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল। দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল, আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা পিতৃমাতৃহীন শিশুর জন্য নীরবে ধীরভাবে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নিষ্ঠুর সিপাহি ফিরিঙ্গী শিশুটিকে বধ করিল। কেবল একমাত্র ধাত্রীর পুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল, সিপাহি তাহার উপর কোনও অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্ব্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উপস্থিত হইলে সে কহিত—"মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী শিশুকে বাঁচাইতে গিয়া উভয়েই হত হইলেন।"

১৮৫৭ অব্দের ৩রা জুলাই রাত্রিতে ১৭ গণিত ভারতীয় পদাতিকসৈন্য গোরক্ষপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আজিমগড়ের নিকট উপস্থিত হয়। ইহারা যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া একজন ইংরেজ আফিসরকে হত্যা করে, আজিমগড়ের জেলের সমুদায় কয়েদীকে খালাস দেয় এবং কালেক্টরী হইতে সমস্ত টাকাকড়ি লইয়া অযোধ্যায় অভিমুখে যাইতে থাকে। পথেও ইহারা অনেক স্থান লুণ্ঠন করিতে নিরস্ত হয় নাই। ৪ঠা জুলাই রাত্রি ১১টার সময় কতিপয় ইউরোপীয় পুরুষ ও স্ত্রী ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণবার্ত্তা তাঁহারা শুনিতে পাইলেন। তাঁহাদের আর ভোজন হইল না, তাঁহারা টেবিলের দ্রব্যাদি ফেলিয়া তাড়াতাড়ি পলাইতে লাগিলেন। তিনটী ছোট বস্তায় কতকগুলি কাপড় ছিল, অসময়ে ঐ কাপড়গুলি তাঁহাদের অনেক কাজে লাগিতে পারিত, কিন্তু ব্যস্ত সমস্ত হওয়ায় তাঁহারা ঐ গুলিও লইয়া যাইতে পারিলেন না।

এই সঙ্কটকালে বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা উক্ত পলাতক ইউরোপীয়দিগের উপকারে নিরস্ত থাকে নাই। তাহারা পলাতকদিগের চারিপার্শ্বে থাকিয়া সকলকে নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে আনয়ন করে। ইউরোপীয়েরা এই খানে তাহাদের এক দল খিদ্‌মদ্‌গারের আলয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এই স্থানে একটি বিস্ময়কর দৃশ্যে তাঁহারা মোহিত হইলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেছে। এক কি দুই ঘণ্টার পর তাঁহারা অধিকতর নিরাপদ হইবার জন্য আর একটি গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য দুই খানি খাটিয়া ও পানের জন্য এক ঘড়া জল দেওয়া হইল। তিন দিন ও দুই রাত্রি বিপন্ন ইউরোপীয়েরা ঐ আশ্রয়স্থানে নিরাপদে অবস্থিতি করেন। বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা এই খানে তাঁহাদিগকে চপাটি দিয়া পরিতৃপ্ত করিতে বিমুখ হয় নাই। তাঁহাদের আবাসগৃহ বিলুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছিল।

গৃহস্থিত দ্রব্যাদি আক্রমণকারীদিগের হস্তগত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বা বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরোপকারী ভারতবাসীর দয়া ও সৌজন্যে

তাঁহাদিগের জীবন সংশয়াপন্ন হয় নাই। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হৃদয়ভেদী দুঃসংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁহারা মৃত্যুর বিকট রূপ আগতপ্রায় বলিয়া মনে করিতেছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এরূপ বিপদাপন্ন হইলেও দয়ার কোমল ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁহারা যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই স্থানের অতি নিকটে কতকগুলা বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলির নীচে আক্রমণকারীরা একটি টাকার বাক্স লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পলাতকেরা আপনাদের নিকটে ঐ সমস্ত কালান্তক যম দেখিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। এ সময়ও, দয়াপর ভারতবাসীরা আপনাদিগকে বিপন্ন বোধ করিলেও, ইউরোপীয়-দিগের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয় নাই।

পূর্ব্বোক্ত বিপন্নদিগের পলায়নের দুই দিন পরে হঠাৎ একদা প্রাতঃকালে জনরব উঠিল যে, পলাতকেরা মৃত্যুমুখে পাতিত হইবে। উপস্থিত জনরবে পলাতকগণ হতজ্ঞান হইয়া পড়েন, কিন্তু এ সময়েও তাঁহাদের জীবনের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। একজন হিন্দু অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে আর একটি পল্লীতে আনিয়া রক্ষা করেন। রক্ষাকারীর পরামর্শে ইউরোপীয়গণ আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। ইহা একটি রাজপুত-পল্লী, বহুসংখ্যক রাজপুত এই পল্লীতে অবস্থিতি করিতেন। আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করা রাজপুতের চিরন্তন ধর্ম্ম। উপস্থিত সময়ে রাজপুতেরা এই চিরন্তন ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্রও বিচ্যুত হন নাই। এই পল্লীর ২০০০ দুই হাজার রাজপুত উন্মত্ত মুসলমানদিগের করাল আক্রমণ হইতে বিপন্ন অসহায় ইউরোপীয়-দিগকে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইউরোপীয়েরা ১৪ দিন এই খানে অবস্থিতি করেন। যে সকল ঘরে গরু রাখা হইত, ইউরোপীয়েরা সেই সকল ঘরে লুকাইয়া থাকিতেন। অবশেষে তাঁহাদের সমস্ত কষ্টের অবসান হয়। ১৪ দিন পরে বারাণসীর কমিশনর তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য কতক-গুলি হস্তী, ২২ জন দেহরক্ষক অশ্বারোহী ও কতিপয় পদাতিক সৈন্য পাঠাইয়া দেন। বিপন্নগণ হাতীতে চড়িয়া ঐ সকল সৈন্যের সহিত নিরাপদ স্থানে উপনীত হন।

দিল্লীতে যখন যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদিগের পরাক্রমে ইউরোপীয়দিগের পরা-

জয় হয়, তখন ইউরোপীয়েরা ঘোরতর বিপদাপন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকেন। এই সঙ্কটকালে ইঁহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। ইঁহারা কিরূপে জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কিরূপে ভগ্ন বাড়ী প্রভৃতি আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিরূপে নানা সঙ্কটপূর্ণ স্থলপথ ও জলপথ অতিক্রম করিয়াছিলেন, খাদ্যবিহীন ও বস্ত্রবিহীন হইয়া কিরূপে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম মাথায় লইয়াছিলেন, ইঁহাদের কোমলাঙ্গী কুলনারীগণ আপনাদের স্বামিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ কষ্টে পড়িয়াছিলেন এবং ইঁহাদের কোমলপ্রাণ শিশুসন্তান সকল পিতা মাতা হইতে বিযুক্ত হইয়া কিরূপ যাতনা ভোগ করিয়াছিল, তাহা অনেকে নিদারুণ অনুশোচনার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। পলাতকগণ নানা বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া কেহ কেহ মিরাটে, কেহ কেহ কর্ণালে ও কেহ কেহ বা অম্বালায় যাইয়া উপস্থিত হন। পথিমধ্যে পল্লীবাসিগণ ইঁহাদের সহিত যথোচিত সদয় ব্যবহার করিয়াছিল। পল্লীবাসীদিগের সাহায্য না পাইলে, বোধ হয়, কেহই আপনাদের প্রাণ লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পহুঁছিতে পারিতেন না।

৩৮ গণিত সিপাহিদলের চিকিৎসক উড্ সাহেব আপনার স্ত্রী ও অপর একটি ইউরোপীয় মহিলার (ইনি লেপ্টেন্যাণ্ট পিলি নামক একজন সৈনিক কর্ম্মচারীর স্ত্রীর) সহিত ঐ সময়ে পলায়ন করেন। ডাক্তার উডের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল, ঐ আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তার এই অবস্থায় মহিলা দুইটিকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে দিল্লীর কোম্পানির বাগানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাগানের লোকে তাঁহাদিগকে বসিবার জন্য খাটিয়া দেয় এবং আপনাদের কুটীরে লুকাইয়া রাখে। বাগান রক্ষকগণ তাঁহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে কোনও রূপ ত্রুটি করে নাই। রাত্রি ৩টার সময় ইঁহারা একটি পল্লীতে উপস্থিত হন। পল্লীবাসিগণ ইঁহাদিগকে খাইবার জন্য দুগ্ধ রুটি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দেয়। একজন প্রাচীন হিন্দু এই পল্লীর মোড়ল ছিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, বিপন্নগণ তখন খোলা জায়গায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিরা আসিয়া পাছে ইঁহাদের কোনও অনিষ্ট করে এই আশঙ্কায় গ্রামাধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে গোশালায় লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন এবং গোশালা হইতে গরু গুলি বাহির করিয়া লন।

পলাতকেরা ঐ স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবিলম্বে গ্রামের একটি মহিলা আসিয়া ইঁহাদিগকে নীরবে থাকিতে কহে, যেহেতু কয়েকজন সিপাহি তখন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইঁহারা প্রথমে ভাবিলেন মহিলাটি বুঝি অনর্থক ভয় দেখাইতেছে, কিন্তু শেষে উক্ত মহিলার কথা ঠিক হইল। ইঁহারা যেখানে লুক্কায়িত ছিলেন, সেই খানেই এক জন সিপাহি আসিয়া দাঁড়াইল। এই সিপাহি আপনাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিবার জন্য গাড়ী ও গরু লইতে আসিয়াছিল। সদাশয় প্রাচীন গ্রামাধ্যক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া সিপাহিকে গরু ও গাড়ী দিলেন, সিপাহি অভীষ্ট বিষয় পাইয়া চলিয়া গেল। গ্রামাধ্যক্ষ সিপাহিকে গ্রাম হইতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার ইচ্ছা করিয়াই, তাহার আবশ্যক গরু ও গাড়ী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি জানিতেন যে সিপাহি গ্রামে কিছুক্ষণ থাকিলে বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের সন্ধান পাইবে। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী এইরূপে বর্ষীয়ান্ গ্রামাধ্যক্ষের দয়ায় আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যাইবার সময় গ্রামের লোকে ইঁহাদিগকে আহারের জন্য কয়েক খানি রুটি এবং পানের জন্য পাত্র ভরিয়া জল দিলেন। ইহাঁরা পথ চিনিতেন না, এজন্য গ্রামের একটি যুবক ইহাঁদের সঙ্গে কিছু দূর যাইয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আসিল। অনেক বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া রাত্রি ৪ টার সময় ইঁহারা আর একটি গ্রামে আসিয়া পহুঁছিলেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত একটি বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রাত্রি শেষ হইল। প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ আপনাদের কার্য্যে যাইতে লাগিল। ইহা একটি হিন্দু পল্লী। একজন প্রাচীন হিন্দু পলাতকগণকে এইরূপ বিপন্ন দেখিয়া আপনাদের গ্রামে লইয়া আইসেন এবং দুগ্ধ ও রুটি দিয়া ইঁহাদিগকে সন্তৃপ্ত করেন। ডাক্তারের আহত স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য এই দয়াপর আশ্রয়দাতা জল গরম করিয়া আনিয়া দিতেও ত্রুটি করেন নাই। নিকটবর্ত্তী আর একটি পল্লীতে এক জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি, বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা গ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া, স্বগ্রামের অনেকগুলি লোক লইয়া ইঁহাদিগকে দেখিতে আইসেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গুলির আঘাতে ডাক্তার উডের মুখের নিম্নভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এজন্য ডাক্তার

দুগ্ধ পান করিতে পারিতেন না। উক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া ডাক্তারকে কাঠের নল দ্বারা দুগ্ধ টানিয়া পান করিতে কহেন এবং এই জন্য নিজে একটি কাঠের নল প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দেন। দয়ালু ব্রাহ্মণের সৎপরামর্শে ডাক্তার উডের অনেক উপকার হয়। ডাক্তার উড্ নলদ্বারা দুগ্ধ পান করিয়া অনেক সুস্থ হন। বিপন্ন ইঙ্গরেজ ও ইঙ্গরেজ মহিলারা এই রূপে প্রাচীন পল্লীবাসীর আশ্রয়ে সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। শেষে আশ্রয়দাতার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠে। ইঙ্গরেজেরা তাহাদিগের গ্রামে লুক্কায়িত রহিয়াছে ইহা জানিতে পারিলেই, দিল্লীর সিপাহিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে, এই জন্য উক্ত প্রাচীন ব্যক্তি ডাক্তার উড্ প্রভৃতিকে স্থানান্তরে যাইতে কহেন। আশ্রিত ইঙ্গরেজেরা অধিকতর বিপন্ন হন, ইহা উক্ত আশ্রয়দাতাব অভিপ্রেত ছিল না। আশ্রয়দাতা উন্মত্ত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশেই আশ্রিত দিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন। এই সময় প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে চতুর্দ্দিক দগ্ধ হইতেছিল, উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছিল; সুতরাং ইঙ্গরেজ মহিলাদ্বয় আহত ডাক্তারকে লইয়া অন্যত্র যাইতে সাহসী হইলেন না। এই বিপত্তিকালে গ্রামের আর এক ব্যক্তি ইহাঁদিগকে একটি জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে লইয়া আইসে এবং দুইটি বিছানা আনিয়া দিয়া ইঁহাদিগকে ঘুমাইতে কহে। নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন প্রচণ্ড সূর্য্য অনলকণা বিকীর্ণ করিতেছিল, তখন বিপত্তিগ্রস্ত পলাতকগণ দরিদ্র পল্লীবাসীর অসীম করুণায় ও অনুগ্রহে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতে থাকেন। ক্রমে বেলা শেষ হইল। রাত্রি সমাগত হইয়া দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ অল্পতর করিয়া তুলিল। ডাক্তার উড্ ও দুইটি কুলনারী আপনাদিগের আশ্রয় স্থান হইতে বাহির হইয়া পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঁচ দিন হইল, ইঁহারা দিল্লী হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি দশ মাইলের অধিক আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পরদিন বেলা ২ টার সময় ইঁহারা আর একটি পল্লীগ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের অধিবাসিগণ ইঁহাদিগের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করে। উপস্থিত সময়ে বিপন্নদিগের প্রতি যত-দূর-সম্ভব দয়া ও অনুগ্রহ দেখাইতে ইহারা কাতর হয় নাই। পলায়িতেরা যাহা প্রার্থনা করেন, পল্লীর মহিলারা অবি-

কারচিত্তে ও সরলভাবে তাহাই আনিয়া দেয়। ইহাদের প্রদত্ত শীতল জলে পলায়িতদিগের তৃষ্ণা শান্তি হয়। ডাক্তারের মুখ ধৌত করার জন্য ইঙ্গরেজ কুলনারীগণ একটি পাত্র চাহেন, পল্লীবাসিনীরা সন্তুষ্টচিত্তে তাহা আনিয়া দেয়। এতদ্ব্যতীত তাহারা ইঁহাদের আহারের জন্য নানাবিধ শাক শবজীতে ভাল তরকারি রাঁধিয়া আনে। ইঙ্গরেজমহিলাদ্বয়ের একটি কহিয়াছেন যে, দিল্লী পরিত্যাগ করা অবধি এরূপ সুস্বাদু দ্রব্য আর তাঁহারা কখনও আহার করেন নাই। পল্লীবাসিনীগণ এই রূপে বিপন্নদিগকে আহার ও পানীয় দিয়া সন্তৃপ্ত করে। পলাতকগণ পরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বলগড় নামক আর এক খানি গ্রামে উপনীত হন। রাজপুতবংশীয়া একটি রাণী এইস্থানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। বলগড়ের রাণী বিপন্নদিগের কষ্ট দেখিয়া তাহাদিগকে আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্নদিগের আহারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইল। ডাক্তার উড্ ও তাঁহার সঙ্গিনী মহিলাদ্বয় রাণীর এইরূপ অনুগ্রহে আহার পানে পরিতুষ্ট হইয়া সে রাত্রি সেইখানে অতিবাহিত করিলেন। পরদিন মেজর পটর্স ন নামক একজন সৈনিকপুরুষ অতর্কিত ভাবে বলগড়ে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে লেপ্টেনেণ্ট পিলিও আর একদিক হইতে সেই স্থানে পহুঁ-ছিলেন। পিলি আপনার সহধর্ম্মিণীকে অক্ষতশরীর দেখিয়া ঈশ্বরকে ধন্য-বাদ দিলেন। সকলে এখন আশান্বিত হৃদয়ে বলগড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার উডের চলিবার শক্তি ছিল না। গুরুতর আঘাতে ডাক্তার উড্ বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে পথের কয়েক জন দরিদ্র মজুর আপনাদের সদাশয়তা ও দয়ার এক শেষ দেখায়। ইহারা চলৎশক্তিহীন ইঙ্গরেজ চিকিৎসককে বহন করিয়া এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায়। দরিদ্র নিরক্ষর লোকেও পথে বিপন্নদিগের দুর্গতি দেখিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হয় নাই। এইরূপ সাহায্য করিলে যে উন্মত্ত সিপাহিদিগের কোপে পতিত হইতে হইবে তাহা ইহারা জানিত, তথাপি ইহাদের করুণা ইহাদের সমবেদনা এবং ইহাদের উপকারের ইচ্ছা কিছুতেই অন্তর্হিত হয় নাই। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের কুলনারীদিগকে লইয়া এই রূপে দরিদ্র গ্রামবাসীদের অসীম

দয়ায় নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে কর্ণালের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাতিয়ালার মহারাজ ইঁহাদের দুর্গতির সংবাদ পাইয়া সাহায্যার্থ ৪০ জন সুসজ্জিত অশ্বারোহী পাঠাইয়া দেন। এই অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষেরা ১৮৫৭ অব্দের ২০শে মে বিপন্নদিগকে কর্ণালে পহুঁছাইয়া দেয়।

উপস্থিত সময়ে, দিল্লীর বৃদ্ধ বাদশাহ বাহাদুর শাহের পত্নী পরমসুন্দরী জেন্নত মহলের উপর ইঙ্গরেজগণ বড় বিরক্ত ছিলেন। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নানা রূপে অসন্তুষ্ট করিতেও ত্রুটি করেন নাই। দিল্লীর গোল-যোগের সময় জেন্নত মহল প্রায় ৫০ জন ইউরোপীয়কে লুকাইয়া রাখেন। তিনি লুক্কায়িত ইউরোপীয়দিগের প্রাণরক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়া-ছিলেন। যতক্ষণ তাঁহার ক্ষমতা ছিল, ততক্ষণ বিপন্নগণ আশ্রয়দাত্রী জেন্নত মহলের করুণায় নিরাপদ থাকেন। ইঙ্গরেজের বিচারে শেষে এই জেন্নত মহলকে বৃদ্ধ বাহাদুরের সহিত রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল।

এই সময়ে দিল্লী হইতে যাঁহারা পলায়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে ৭৪ গণিত সিপাহিদলের ডাক্তার ওয়াট্‌সন নামক একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুস্থানী ভাষায় ডাক্তারের বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। একজন সন্ন্যাসী ডাক্তারের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া তাঁহাকে দাদুপন্থী যোগীর বেশে সজ্জিত করেন। উক্ত যোগী তাঁহার কাপড় রং করিয়া দেন এবং তাঁহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা সমর্পণ করেন। দয়াশীল সন্ন্যাসী বিপন্ন ডাক্তারের জীবন রক্ষার জন্যই তাঁহাকে এইরূপ ভিন্নবেশ পরিগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ডাক্তার এইরূপ সন্ন্যাসীর বেশে ২৫ দিন এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ান। কখনও বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে, কখনও বা লোকালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদা কয়েকজন হিন্দু সন্ন্যাসী বেশধারী ওয়াট্‌সনকে দেখিয়া কহেন—"আপনি কখনও সন্ন্যাসী নহেন, আপনার কটা চক্ষুই আপনাকে ভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত করিতেছে। আপনি নিশ্চিতই ফিরিঙ্গি।" কিন্তু এই সকল হিন্দু, ডাক্তারকে ইঙ্গরেজ বলিয়া চিনিতে পারিলেও, তাঁহার সহিত কোনও রূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই।

আর একটি প্রাচীন লোক একটি অসহায়া ইঙ্গরেজ মহিলা ও তাঁহার

সন্তানকে অনেক দিন রক্ষা করে। আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে, সিপাহিদিগের ভয়ে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে লইয়া যায় এবং অপরের অগোচরে গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখে। ইহাদের আশ্রয় স্থান যখনই উন্মত্ত লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, তখনই বৃদ্ধ আশ্রয়দাতা ইহাঁদিগকে সে স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছে। মিরাটের কমিশনর গ্রিথেড্ সাহেব এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—"দিল্লী হইতে যাঁহারা পলাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক লোকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখাইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী যমুনায় একটি ইউরোপীয় শিশু সন্তান পাইয়া এখানে লইয়া আইসে। তাহাকে পরিতোষিক দিতে চাহিলে সে উহা লইতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কহে যে, যদি কোনও পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে যেন তাহার এই কার্য্যের জন্য তাহার নামে একটী কূপ খনন করিয়া দেওয়া হয়। আমি তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হই।"

পলাতকদিগের মধ্যে কাপ্তেন হল্যাণ্ড নামক এক জন সৈনিক পুরুষ কহিয়াছেন—"আমি যে গ্রামে উপস্থিত হই, সে গ্রামে দুধ না পাওয়াতে পল্টু নামক একজন ঝাড়ুদার ও তাহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তি প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে দুধ আনিয়া দিত।" ইহার পর তিনি লিখিয়াছেন "আমি যমুনাদাস নামক একজন ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে ৬ দিন থাকি। বাড়ীর যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ব্রাহ্মণ তাহাই আমার বাসের জন্য ছাড়িয়া দেন এবং তিনি যত ভাল খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহাই দিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করেন।

এক জন ইঙ্গরেজ ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রী যখন দিল্লী হইতে পলায়ন করেন, তখন দুইজন বিশ্বস্ত চাপরাসি তাঁহার বিশেষ সহায়তা করে। ইহাদের একজন দিল্লীর আজমীরতোরণ অতিক্রম সময়ে উত্তেজিত লোকের হাতে পড়িয়া নিহত হয়, অপর জন ডেপুটি কালেক্টরের স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আইসে।

যে সকল ইঙ্গরেজ মিরটের পরিবর্ত্তে অম্বালার অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে কর্ণালের নবাবের সদাশয়তায় বিশেষ

উপকৃত হন। দিল্লীর জজ্‌ বস্‌ সাহেব কর্ণালে আসিলে নবাব তাঁহাকে কহেন—“উপস্থিত গোলযোগের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় নাই। এখন আমি আপনাদিগের পক্ষ সমর্থনে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছি। আমার তরবারি, আমার সম্পত্তি এবং আমার অনুচরবর্গ এখন সমস্তই আপনাদের জন্য অর্পিত হইতেছে।” নবাব কেবল এই কথা বলিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই। ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যের জন্য তিনি পঞ্জাবী পুলিস সৈন্যের অনুকরণে ১০০শত অশ্বারোহী সেনা প্রস্তুত করেন। দিল্লীর গোলযোগের সময়ে এইরূপে অনেকেই ইঙ্গরেজের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনেকেই অনুকম্পা ও অনুগ্রহ দেখাইয়া বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী হইতে সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়, নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর লোক হইতে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ভূস্বামী হইতে সামান্য ঝাড়ুদার পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই বিপন্ন ইঙ্গরেজদিগের উদ্ধার সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। ইহারা আপনাদের সম্পত্তি, আপনাদের আবাসপল্লী, অধিক কি আপনাদের জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে, বিপন্নকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে কাতর হয় নাই। এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ দয়া ও এইরূপ সদাশয়তা প্রদর্শিত না হইলে, নিরুপায় নিরাশ্রয় ইঙ্গরেজগণ কখনও নিরাপদ স্থানে উপনীত হইতে পারিতেন না। যখন ইঙ্গরেজেরা কোমলমতি শিশুসন্তান ও কোমলাঙ্গী মহিলাগণকে লইয়া ইতস্তত পলায়ন করেন, কেহ কেহ আহত হইয়া রুধিরাক্ত শরীরে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন, আপনাদের গাড়ী পাল্‌কী সমস্তই ফেলিয়া কখনও বিজন জঙ্গলে, কখনও সঙ্কীর্ণ লোকালয়ে, কখনও বা অপরিষ্কৃত গহ্বরে আত্মগোপন করেন, এবং প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া নিম্নতর হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোকের নিকটে কাতরভাবে করুণা প্রার্থণা করেন, তখন ঐ সকল সদাশয় ভূস্বামী এবং ঐ সকল উচ্চশ্রেণীর দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোক ইঁহাদিগকে আশ্রয় না দিলে, ইঁহারা নিঃসন্দেহ দুর্গম পথপ্রান্তে বা নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। (ক্রমশঃ।)

কালিদাসের উপমা।

গিরিপত্নী মেনা সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যার সংযোগে সাতিশয় শোভাময়ী হইলেন।

তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রী
স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দা
দুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব॥

স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলবিশিষ্টা সেই দুহিতা কর্ত্তৃক জনয়িত্রী (মেনা), নবমেঘ-শব্দে বিকাশপ্রাপ্তা, রত্নশলাকা কর্ত্তৃক শোভিতা পর্ব্বতের প্রান্তভূমির ন্যায়, অতিশয় শোভিতা হইলেন।

কন্যাটী দিন দিন বাড়িতে লাগিল—

দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা
লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥

উদিতা এবং পরিবর্দ্ধমানা চন্দ্রলেখা যেমন জ্যোৎস্নায় অন্তর্ধানশীল কান্তি-মান কলাসমূহে দিন দিন পুষ্ট হইতে থাকে সেই রূপ উৎপন্না এবং পরিবর্দ্ধন-শীলা সেই বালা কান্তিবিশিষ্ট অবয়বসমূহে পুষ্ট হইতে লাগিল।

কন্যাটীর উপর গিরিরাজের বড়ই মায়া জন্মিল।

মহীভৃতঃ পুত্রবতোপি দৃষ্টি
স্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্তপুষ্পস্য মধোর্হি চূতে
দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা॥

অনেক পুত্র কন্যা থাকিলেও হিমাদ্রির চক্ষু সেই অপত্যে (উমায়) তৃপ্তিলাভ করিত না, (উমাকে দেখিয়া আশ মিটিত না)। বসন্তে নানা-বিধ কুসুম সত্ত্বেও ভ্রমরশ্রেণী চূতকুসুমেই বিশেষ রূপে সঙ্গত হয়।

প্রভামহত্যা শিখয়েব দীপ
স্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী
তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ॥

মহতী প্রভাযুক্ত শিখা কর্তৃক দীপের ন্যায়, ত্রিপথগা মন্দাকিনী কর্তৃক স্বর্গের পথের ন্যায়, বিশুদ্ধ বচন কর্তৃক বিদ্বানের ন্যায় সেই কন্যা কর্তৃক হিমালয় পবিত্র এবং বিভূষিতও হইয়াছিলেন।

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠনখপ্রভাভি-
র্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাম্
স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্।

পার্ব্বতীর চরণদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ভূমিতে সংন্যস্ত হওয়ায় অভ্যুন্নত অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয়ের নখপ্রভাচ্ছলে উঁহাদের অন্তর্নিহিত চিরলৌহিত্য বাহিরে নিঃসরণ করিতে করিতেই যেন পৃথিবীতে সঞ্চারিণী স্থলকমলিনীর শোভা আহরণ করিত।

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী
গতেষু লীলাঞ্চিতবিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশ লুব্ধৈ-
রাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি॥

সেই সন্নতাঙ্গী উমা বোধ হয় নূপুরশিঞ্জিত শিক্ষার জন্য প্রত্যুপদেশ-প্রার্থী রাজহংসগণের নিকট বিলাস বিশিষ্ট পাদবিন্যাসযুক্ত গমন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব
প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্যপুষ্টা প্রতিকূলশব্দা
শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা॥

সেই মধুরভাষিণী উমা যখন অমৃতস্রাবী স্বরে কথা কহিতেন, তখন কোকিলার শব্দও বেসুরা বীণার মত লোকের শ্রুতিকঠোর বোধ হইত।

সর্ব্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন
যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্না-
দেকস্থসৌন্দর্য্যদিদৃক্ষয়েব॥

এক স্থানে সমস্ত সৌন্দর্য্য দেখাইবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা যথাক্রম স্থাপিত সমস্ত উপমাদ্রব্যের সমষ্টির দ্বারা উমাকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারকাসুর পীড়িত দেবগণ ব্রহ্মার নিকট দুঃখ করিতেছেন—

তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহত ক্রিয়াঃ।
বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে॥

সান্নিপাতিক বিকারে বীর্য্যবান ঔষধ সমূহের ন্যায় সেই ক্রূর অসুর সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত উপায়ের বিফল প্রয়োগ হইতেছে।

ব্রহ্মা বলিলেন—

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নৈত এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

আমা হইতেই সেই দৈত্য উন্নতি লাভ করিয়াছে, অতএব আবার আমা হইতেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সম্যক রূপে বর্দ্ধিত করিয়া বিষবৃক্ষকেও স্বয়ং ছেদন করা যায় না।

উমারূপেণ তে যূয়ং সংযমস্তিমিতং মনঃ।
শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ॥

সেই (কার্য্যার্থী) তোমরা অয়স্কান্ত মণির দ্বারা লৌহের ন্যায় উমার সৌন্দর্য্যের দ্বারা মহাদেবের সমাধিনিশ্চল মনকে আকর্ষণ করিতে যত্নবান হও।

এই কঠিন কার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য দেবরাজ মদনকে স্মরণ করিলেন—

অথ স ললিতযোষিদ্ভ্রূলতাচারুশৃঙ্গম্
রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচরমধুহস্তন্যস্তচূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ
শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা॥

অনন্তর মদন রতির কঙ্কণচিহ্নযুক্ত স্বীয় কণ্ঠে সুন্দরী রমণীগণের ভ্রূলতার সদৃশ মনোহর শৃঙ্গবিশিষ্ট ধনু আরোপিত করিয়া, সহচর বসন্তের হস্তে চূতাঙ্কুরাস্ত্র স্থাপন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রের নিকট আগমন করিল।

ইন্দ্র মদনকে বলিলেন, উৎকট শত্রুপীড়িত দেবগণ মহাদেব হইতে একজন সেনাপতির উৎপত্তি প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু সেই সংযমিশ্রেষ্ঠ শম্ভু এখন হিমালয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত। তাঁহাকে সমাধি হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে। তোমার পুষ্পধনু একা এ কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিবে না। নগেন্দ্র-কন্যা পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যকে সহায় করিয়া এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। সুকেশী উমা পিতার আদেশক্রমে নিত্যই তপস্বী গিরিশের শুশ্রূষা করিতে আইসে—আমার গুপ্তচর অপ্সরাগণের মুখে শুনিয়াছে।

তদ্গচ্ছ সিদ্ধৈ কুরু দেবকার্য্য
মর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
আপেক্ষ্যতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাম্
বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ॥

অতএব কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। দেবতাদের কার্য্য কর। এই কার্য্য কারণান্তরসাপেক্ষ; তথাপি বীজসাধ্য অঙ্কুর তাহার উৎপত্তির পূর্ব্বে বারির ন্যায়, চরমকারণস্বরূপ তোমার অপেক্ষা করিতেছে।

মধুশ্চ তে মন্মথ সাহচর্য্যা-
দসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণশ্চোদয়িতা ভবেতি
ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য॥

হে মন্মথ! বসন্ত তোমার সহচর; অতএব অনুরোধ না করিলেও সে তোমার সহায় হইবে। হুতাশনের সাহায্য করিতে সমীরণকে কে আদেশ করে বল?

হিমালয়ে আসিয়া মদন তপশ্চারী মহাদেবকে দেখিল—

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়-
মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংশম্।

উত্তানপাণিদ্বয়সন্নিবেশাৎ
প্রফুল্লরাজীবমিবাঙ্কমধ্যে॥

বীরাসনবন্ধ প্রযুক্ত তাঁহার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধভাগ নিশ্চল; তিনি ঋজু এবং আয়ত; তাঁহার অংশদ্বয় সন্নমিত। উর্দ্ধতল পাণিদ্বয়ের সংস্থান হইতে যেন অঙ্কমধ্যে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই সংযমিশ্রেষ্ঠকে দেখিয়া কামের শর এবং শরাসন হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময়ে উমা সেই খানে উপস্থিত হইলেন।

নির্ব্বাণভূয়িষ্টমথাস্য বীর্য্যম্
সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।
অনুপ্রযাতা বনদেবতাভ্যা
মদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা॥

মদনের নষ্টপ্রায় বীর্য্যকে শরীরের সৌন্দর্য্যের দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করিতে করিতেই যেন, সখীভূতা বনদেবতাদ্বয় কর্ত্তৃক অনুযাতা পর্ব্বতরাজদুহিতা পার্ব্বতী দেখা দিলেন।

অশোকনির্ভৎর্সিতপদ্মরাগ-
মাকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপীকৃতসিন্ধুবারম্
বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥

উমা বসন্তপুষ্পের আভরণধারিণী—অশোক কুসুম পদ্মরাগের শোভাকে তিরস্কার করিতেছে, কর্ণিকারপুষ্প স্বর্ণাভরণের বর্ণ আহরণ করিতেছে, এবং সিন্ধুবারকুসুমসমূহ মুক্তাকলাপের স্থান অধিকার করিয়াছে।

কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য
পতঙ্গবদ্বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমাসমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ
শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ॥

কামও বাণসন্ধানের অবসর বুঝিয়া, হুতাশনে প্রবেশেচ্ছু পতঙ্গের ন্যায় উমার সমক্ষে হরে বদ্ধলক্ষ্য হইয়া শরাসনের মৌর্ব্বী বারম্বার আমর্শন করিতে লাগিল।

বসন্তকে দেখিয়া রতির মদনবিয়োগদুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশম্
স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে॥

মধুকে দেখিয়া রতি অতিশয় কাঁদিতে লাগিল এবং স্তনদ্বয় পীড়িত করিয়া স্বীয় বক্ষস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। আত্মীয় জনের নিকট দুঃখ যেন মুক্তদ্বার হইয়া উঠে।

মদন পুনর্জ্জীবিত হইবে, অতএব শরীর রক্ষা করিতে মরণনিশ্চয়া রতির প্রতি আকাশবাণী হইল।

তদিদং পরিরক্ষ শোভনে
ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমং বপুঃ।
রবিপীতজলা তপাত্যয়ে
পুণরোঘেন হি যুজ্যতে নদী॥

অতএব হে সুন্দরি,—এই শরীর রক্ষা কর, ইহার প্রিয়সঙ্গম পুনর্ব্বার ঘটিবে রবি কর্ত্তৃক একবার জল পীত হইলে নদী পুনরায় বর্ষাকালে প্রবাহের সহিত যুক্ত হয়।

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তম্
ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা
কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্।

অনন্তর রজনীর আশায় কিরণক্ষয়মলিনা দিবসন্ধ্যা চন্দ্রলেখার ন্যায় দুঃখক্লিষ্টা রতি বিপদের অবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মেনা অনেক বুঝাইয়াও উমাকে তপস্যার ইচ্ছা হইতে বিরত করিতে পারিলেন না।

ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাম্
শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।

ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ ॥

এইরূপ নানা উপদেশ দিয়াও মেনা স্থিরপ্রতিজ্ঞা তনয়াকে তাহার উদ্যম হইতে নিবারিত করিতে পারিলেন না। ইষ্ট বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মনকে এবং নিম্নমুখাভিগামী পয়ঃপ্রবাহকে কে প্রতিবর্ত্তিত করিতে পারে ?

পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া
দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতম্
বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥

ব্রতচারিণী উমা ব্রতাবসানে গ্রহণ করিবার মানসে দুইটী বস্তু দুইটী স্থানে এখন রাখিয়া দিয়াছেন—লতাসমূহে বিলাসবিভ্রম এবং হরিণীগণের নয়নে বিলোল দৃষ্টি।

এইরূপ রঘুতে—

ফলমন্তভৃতাসু ভাষিতম্
কলহংসীষু মদালসং গতম্।
পৃষতীষু বিলোলমীক্ষিতম্
পবনাধূতলতাসু বিভ্রমাঃ ॥

কোকিলায় মধুর বাক্য, কলহংসীতে মন্থর গমন, হরিণীতে বিলোলদৃষ্টি এবং অনিলকর্ত্তৃক ঈষৎ কম্পিত লতায় বিলাস।

মেঘদূতে—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥

প্রিয়ঙ্গু লতায় তোমার অঙ্গসাদৃশ্য, চকিত হরিণীর নয়নে তোমার বিলোল দৃষ্টি, চন্দ্রে তোমার বদনচ্ছায়া, শিখিগণের পুচ্ছভারে তোমার কেশানুকৃতি এবং স্বল্পবিক্ষোভিত নদীর তরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাসভঙ্গী আছে মনে করিয়া দেখি কিন্তু দুঃখের বিষয় একটী বস্তুতেও তোমার সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয় না

ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা
তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতম্
মৃদু প্রকৃত্যা চ সসারমেব চ ॥

কন্দুকক্রীড়তেও যে উমার ক্লান্তি বোধ হইত, সেই উমা এখন মুনিগণের কঠোর তপ আরম্ভ করিলেন। নিশ্চিত বোধ হয়, তাঁহার শরীর, সুবর্ণকমল গঠিত—কমলের ন্যায় সুকুমার, অথচ স্বর্ণের ন্যায় সারবান।

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি
প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসম্পদাম্
সরোজসন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥

শীত কালের রাত্রে কমলসুরভি ও কম্পমান অধরপত্রশোভী মুখের দ্বারা উপলক্ষিতা সেই উমা তুহিনবর্ষণে নষ্টপদ্ম জলাশয়ের সরোজসমষ্টি বলিয়া অনুমিতা হইতেন।

তুষারপাতে জলাশয়ের অন্যান্য সমস্ত পদ্ম ক্ষত বিক্ষত ছিন্ন ভিন্নহইয়া যাইত। উমার মুখপদ্ম সচ্ছন্দে তুষারবর্ষণ সহ্য করিত—অধরপত্র কম্পিত হইত মাত্র।

অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্
জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনম্
শরীরবদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা ॥

অনন্তর মৃগচর্ম্ম ও পলাশদণ্ডধারী, ব্রহ্মময় তেজে জাজ্বল্যমান এবং মূর্ত্তিমান ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ন্যায় একজন জটাবান ব্রহ্মচারী উমার তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

শান্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কার্ত্তিক মাস, বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহর। হালিসহরে রাধানাথ বাবুর রাজপ্রাসাদসদৃশ সুবিস্তৃত ভবনের একতম প্রকোষ্ঠে রমাপতি একাকী উপবিষ্ট। প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত। তলে সুন্দর গালিচা বিস্তৃত, তদুপরি সাটিনাবৃত নানাবিধ কৌচ ও চেয়ার এবং মর্ম্মর প্রস্তর ও কাষ্ঠনির্ম্মিত টেবিল, আলমায়রা ইত্যাদি। আলমায়রা সকল স্বর্ণবর্ণাবরণাবৃত গ্রন্থভারে প্রপীড়িত; যেন রত্ন ব্যবসায়ীর বিপণি। ভিত্তি গাত্রে মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের সুরঞ্জিত চিত্রাবলী। এই বহ্বায়ত প্রকোষ্ঠ ভবনের যে ভাগে সংস্থিত, ইচ্ছা করিলে বা আবশ্যক হইলে, পুরমহিলারাও, অপর লোকের অলক্ষিত ভাবে, তাহাতে যাতায়াত করিতে পারেন। এই প্রকোষ্ঠ রমাপতি বাবুর পঠনালয়।

প্রকোষ্ঠ মধ্যস্থ একতম কৌচে রমাপতি বাবু অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় উপবিষ্ট। তাঁহার হস্তে একখানি স্বর্ণসীমাবদ্ধ ফটোগ্রাফ। সেই চিত্র এক নারীমূর্ত্তির প্রতিকৃতি। রমাপতি এক একবার সেই আলেখ্য দর্শন করিতেছেন, আবার তাহা নয়ন হইতে অন্তরিত করিতেছেন। কাহার এ চিত্র? কোন্ নারীর প্রতিকৃতি আজি রমাপতির নয়ন মন আকর্ষণ করিয়া বিরাজ করিতেছে? অবশ্যই সুকুমারীর। যে সুকুমারীর জন্য রমাপতি আত্ম জীবন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন; যে সুকুমারীর কল্যাণার্থ রমাপতি ঘোর বিপদকেও বিপদ বলিয়া মনে করেন না; যে সুকুমারীর অভাবে রমাপতি মৃতকল্প হইয়া দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন এবং যে সুকুমারীকে রমাপতি দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; রমাপতির হস্তে অধুনা যে নারীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে তাহা সেই সুকুমারীর প্রতিকৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু হায়! কি বলিয়া বলিব? কেমন করিয়া মানবমনের এতাদৃশ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা বুঝাইব? মানব হৃদয়ের এরূপ অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনের কথা কেই বা সহজে বিশ্বাস করিবে? রমাপতির হস্তে সুকুমারীর

ফটোগ্রাফ নহে। সুকুমারী সর্ব্ব সমক্ষে বিপুল নীররাশির মধ্যে সমাহিত হইয়াছেন। তিনি যে সময়ে রমাপতির হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন, রমাপতির তদানীন্তন অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ ব্যয়সাধ্য বিলাস তাঁহার সাধ্যায়ত্ত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে এ চিত্র কাহার? তাহাও কি ছাই আমার না বলিলে চলিবে না? এ চিত্র—এ চিত্র সুন্দরী-শিরোমণি, রাধানাথ-তনয়া সুরবালার প্রতিকৃতি।

সুকুমারি, আজ তুমি কোথায়? আইস, যদি সম্ভব হয় তোমার সেই সলিল-সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া আজি একবার আইস। দেখ তোমার যিনি গুরুর গুরু, তোমার যিনি দেবতা, তিনি আজি তোমার কে? আর দেখ যিনি তোমার মর্ম্মভেদী অনুরোধেও তোমাছাড়া হইয়া জীবনের অন্য গতি পরিগ্রহ করিতে সম্মত হন নাই, সেই তিনি আজি বিরলে বসিয়া আর এক সুন্দরীর প্রতিকৃতি পর্য্যালোচনা করিতেছেন। ধন্য কাল! ধন্য তোমার সর্ব্বস্মৃতিবিলোপকারী মহৌষধ!

রমাপতি চিত্র দেখিতেছেন ও আবার তাহা নয়নসম্মুখ হইতে অপসারিত করিতেছেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চিত্র সেই কৌচেই পড়িয়া রহিল। নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে সেই গৃহমধ্যে দুই তিনবার পরিভ্রমণ করিয়া তিনি আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইলেন এবং সেই চিত্র আবার হস্তে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মনে, না জানি, তখন কি প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল। মনের ভাব মনে মনে পোষণ করা যেন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তিনি তখন অতি অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা, এ দুরাশা আমার হৃদয়ে কেন স্থান পাইল? আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় কখনই তোমার উপযুক্ত আসন নহে। তাহা জানিয়াও কেন আমি এ দুরাশায় ঝাঁপ দিয়াছি? কেন আমি অন্তরে ও বাহিরে কেবল তোমাকেই দেখিতেছি?"

সেই চিত্র হস্তে করিয়াই রমাপতি একবার সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পরিক্রমণ করিয়া আসিলেন। আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—

কিন্তু না। তোমাকে পাওয়া যদি আমার পক্ষে কখন সম্ভব হয়, তাহা হইলেও আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না। আমার হৃদয় বহ্নিচর্ব্বিত, আমার হৃদয় মরুভূমি। তুমি যে আদরের—যে সোহাগের সামগ্রী, তাহা আমি কোথায় পাইব? তোমাকে তাহা কেমন করিয়া দিব? তুমি দেবী। স্বর্গীয় সুখে তোমার অধিকার। এ অভাগা সে সুখের কণিকাও তোমাকে দিতে পারিবে না। তবে কেন, সুরবালা, আমি তোমাকে দুঃখ-সাগরে ভাসাইব? না দেবি, তোমার আমার হইয়া কাজ নাই।"

রমাপতি চিত্র ত্যাগ করিয়া আর একবার গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিলেন এবং আবার সেই কৌচের সমীপস্থ হইয়া চিত্র গ্রহণ করিলেন। তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন,—

"কিন্তু সুরবালা, আমি চিরদিনই এমন ছিলাম না। একদিন জগতে আমার মত ভাগ্যবান আর কেহই ছিল কি না সন্দেহ। আমার এই হৃদয় তখন নন্দন কাননের ন্যায় আনন্দধাম ছিল। সুখ ও শান্তি তখন এ হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়া থাকিত, সন্তোষ ও সৌভাগ্য তখন এ হৃদয় ছাড়িত না। তখন এ হৃদয়ে এক দেবীর রাজসিংহাসন ছিল; কিন্তু সে দেবী আজি কোথায়? সুকুমারি, সুকুমারি তুমি আজি কোথায়? তোমার জন্য, তোমার অভাবে আজি আমার জীবন শুষ্ক, আজি আমি অভাগা। আইস আমার দেবী, আইস করুণাময়ী, আমাকে দেখা দিয়া বাঁচাও—আমাকে আবার ভাগ্যবান কর। দুই বৎসর—দুই সুদীর্ঘ বৎসর আমি তোমাছাড়া হইয়া রহিয়াছি। যদি নিতান্তই দেখা না দেও, যদি তুমি এমনই নিষ্ঠুর হইয়া থাক, যদি নিতান্তই আর না আইস, তবে আমাকেও তোমার সঙ্গী করিয়া লও।"

রমাপতি সেই কৌচের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং বসনে বদনাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বস্থ একটী দ্বার খুলিয়া গেল। তখন সেই উন্মুক্ত দ্বার দিয়া নানা রত্নালঙ্কার বিভূষিতা, সমুজ্জ্বলস্বর্ণসূত্রবিনির্ম্মিত বসনাবৃতা পরম শোভাময়ী সুরবালা সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অলঙ্কারশিঞ্জিত শ্রবণ করিয়া রমাপতি ব্যস্ততাসহ সেই প্রতিকৃতি

প্রচ্ছন্ন করিলেন। সুরবালা তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রমাপতির সমীপস্থ হইয়া বলিলেন,—

"একি! একি রমাপতি বাবু! তুমি কাঁদিতেছ নাকি?"

তখন রমাপতি মুখের বসন অপসারিত করিয়া বলিলেন,—

"যাও দেবি, যাও সুরবালা, আমার নিকট তুমি আর আসিও না। আমি অধম, আমি অভাগা, আমি দীনহীন। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস, মরুভূমি। তুমি দেবী, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

সুরবালা রমাপতির কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ অধোমুখে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিয়া উঠিলেন,—

"তোমার নিকট যদি আমার স্থান না হয়, রমাপতি, তবে ইহজগতে আমার আর স্থান নাই। তুমিই আমার দেবতা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সন্তোষ। যদি তোমার হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হয়, তাহা হইলে তাহাই আমার স্বর্গ। তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্য স্বর্গে যাইব না।"

এই বলিয়া বালিকা লজ্জায় অধোবদন হইল। তখন রমাপতি বলিলেন,—

"কিন্তু দেবি, তোমাকে আমি কি দিব? তোমার এ অনুগ্রহের কি প্রতিশোধ আমি দিতে পারি? আমার আছে কি?"

সুরবালা তাঁহাকে আর কথা বলিতে না দিয়া স্বয়ং বলিয়া উঠিলেন,—

"তুমি আমাকে আর কি দিবে তাহা আমি জানি না। তোমার কিছু আছে কি না তাহা আমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। আমি এই মাত্র জানি তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ মনুষ্য মনুষ্যকে তাহা দিতে পারে না। তোমার মত স্নেহ, তোমার মত ভালবাসা, তোমার মত গুণ কোন্ মানুষের আছে? তুমি মানুষের মধ্যে দেবতা। আমি ক্ষুদ্র বালিকা, তোমার মত দেবতার কেমন করিয়া পূজা করিতে হয় তাহা আমি জানি না। কিন্তু তোমার দাসী হইয়া থাকিতে পাওয়ায় যে কত সুখ তাহা আমি বেশ জানি। আমি তোমার দাসী; দাসীকে তুমি পায়ে ঠেলিবে কেমন করিয়া? কিন্তু তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

"কাঁদিতেছি যে কেন তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব। কিন্তু তাহা না বলিয়াও আর থাকা যায় না। শুন সুরবালা, তুমি আমার আপন হইতেও

আপন, তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। এই দেখ সুরবালা, আমি এই নির্জ্জনে তোমারই ছবি বুকে ধরিয়া বসিয়া আছি।"

রমাপতি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া দেখাইলেন। সুরবালার বদন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমাপতি বলিতে লাগিলেন,—

"সুরবালা, তুমি আমার অন্তরে ও বাহিরে; তুমিই আমার ধ্যান ও জ্ঞান। কিন্তু সুরবালা, তোমাকে আমি সকল কথাই জানাইব, কোন কথাই আমি লুকাইব না। সুরবালা, আমি বড়ই অভাগা, কিন্তু আমি চিরদিন এমন অভাগা ছিলাম না। আমার এই হৃদয়ের এক রাণী ছিলেন। সে দেবী আজি নাই। আজি দুই বৎসর হইল আমার সেই দেবী আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি সেই অবধি অভাগা দীনহীন হইয়াছি। সত্য কথা তোমায় বলিব। সেই দেবীর স্মৃতিতে আমার হৃদয় পূর্ণ। আমার হৃদয় সেই দেবীর অভাবে মরুভূমি হইয়াছে। সুরবালা, তুমি স্বর্গের দেবতা। আমি তোমাকে লইয়া কোথায় রাখিব? আমার এ পোড়া হৃদয়ে আর তোমার আসন পাতিব না। তাই বলিতেছি দেবি, আমার নিকটে তোমার স্থান হইবে না।"

রমাপতি নীরব হইলেন। সুরবালা অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না। তাহার পর সহসা রমাপতির চরণদ্বয় উভয় বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া সেই চরণেই মুখ রাখিয়া বলিলেন,—

"তোমার এই গুণে, তোমার এই দেবত্ব দেখিয়া আমি তোমার দাসী হইয়াছি। তোমার এই যে সরলতা, তোমার এই যে ভালবাসার স্থায়িত্ব, বল দেবতা, তুমিই কি আর কোথায় এমন দেখিয়াছ? তোমার এই গুণে জগৎ তোমার বশ, আমি তো কোন্ ছার কীট। তোমার চরণ আমি ছাড়িব না। দাসীকে তোমার চরণে স্থান দিতেই হইবে।"

রমাপতি অতি যত্নে সুরবালাকে উঠাইলেন এবং বলিলেন,—

"আমি যে আজিও বাঁচিয়া আছি, সুরবালা, সে কেবল তোমারই কৃপায়। তোমার স্নেহ, তোমার মমতা, তোমার রূপ এবং তোমার গুণ আমাকে বড় দুরাশা সাগরে ভাসাইয়াছে। এখন যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তোমাকে না পাইলে আর বাঁচিতে পারিব না। এ জীবন রাখিয়াছ তুমি—

ইহা তোমারই সম্পত্তি। তুমিই এখন আমার সুখের কেন্দ্র। তোমার সন্তোষের জন্যই এখন আমার জীবনে মায়া। তোমাকে পাইলে আমার দগ্ধ জীবন পুনর্জীবিত হইবে; কিন্তু বল সুরবালা, আমাকে লইয়া তোমার কি হইবে?"

সুরবালা উত্তর দিলেন—

"আমার যে কি হইবে, তাহা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমাকে যদি আমি সুখী করিতে পারি, তোমাকে যদি আমি হাসাইতে পারি, তোমাকে যদি আমি আনন্দিত করিতে পারি তাহা হইলেই আমার আশার পূর্ণ তৃপ্তি হইবে, আমার সুখের সীমা থাকিবে না। তোমার সুখেই আমার সুখ, তদ্ভিন্ন অন্য সুখের কামনা এ দাসীর নাই।"

তখন সস্নেহে রমাপতি সুরবালাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—

"ধন্য এ জীবন। সুরবালা, যে অভাগা ছিল, সে আজি তোমার কৃপায় পরম ভাগ্যবান। এ অধম আজি হইতে তোমারই দাস।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বড়ই সমারোহে রমাপতি ও সুরবালার বিবাহ হইল। এমন সমারোহ, এত ধূমধাম ইহার পূর্ব্বে সে অঞ্চলের লোকেরা আর কখন দেখে নাই। নানাবিধ বাদ্য, নৃত্য, গীত, ভোজ, আলোক, দানাদি উৎসব ব্যাপারে কয়দিন নগর মহোচ্ছ্বাসময় হইল। প্রায় লক্ষ মুদ্রা এই বিবাহকাণ্ডে ব্যয়িত হইল এবং সমস্ত নগর এক পক্ষ কাল মহানন্দে মগ্ন রহিল।

অদ্য ফুলশয্যা। যে প্রকোষ্ঠে নব দম্পতীর পুষ্পবাসর হইবে তাহার শোভার সীমা নাই। তথায় নানাবিধ সুরম্য স্ফাটিক আধারে আলোকমালা জ্বলিতেছে। সর্ব্ববিধ গন্ধময় পুষ্পরাশিতে সে গৃহ সুন্দররূপে সমাচ্ছন্ন। ভিত্তিগাত্রে মনোহর ফুলমালাসমূহ সুচারুরূপে সুসজ্জিত। দ্বার ও বাতায়ন সমূহে পুষ্পের যবনিকা সমূহ বিলম্বিত। প্রকোষ্ঠের স্থানে স্থানে অপূর্ব্বপাত্রে সুদৃশ্য পুষ্পগুচ্ছসমূহ সংস্থাপিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে এক অতি শোভাময় পর্য্যঙ্ক। তাহার উপর স্বর্ণসূত্রসমন্বিত শয্যা, তাহার আস্তরণপ্রান্তে

মুক্তামালার ঝালর। সেই পর্য্যঙ্কে সর্ব্বভূষণসমাচ্ছন্নকায়া সুরবালা এবং রমাপতি সমাসীন।

বিধাতঃ! তোমার অচিন্ত্য লীলার রহস্যোদ্ভেদ করিবার ক্ষমতা ক্ষুদ্র মানবের নাই। তোমারই কৃপায়, যে রমাপতি নিতান্ত দীনহীন ছিল, সে আজি এই বিপুল বিভবের সর্ব্বেশ্বর। যে ব্যক্তি কিছু দিন পূর্ব্বে আপনাকে নিতান্ত দীনহীন বলিয়া মনে করিত সে আজি আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া জ্ঞান করিতেছে। কিছু দিন পূর্ব্বে অতি সামান্য দাসত্ব যাহার জীবিকা ছিল, আজি শত জনে তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে; সে আজি অচিন্ত্যপূর্ব্ব সুখ সৌভাগ্য সম্বেষ্টিত। বিজ্ঞান আমাদিগকে শিখাইতেছে, যে স্থানে একদা সুবিস্তৃত সাগর-সলিল লহরীলীলা বিকাশ করিত, তথায় এক্ষণে সমুন্নত, সুকঠিন, শুষ্ককায় গিরিরাজ দণ্ডায়মান। যে স্থান এক কালে মকর কুম্ভীরাদি জীবের লীলা-ক্ষেত্র ছিল, তাহা এক্ষণে সিংহ তরক্ষু ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ-সঙ্কুল হইয়াছে। হে বিধাতঃ! এরূপ অচিন্তনীয় বিপর্য্যয় যদি তুমি ঘটাইয়া থাক তাহা হইলে তোমার হস্তে মানবের এতাদৃশী দশা পরিবর্ত্তনে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। ভাগ্যবান রমাপতি আজি সর্ব্ব সৌভাগ্যের সম্পূর্ণ অধীশ্বর। আজি হইতে রমানাথের বিপুল বিভব তাঁহার বাসনার অধীন। সর্ব্বোপরি আজি হইতে সুন্দরীকুলকমলিনী, সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী, রমাপতির প্রেমের কেন্দ্র, আনন্দের আধার, সুরবালা তাঁহার আপনার।

কিন্তু এ সময়ে, সুকুমারী, তুমি কোথায়? দেখ তোমার সেই রমাপতির আজি একি বিস্ময়াবহ পরিবর্ত্তন। দেখ তোমার সেই চিরাধিকৃত স্থানে আজি আর এক নবীনা বিরাজ করিতেছেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু নবদম্পতী এখনও নিদ্রার অধীনতা স্বীকার করেন নাই। এরূপ দিনে কে কোথায় তাহা করিয়াছে? যদি কেহ তাহা করিয়া থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তাহাদের বিবাহই অসিদ্ধ। দম্পতী নিদ্রাগত হন নাই বটে, কিন্তু অলসিত ও অবসিত হইয়াছেন। প্রেমের অনর্থক বাক্য, এক কথার শত পুনরুক্তি, আশার আশ্বাস, আনন্দের অসীমতা, হৃদয়ের পূর্ণতা প্রভৃতি প্রেমারম্ভকালে যেমন যেমন বিধান আছে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনই ক্রুটী হয় নাই।

তবে এতক্ষণ কথাবার্ত্তা যেরূপ খরস্রোতে ও সমুৎসাহে চলিতেছিল, তাহা এখন অনেক মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ রাত্রিকালে পক্ষী-কূজনের যেমন এক নূতনবিধ ধ্বনি হয় এখন তাহাই হইতেছে। গৃহ-মধ্যস্থ আলোকসমূহ কেমন সাদা সাদা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ সময়ে সুরবালার একটু নিদ্রাবেশ হইল।

তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! কি করিলাম? ইচ্ছা করিয়া এ সাধের শিকল কেন পায়ে পরিলাম? আজি আমি কাহার জিনিষ কাহাকে দিলাম? ইহাতে কি আমি সুখী হইব?" ক্ষণেক চিন্তা করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—'সুখী হইব যে তাহার আর সন্দেহ কি? আজি আমার যে সুখ, জগতে এমন সুখ আর কাহার আছে? আমি তো আজ ধন্য হইলাম। সুরবালা যাহার স্ত্রী হইল ইহ জগতে সে তো স্বর্গসুখ ভোগ করিবে। এত রূপ, এত গুণ, এত ভালবাসা আর কোথায় কেহ দেখিয়াছে কি? সেই সুরবালা আজি হইতে আমার!" আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু আমার যে ছিল, সে আজি কোথায়? সে সুকুমারী আমার কোথায় গেল? আমি তো তাহাকে ভিন্ন জানিতাম না, তাহাকেই ত প্রাণ লুটাইয়া ভাল বাসিয়াছিলাম। এ দেহ, এ প্রাণ তো তাহারই। তাহার সে ভালবাসার আদি নাই অন্ত নাই।" তখন একে একে অমূল্য পূর্ব্বকথা মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমারীর সহিত বিবাহ; বিবাহের পর ফুলবাসরে সুকুমারীর সহিত প্রথম পরিচয়; তাঁহার হৃদয়ের অপার্থিব উদারতা, তাঁহার প্রেমের অমেয় গভীরতা, তাঁহার পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য, সকল কথাই ক্রমে ক্রমে মনে পড়িল। আর মনে পড়িল তাঁহার সেই দুরবস্থার কথা। ছিন্ন কন্থা-বিস্তৃত তৈলাক্ত মলিন উপাধানযুক্ত শয্যায় তাঁহারা শয়ন করিতেন; সুকুমারী রন্ধন করিতেন, ঘর ঝাঁইট দিতেন, বাসন মাজিতেন, কূপ হইতে কলসী করিয়া জল তুলিতেন; পরিতে হইবে বলিয়া ছিন্ন বস্ত্র সেলাই করিতেন, না করিতেন কি? স্বর্ণ ও রৌপ্যভূষণ কখন সুকুমারীর অঙ্গে উঠে নাই, ছিন্নভিন্ন কার্পাসবস্ত্র কথঞ্চিৎ রূপে তাঁহার দেহাভরণ করিত মাত্র। আর আজি? আজি যে নবীনা

সুকুমারীর স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার দেহের সর্ব্বত্র মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার; গৃহকর্ম্ম স্বহস্তে সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, কিরূপ প্রণালীতে তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাও সে জানে না। সুকুমারীর শত বস্ত্রের মূল্য একত্রিত হইলে যত হয়, তদপেক্ষাও তাহার পরিধানবস্ত্র অধিক মূল্যবান। দশজন দাসী তাহার আজ্ঞাপালনে ব্যস্ত, অতুল ঐশ্বর্য্য তাহার সুখ সম্বিধানে নিযুক্ত। তখন রমাপতি ভাবিতে লাগিলেন,—আমার সেই সুকুমারী, আমার সেই দুঃখিনী সুকুমারী আর নাই। এত কাঁদিয়া, এত দেহপাত করিয়াও আর তাহার দেখা পাইলাম না। সে আর ইহ জগতে নাই। ইহজগতে নাই, কিন্তু আর কোথাও সে নাই কি? আত্মার তো ধ্বংস নাই। তাহার দেহলয়ের সহিত তাহার আত্মার লয় কখনই হয় নাই। তবে সুকুমারী, দেবি, তুমি দেখিতেছ কি ঐ স্বর্গধাম, তোমার বাসস্থান ঐ স্বর্গধাম হইতে দেখিতেছ কি, তোমার সেই রমাপতি কেমন শঠ, কেমন প্রবঞ্চক, কেমন বিশ্বাসঘাতক!"

সহসা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যস্থ নিষ্প্রভ আলোকে রমাপতি দেখিলেন যেন গৃহের ভিত্তিতে একটী অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। সেই সুরক্ষিত পুরীর রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে আবার মনুষ্যের ছায়া! রমাপতি মনে করিলেন, হয় ত কোন দাসী, যাহারা পরিহাস করিতে পারে এমন কোন পরিচারিকা গৃহমধ্যে আসিয়া থাকিবে। তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং চীৎকার করিলেন,—

"কে? কে ওখানে?"

কেহ উত্তর দিল না। তাঁহার নেত্র সম্মুখস্থ ছায়া সরিয়া গেল না, কেবল একটু নড়িল মাত্র। সুরবালার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

"কি কি? ভয় পাইয়াছ নাকি?"

রমাপতি বলিলেন,—

"ভয় নহে, ঐ দেখ কাহার ছায়া।"

সুরবালা বলিলেন,—

"কই, কই?"

ছায়া এবার সরিতে লাগিল। যে ছায়া ভিত্তিগাত্রে লাগিয়াছিল, তাহা ক্রমে হর্ম্ম্যতলসংলগ্ন হইল।

রমাপতি বলিলেন,—

"এই যে! ঐ যায়!"

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি শয্যাত্যাগ করিলেন এবং যে দিকে লোক থাকিলে এরূপ ছায়াপাত হইতে পারে সেই দিকে চলিলেন। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে আর একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। সেই প্রকোষ্ঠে একটী সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। উভয় প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই দিকেই মনুষ্য থাকা সম্ভব মনে করিয়া রমাপতি সেই দিকেই আসিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইতে না হইতে তাঁহার সংজ্ঞা তিরোহিত হইয়া গেল। তিনি 'সুকুমারি, সুকুমারি!' শব্দে চীৎকার করিয়া সেই হর্ম্ম্যতলে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও আসিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিলেন না। তখন অতি যত্নে তিনি রমাপতির শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

অচিরে রমাপতি সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"সুকুমারি, সুকুমারি! এতদিন পরে তোমার আমার কথা মনে পড়িল? না না, তুমি সুরবালা। সুরবালা, সুরবালা, আমার সুকুমারী কোথায় গেল?"

সুরবালা বলিলেন,

"তুমি কি বলিতেছ? সুকুমারী তো আমার দিদির নাম। তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ, এ কথা কি সম্ভব?"

রমাপতি বলিলেন,

"তাহা আর বলিতে? তুমি আমার সম্মুখে রহিয়াছ তাহা যেমন সত্য আমার সুকুমারীকে দেখাও তেমনই সত্য। কিন্তু কোথায় সুকুমারী? সুরবালা, সন্ধান কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিবে, দেখ কোথায় সুকুমারী!"

সেই রাত্রিশেষে সেই সুবিস্তৃত ভবনের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল। যাহা হইবার নহে তাহা হইল না, সুকুমারীর কোনই সন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল দেখা গেল সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের

একটী দ্বার উন্মুক্ত আছে। সে পথ দিয়া কেহ আসিয়াছিল বলিয়া কেহই মনে করিল না। সকলই রমাপতির মনের বিকার বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

তখন সুরবালা রমাপতিকে বলিলেন,

"তুমি সারাদিন সারারাত দিদির কথাই ভাব। রাত্রে শুইয়া শুইয়াও হয় ত তাই ভাবিতেছিলে; তাহাতেই হয় ত এ ভ্রম হইয়া থাকিবে।"

রমাপতি এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু প্রাতে সকলে দেখিল রমাপতি বাবুর মূর্ত্তির ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ বাবুর সুবিস্তৃত সৌধমালার অনতিদূরে একটী পুষ্করিণী ছিল। সেই সরোবরে কোন সময়ে দুইটী বালক বালিকা ডুবিয়া মরিয়াছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার পর হইতে লোকে ইহাকে 'মরার পুকুর' নাম দিয়াছে। নাম যাহাই হউক, এই দুর্ঘটনার পর হইতে সন্নিহিত জনসাধারণের মনে একটা বড় ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল এবং পরম্পরাগত স্ত্রীরসনাসৃষ্ট বিবিধ ভয়াবহ কাহিনী সেই ভীতি আরও সম্বর্দ্ধিত করিয়াছিল। এ জন্য সেই পুষ্করিণীতে মনুষ্য যাতায়াত করিত না। কাজেই একদা যাহা পরম শোভাময় ও নয়নরঞ্জন ছিল তাহা এক্ষণে পরিত্যক্ত, সুতরাং শ্রীভ্রষ্ট ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। পুষ্করিণীর সোপানাবলী এক্ষণে ভগ্ন, তাহার চারিদিক নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ তরু গুল্মে পরিপূর্ণ। সেই সকল বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পুষ্করিণীর ভূরিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তীরের কোন কোন লতা মুখ বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে জলের উপর অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বকালে যাহাই থাকুক, বর্ত্তমান কালে যে এই পুষ্করিণীর অবস্থা বিশেষ ভীতিজনক তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই পুষ্করিণীতে লোকজন আসিত না। কিন্তু আজি এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে, এই জনহীন ও ভয়সমাকুল সরোবরের

মধ্যভাগে অবগাহন করিয়া এক শ্যামাঙ্গী যুবতী গাত্র ধৌত করিতেছে। যুবতীর বয়স ২৪।২৫ হইতে পারে। তাহার বদনে উৎসাহ ও দৃঢ়তার রেখাসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত। তাহার দেহ মাংসল কিন্তু কোমলতাবর্জ্জিত। তাহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল ও পাপবাসনাব্যঞ্জক। যুবতী নানা ভঙ্গীতে অঙ্গমার্জ্জনী লইয়া দেহের সর্ব্বস্থান সযত্নে সংঘর্ষণ করিতেছে। অবিশ্রান্ত ঘর্ষণেও যে, দেহের কৃষ্ণত্ব বিদূরিত হইবার নহে, এ কথা হয় ত যুবতী বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য্য ভীতিহীনতার সহিত যুবতী বহুক্ষণ বিবিধবিধানে আপনার শ্যামকায়া ও পরিধানবস্ত্র তত্রত্য সলিলে বিধৌত করিল। তাহার পর তীরসন্নিধানে আসিয়া তথায় যে পিত্তল কলস পড়িয়া ছিল তাহা উত্তমরূপে মার্জ্জিত করিল। পরে আবার জলে অবতরণ করিয়া তাহা জলপূর্ণ করিল। তাহার পর বামকক্ষে কলস গ্রহণ করিয়া এবং আপনার পরিধানবস্ত্রের নিম্নভাগ সুবিন্যস্ত করিয়া দিয়া যুবতী ধীরে ধীরে সেই ভগ্ন সোপানে অতি সাবধানতার সহিত আরোহণ করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কিয়ৎকাল যেরূপ গাঢ় ও মলিন অন্ধকার দেখা দেয়, এখন তাহা দেখা দিয়াছে। সর্ব্বাশঙ্কাবিরহিতা যুবতী অন্ধকার, জনহীনতা, বন, ভয়জনক কিম্বদন্তী সকলই উপেক্ষা করিয়া কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে এক মনুষ্যমূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বলিল,—

" কেও, রামলাল ? কতক্ষণ ? "

পুরুষ বলিল,—

" আধ ঘণ্টারও উপর। বাপরে, এমন গা ধোওয়ার ঘটা কখন দেখি নাই ; তোমার যে রূপের নেশায় এ গোলাম পাগল তা আর অমন করিয়া ঘসিয়া মাজিয়া বাড়াইও না ভাই ; তোমার পায়ে পড়ি। "

যুবতী বলিল,—

" পাগল এখনও হও নাই বলিয়া আমার এমন ঘসা মাজা করিতে হইতেছে। ছিঃ, তোমার কেবল কথা ! "

রামলাল বলিল,—

" কালি, এততেও তোমার মন পাইলাম না। হয় ত তোমার পায়ে প্রাণ

না দিলে তুমি বুঝিবে না আমি তোমার জন্য কেমন পাগল। ভাল এবার তাহাই করিয়া দেখাইব।"

যুবতীর নাম কালীমতী, কি কালীতারা, কি কালিদাসী, কি এমনই একটা কিছু হইবে। আমরা তাহার নিগূঢ় সংবাদ জানি না।

কালী বলিল,—

"কেমন করিয়া তোমার কথা শুনিব? যে কাজটা চোখ কাণ বুজিয়া একবার সারিয়া ফেলিতে পারিলে আমাদের সুখের পথে আর কাঁটা থাকে না, আমাদের আর এমন করিয়া অন্ধকার বনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, তাহার জন্য তোমাকে এতদিন বলিতেছি, তুমি আজিও তাহার উপায় করিয়া উঠিতে পারিলে না। কেমন করিয়া বলিব তুমি আমার জন্য পাগল? পাগল অনেক দূরের কথা, তুমি যদি আমাকে একটুও ভাল বাসিতে তাহা হইলে কোন্ দিন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিতে।"

রামলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—

"তুমি বুঝিতেছ না, কালি, কাজটা বড় শক্ত। একটা মানুষ নিকাশ করা আজিকার দিনে সোজা কথা নয়। ঐ শক্রটাকে সরাইয়া না দিলে যে আমাদের মঙ্গল নাই, তা আমি বেশ জানি, কিন্তু করি কি বল দেখি?"

কালী নিতান্ত রাগতস্বরে বলিল,—

"করিবে তোমার মাথা আর আমার মুণ্ড! অমি বুঝিয়াছি তুমি কোন কর্ম্মের নও। অমি যদি তোমার মত পুরুষ মানুষ হইতাম, তাহা হইলে, কোন্ কালে সকল কাজ শেষ করিয়া দিতাম। কি বলিব আমি মেয়ে মানুষ, তাতেই তোমাকে এত সাধাসাধি। বুঝিয়াছি তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না; এখন তোমাকে আমি দেখাইব, তোমার মত পুরুষের চেয়ে মেয়ে মানুষও ঢের ভাল। এ জ্বালা আমার আর সহে না। আমি আজিই এদিক ওদিক যা হয় একটা করিয়া ফেলিব স্থির করিয়াছি। সকল কাজই আমি করিব, কেবল সময়কালে তুমি একটু সাহায্য করিবে কি না আমি জানিতে চাই। তাও বোধ করি তোমাকে দিয়া হইয়া উঠিবে না—কেমন?"

রামলাল একটু থতমত খাইয়া বলিল,—

"তা—তা আর পারিব না? আমাকে যা করিতে বলিবে, আমি তাই

করিব। বালাইটাকে যেমন করিয়া হউক দূর করিতে পারিলেই বাঁচা যায়। কিন্তু আমি বলিতেছিলাম কি—বলি এত তাড়াতাড়ি না করিয়া একটু দেরি করিলে চলে না কি?"

কালী অতিশয় বিরক্তির সহিত বলিল,—

"না, তা চলে না। তুমি ভেড়াকান্ত, তাই এখনও এ কথা বলিতেছ। দেরি—একাজে আবার দেরি? এখনই যদি সুযোগ হয় তা হলে আমি এখনই কাজ সারিতে রাজি আছি। কিছু দেরি নয়; আজি রাত্রেই আমি যেমন করিয়া পারি কাজ ফরষা করিব। আমি নিজে সব করিব, তোমাকে কেবল কাজ শেষ হওয়ার পর আমার একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাও কি ছাই তোমাকে দিয়া হবে না? তোমার যদি এতটুকু ভরসা নাই তবে তুমি এ কাজে নামিয়াছিলে কেন? আর আমাকেই বা এমন করিয়া মজাইলে কেন?"

রামলাল বলিল,—

"তা তুমি যা বলিবে তাই আমি শুনিব। তুমি আমাকে যে দিকে চালাইবে আমি সেই দিকেই চলিব; তাতে আমার অদৃষ্টে যা হয় হউক। তা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, বলি বিষ টিষ খাওয়াইয়া কাজ শেষ করা হবে তো?"

কালী অতি ক্রোধের সহিত বলিল,—

"তোমার মাথা, আহম্মক, ভেড়াকান্ত, সে ভাবনা তোমায় ভাবিতে হইবে না। এখন যা যা বলি শুন। ঠিক সেই রকম কাজ চাই। না যদি পার, ভাই, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।"

রামলাল বলিল,—

"কেন ভাই, এত শক্ত কথা বলিতেছ? বল কি বলিবে। যা বলিবে তাই আমি করিব।"

তখন কালী ও রামলাল খুব কাছাকাছি হইয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া অনেক কথা কহিল। তাহার পর রামলাল বলিল,—

"তোমার ভিজে কাপড় গায়ে শুকাইয়া গেল, এখন বাড়ী যাও। আমি ঠিক সময়ে হাজির হইব।"

কালী বলিল,—

"দেখিও, সাবধান। একটু এদিক ওদিক হয় না যেন।"

রামলাল বলিল,—

"সেজন্য ভয় নাই। আমি ঠিক সময়ে আসিব।"

তাহার পর এক দিকে রামলাল ও অপর দিকে কালী প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শশী ভট্টাচার্য্য যাজক ব্রাহ্মণ। লোকটীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দেখিতে কৃষ্ণকায়, উচ্চদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, সুতরাং, সুপুরুষ নহেন। ব্রাহ্মণের শাস্ত্রাদি কিছু দেখা শুনা আছে; বিশেষতঃ দশকর্ম্মে তিনি বিশেষ নিপুণ। তাঁহার অবস্থা বড় মন্দ। বাসগৃহ একখানি সামান্য খড়ের ঘর, ঘরের সম্মুখে একটু ছোট উঠান, সেই উঠানের এদিকে ওদিকে কয়েকটী লাউ কুমড়ার গাছ, তাহার চারিদিকে কঞ্চির বেড়া। অবস্থা মন্দ হইলেও গ্রামের লোকেরা ব্রাহ্মণকে বড় শ্রদ্ধা করে ও ভাল বাসে। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল। তাঁহার কোন দোষের কথা কেহ কখন শুনে নাই ও বলে নাই। কালী নাম্নী যে যুবতী স্ত্রীলোকের কথা এখনই হইতেছিল, সে এই ব্রাহ্মণের স্ত্রী। ব্রাহ্মণের ফাটা পা, গুম্ফহীন বদন, শিখাশোভিত শির, নস্যপূর্ণ নাসা, পুণ্ড্রযুক্ত ললাট ইত্যাদি কুলক্ষণে কালী বড় নারাজ ছিল। এ সকল কুলক্ষণ ছাড়া তাঁহার আরও কিছু মহৎ দোষ ছিল। তিনি বড় ধার্ম্মিক এবং নিয়ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। এ মহৎ দোষ কালী মোটেই পছন্দ করিত না। কাজেই সতত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তর চলিত। ব্রাহ্মণ বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ; এজন্য তিনি আপনার পত্নীকেও ধর্ম্মনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কালী এরূপ ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কোন ধার ধারিত না; সুতরাং সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর নিতান্ত বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কালীরও বড় বাড়াবাড়ি ছিল। কালী বেলা ৪টার সময় ঘাটে যাইত, রাত্রি নয়টা বাজাইয়া বাটী ফিরিত। কালী সময় নাই,

অসময় নাই, ঘরকন্নার কাজ নাই, অকাজ নাই, যখন তখন বাহিরে যাইত এবং দুই তিন ঘণ্টা কাটাইয়া আসিত। ব্রাহ্মণ এ সকল কারণে সদাই খিট্ খিট্ করিতেন। কালী তাহাতে বড় জ্বালাতন হইত এবং কখন মাথা কুটিয়া কখন বা কাঁদিয়া জিতিত।

আজি কালী সন্ধ্যার অনেক আগে গা ধুইবার ওজরে বাহির হইয়াছে, এত রাত্রি হইল এখনও বাটী ফিরিল না। ভট্টাচার্য্য চটিয়া লাল হইয়া বসিয়া আছেন এবং সকল জ্বালার শেষ হইবে মনে করিয়া ঘন ঘন নস্য লইতে-ছেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিয়াছেন যে আজি কালীরই একদিন কি তাঁহা-রই একদিন। আজি ব্রাহ্মণ কালীকে বিলক্ষণ শিক্ষা না দিয়া ছাড়িবেন না। কপালে যাই থাকুক, তিনি আজি কালীর খাতির রাখিবেন না। কিন্তু এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, কালী যতই অন্যায় কাজ করুক এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালীর উপর যতই রাগ করুন, তিনি কালীকে বেজায় ভাল বাসিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। সেটা কালী মোটেই জানিত না এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেও তাহা অনেক সময়ে বুঝিতে পারিতেন না। কিসে কালী সুখে থাকিবে, কিসে কালীর খাওয়া পরার কষ্ট হইবে না, কিসে কালীর গায়ে দুই এক খানা সোণা রূপার অলঙ্কার উঠিবে, কিসে নিজের পাতের মাছখানা না খাইয়া কালীর জন্য রাখিয়া যাইবেন, কিসে যজমানের বাড়ী, ফলাহারে বসিয়া নিজে না খাইয়াও বিলক্ষণ এক পাত্র কালীর জন্য আনিতে পারিবেন, ইত্যাদি ভাবনা তিনি সর্ব্বদাই করিতেন। তিনি জানি-তেন এরূপ ব্যবহার না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না বলিয়াই করেন। ইহার মূলে যে বিলক্ষণ ভালবাসা আছে তাহা তিনি বড় একটা মনে করি-তেন না। কালী ভাবিত, হতভাগা, মড়িপোড়া, পোড়ারমুখো বামুন, ওর আবার ভালবাসা। আমার পোড়া কপাল তাই ওর হাতে পড়েছি।

রাত্রি ঢের হইয়া গিয়াছে। তখন হেলিতে দুলিতে, ঘড়ার জল থকাস্ থকাস্ করিয়া নাচাইতে নাচাইতে ভট্টাচার্য্য-সীমন্তিনী গৃহাগতা হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শশি ঠাকুরের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"বেরো কালামুখী, বেরো আমার বাড়ী হইতে।"

অন্য দিন হইলে কালী বিলক্ষণ মাত্রা চড়াইয়া কাপ্তিনি মহাজনদের হিসাবে সুদ ও কমিশন সমেত হিসাব করিয়া জবাব দিয়া তবে ছাড়িত। কিন্তু আজি ভট্টাচার্য্যের কোন অজ্ঞাত পুণ্যফলে কালী বিলক্ষণ দয়া করিয়া উত্তর দিল,—

"এত রাগ করা কেন? সারাদিন ঘরের কাজ কর্ম্ম করিয়া একবার বাহিরে যাই; দুটা মেয়ে ছেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, কাজেই দুটা কথা কহিতে দেরি হইয়া যায়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবাক হইলেন। কালীর মুখে এমন উত্তর! তিনি রাগ-ভরে শাসন করিবার জন্য খড়ম দেখাইলে যে কালী সত্য সত্যই খেঙরা বাহির করে, দুটা তিরস্কার করিলে যে কালী বাপান্ত করিয়া ছাড়ে, মারিব বলিয়া ভয় দেখাইলে যে কালী তাঁহার সটীক শিরে লাথি মারিতে আইসে, সেই কালীর মুখে আজি এই উত্তর শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় একেবারে অবাক্ হইলেন। ভাবিলেন এতদিনে মধুসূদন আমার পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এতদিনে দীনবন্ধু আমার এই দুঃখের সংসার সুখের করিয়া দিলেন। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কালীর মতি গতি এমন ফিরিবে কেন? তিনি না পারেন কি? কালীর উত্তর সত্য ও সম্ভব কি না, ব্রাহ্মণ আহ্লাদে সে বিচার করিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি স্নেহস্বরে বলিলেন,—

"ব্রাহ্মণি, তা তো হতেই পারে। সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম বন্ধ করাইয়া যদি তোমাকে কখন সুখী করিতে পারি, তবেই তো আমার জীবন সার্থক। তোমার উপর রাগ করিয়া কি আমি সুখ পাই? তোমাকে দুটা রাগের কথা বলিলে আমার যে কষ্ট হয় তাহা আর কি বলিয়া বুঝাইব? তবে মানুষের নাকি শত্রু অনেক, এই জন্যই সকল কাজে সাবধান হওয়া আবশ্যক। তুমি ছেলে মানুষ; পাছে সকল কথা সকল সময়ে ভাল করিয়া বুঝিতে না পার, এই জন্য এই একটা সাবধানের কথা সময়ে সময়ে তোমাকে বলিয়া দিতে হয়। তা তুমি এখন কাপড় ছাড়। দেখ দেখি সন্ধ্যার আগে তুমি গা ধুইয়াছ, সেই ভিজে কাপড় এখনও তোমার গায়ে রহিয়াছে; এতে অসুখ হবারই কথা। এ কথা যদি তোমাকে আমি না বুঝাই তবে কে বুঝাইবে বল?"

কালী তখন দড়ীদ্বারা লম্বিত এক বাঁশের আল্‌না হইতে এক খানি কাপড় হাতে লইয়া একটু অভিমানের হাসি হাসিয়া বলিল,—

" আমি কি তোমার চেয়ে পণ্ডিত যে তুমি যেমন বুঝাইবে, আমিও তেমন বুঝিব? তোমার মত পণ্ডিত আমাদের এদেশে আর কেহ নাই। আমি যেখানে যাই সেখানেই আমাকে ভট্টাচার্য্য ঠাকুরুণ বলিয়া লোকে কত মান্য করে। তোমার মত পণ্ডিতের হাতে পড়িয়া কোন কথা বুঝিতে হইলে আমাকে কি রামা হাড়ির কাছে যাইতে হইবে? "

ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন কি সৌভাগ্য! আমার কালীর এমনই দেব প্রকৃতিই বটে; তবে ছেলে মানুষ; এতদিন সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। ভগবান কৃপা করিয়া এত দিনে আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, ইহা আমার অশেষ ভাগ্য। বলিলেন,—

" লোকে আমাকে মান্য করে সত্য, কিন্তু লোকে আপন আপন পরিবারকে যেমন করিয়া খাওয়ায় পরায়, যেমন করিয়া সুখসচ্ছন্দে রাখে, আমি যে তোমাকে তাহার কিছুই করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার মরিলেও যাইবে না। "

সত্যই ব্রাহ্মণের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। তখন কালী বলিল,—

ছিঃ ছিঃ! এজন্য তুমি মনে দুঃখ করিতেছ! তোমার স্ত্রী হইতে পাওয়ায় আমার যে সুখ, বোধ করি, রাজরাণীরও তাহা নাই। দেশের মধ্যে তোমার মত ধার্ম্মিক,' তোমার মত মানী আর কে আছে? অনেক সুকৃতি ফলে এ জন্মে তোমাকে পাইয়াছি; নারায়ণ করুন যেন জন্মে জন্মে তোমাকেই পাই।"

এবার ব্রাহ্মণ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। সুখের আশায় কালীর সহিত ঘর পাতিয়া অবধি ভট্টাচার্য্যের কপালে এমন সুখ একদিনও ঘটে নাই। তাঁহার চক্ষে জল দেখিয়া কালী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিল এবং আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া অতি যত্নে তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিল,—

" রাত্রি অনেক হইল, খাওয়া দাওয়া কর। আজি মল্লিকদের বাড়ী থেকে দই চিড়া ও সন্দেশ ফলারের জন্য দিয়া গিয়াছে। তুমি খাবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছি। ওঠ এখন, বেশী রাত্রে খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়; আর দেরি করিলে অসুখ হইবে। "

কালী উঠিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আহারের উদ্যোগ করিতে গেল। উদ্যোগ ঠিক হইলে কালী ভট্টাচার্য্যকে উঠিয়া আসিবার জন্য সাদরে ডাকিল। ভট্টাচার্য্য পিঁড়েতে বসিয়া আহারে নিযুক্ত হইলেন। চিরদিনই তো তিনি দধি চিনি টক আহার করিয়া থাকেন, কিন্তু আজি কি মিষ্ট! আজি তাঁহার ঘরের ক্ষীণ প্রদীপ কি উজ্জ্বল, আজি তাঁহার পর্ণকুটীর কিরূপ সর্ব্বসুখময়, আজি তাঁহার গৃহসজ্জা কি চমৎকার, আজি তিনি নিজে কি আনন্দময় এবং সর্ব্বোপরি আজি তাঁহার ব্রাহ্মণী কি সুন্দরী, মধুরভাষিণী, এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, যাহার গৃহে এমন ধন, সে আবার দরিদ্র কিসে?"

আহারাদি শেষ হইলে তাঁহার সাধের ব্রাহ্মণী তাঁহাকে একটা পান দিলেন। তিনি কালীকে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কালী স্বামীর পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিয়া ও আবশ্যক কর্ম্ম সমস্ত করিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। সে রাত্রে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যেমন নিদ্রা হইল, তেমন সুখে তেমন সুনিদ্রা তাঁহার জীবনে আর কখন হয় নাই।

সমালোচন বিভ্রাট।

জগু বাবু খাতা মুখস্থ করণে গাঢ় নিবিষ্ট।

জগু। (দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্বার্ট্ স্পেন্সার; মেকলে, হার্বার্ট্ মিল, জন্ ষ্টুয়ার্ট্ স্পেন্স্—আ-হা-হা-হা! দূ-র হোক্ গে ছাই—বেটাদের নাম গুলো এমন বদ্ যে মুখস্থ কর্ত্তে না কর্ত্তে উল্টে পাল্টে একাকার হয়ে যায়! আর পোড়া কালও এমন পড়েছে যে, এমন লিখ্‌তে পারি, এমন কইতে পারি, এমন সমালোচনা কর্ত্তে পারি—এমন স-ব পারি, তবু সে-ই ইংরেজি দু একটা বোল, দু এক খান বইএর নাম, দু একটা মানুষের নাম, এ না কর্ত্তে পার্‌লে লোকে বাহবা দিতেই চায় না।

(রঘুর প্রবেশ।)

আস্‌তে আজ্ঞা হয়, রঘু বাবু! কবির সঙ্গে তিন তিনটা দিন দেখা না হওয়া আমি বড় দুর্লক্ষণ মনে কচ্ছিলেম।

রঘু। (উপবেশনান্তে) মনে কর্‌লে দুর্লক্ষণের হাত এড়াতে না পার্‌তেন এমন বোধ হয় না।

(কানাইএর প্রবেশ)

কানাই। বেশ হয়েছে আজ আপনারা দু জনে উপস্থিত আছেন; দেখে শুনে আমার বইএর যা হয়, একটা এস্‌পার ওস্‌পার ক'রে দিন।

জগু। তাই ত, আপনাকে আজ আস্‌তে বলেছিলেম বটে, কিন্তু আমার হয়েচে কি জানেন, অবকাশ আজ কাল বড় কম। অনেক লিখ্‌তে হয়, ভাব্‌তে হয়, মেলা ইংরেজি বই পড়তে হয়, কখন্ আপনার বই দেখি?

রঘু। (কানাইএর প্রতি) কি বই? সে দিন যে উপন্যাস খানি এনেছিলেন সেই খানি নাকি?

কানাই। আজ্ঞে হঁা, সেই খানি। তা দেখুন, আজ আপনারা দুজনেই আছেন, এমন সুবিধে সব দিন হবে না।

জগু। তা আচ্ছা, আজ যতটা হয় হোক্। তা আপনিই পড়ুন, আমরা শুনে যাই।

কানাই। (পুস্তক খুলিয়া) "বিজয়গ্রামের একটি পর্ণকুটীরে জনৈক বৃদ্ধা বাস করিতেন—

জগু। ও হ'ল না, উপন্যাস ধরাই হ'ল না।

রঘু। ও হ'ল না, হ'ল না।

কানাই। তবে কি ক'রে ধরবো বলুন!

জগু। উপন্যাস লেখা কি আপনি সহজ মনে করেন, মশায়? আপনি মেকলের এ-টা পড়েন নি?

কানাই। কি টা বলুন দেখি?

জগু। ঐ-যে এ-টা, বেশ নামটি- মনে পড়্‌চে না। তা যাই হোক, সে-টা কি আপনি পড়েন নি?

কানাই। কি-টা বল্‌চেন ভাল বুঝতে পাচ্চিনে। তা উপস্থিত স্থলে কি দোষটা হয়েছে সেইটাই বলুন না কেন?

জগু। দোষ-টা কি হয়েছে জানেন, ও উপন্যাস ধরাই হয় নি। (একটু ভাবিয়া) ভাল, ঐ বুড়ী বই কি ওদের ঘরে আর কেউ ছিল না?

কানাই। হঁা—ছিল, তা এর পরেই জান্‌তে পার্‌বেন।

জগু। কে ছিল?

কানাই। একটি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী কন্যা—দুঃখের সময়ে বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন।

জগু। বেশ ছিল। আপনার উপন্যাসে জিনিস আছে, কিন্তু আপনি তা সাজাতে পারেন না।

কানাই। তা ভাল, কি ক'র্‌লে সাজে তাই না-হয় বলুন?

রঘু। ঐ খান থেকেই উপন্যাস ধরুন।

কানাই। কোন্ খান থেকে?

রঘু। ঐ-যে ঐ দুঃখের সময়ে এক মাত্র অবলম্বন—

কানাই। তা এখন কি ক'রে হবে?

জগু। কেন? ধরুন—"বিজয় গ্রামের একটি অট্টালিকার বাতায়নে জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা আজ কি ভাবিতেছিল—"

কানাই। অট্টালিকা ত ছিল না—অট্টালিকা কোথা পাবে? আপনাকে ত বল্লুম একটি পর্ণকুটীরে—

রঘু। ছি ছি ছি, আপনি কবি হ'য়ে এমন কথা বল্‌চেন? অট্টালিকা সে ত আপনার হাত—বিশেষ তাতে যখন খরচ পত্র কিছুই নেই, তখন আপনি কুণ্ঠিত হচ্চেন কেন?

কানাই। কুণ্ঠিত কি জানেন, বই খান লিখে শেষ করেছি, মিছামিছি মাঝখানটা তুলে নিয়ে এসে গোড়ায় লাগিয়ে দিয়ে—সে আবার এখন একটা কি হবে?

জগু। ঐ! ঐ-টি বোঝেননি ব'লেই ত এত গোল। সামান্য গল্প আরম্ভ করার চেয়ে উপন্যাস আরম্ভ করার যে একটু কৌশল, একটু কারদানি আছে, সে টুকু সকলে জানে না।

কানাই। বল্লেও কি বুঝ্‌তে পারব না?

জগু। আমি বুঝিয়ে দিচ্চি! আপনি আইভ্যানহো—আচ্ছা তার দরকার নেই, আপনাকে একটা ছোট বই থেকেই বুঝিয়ে দিচ্চি, গল্প কি রকম জানেন? যেমন—

"যাদব নামে একটি বালক ছিল। তার বয়ক্রম নয় বৎসর। সে পথে পথে খেলিয়া বেড়াইত। স্কুল হইতে সমপাঠীদের কাগজ কলম চুরি করিয়া আনিত। শিক্ষক মহাশয় এই দোষে তাহার নাম কাটিয়া তাড়াইয়া দিলেন।" —বুঝ্‌তে পাল্লেন?

কানাই। তা বুঝ্‌লেম। এখন একে নিয়ে উপন্যাস আরম্ভ ক'রতে হবে কি রকম কারদানি ক'রে বলুন।

জগু। উপন্যাসের বেলা পৈত্রিক নিয়মানুযায়ী 'যাদব নামে' ব'লে গোড়া থেকে আরম্ভ কর্‌লে চলবে না।

কানাই। তবে কি কর্‌তে হবে?

জগু। তখন আপনাকে ঐ 'চুরি করা' থেকে ধর্‌তে হবে। তার পর তাকে নিয়ে পথে পথে খেলিয়ে বেড়াতে হবে; তার পর তার বয়ক্রম নয় বৎসর হবে; তার পরে, সে যাদব হবে। শেষে যখন দেখ্‌বেন সে যাদব হ'ল, তখন উপসংহারে যেমন আছে—নাম কেটে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিলেই উত্তম উপন্যাস হবে।

রঘু। এই ত জানি! (একটু চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে) কিন্তু, জগু বাবু! যাদব চুরি করার দরুন দণ্ডটা পাবে কি? তা হ'লে উপন্যাসে ধর্ম্মভাবটা এসে পড়ে না?

জগু। হাঁ হাঁ, ভাল মনে ক'রে দিয়েছেন। বটে বটে, নাম কেটে তাড়ালে চলবে না!

কানাই। তবে কি তাকে কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌তে হবে?

জগু। আঁ-আঁ, কোলে ক'রে নিয়ে নাচ্‌বেন?—না, তা কেন? কি বল হে, রঘু বাবু!

রঘু। ভাল, তার জন্য আট্‌কাচ্চে না, ও কিছু কঠিন কথা নয়, ওটা আপনাকে এখনি ব'লে দিচ্চি।

কানাই। কি বলুন ?

রঘু। আচ্ছা, তার জন্ত ব্যস্ত কি ? ততক্ষণ আর একটা জায়গাই পড়ুন না শুনি।

কানাই। (কিঞ্চিৎ বিরক্তি সহকারে একটা জায়গা খুলিয়া) শুনুন—"নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ. কেবল কুটীরের সম্মুখে তেঁতুল গাছের তলায় একটা পলায়িত গাভী রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে হম্বা রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে"—

জগু। ঐ দেখুন, হল না !

রঘু। ঐ দেখুন, আপনি কি কর্‌তে গিয়ে কি ক'রে ফেল্লেন !

কানাই। কেন মহাশয় ! এতে কি দোষ হ'ল আবার ?

জগু। আগেই ত ব'লেছি আপনি সব জিনিস ধ'রে টান দেন, কিন্তু সাজাতে পারেন না।

কানাই। কি কর্‌লে তবে সাজ্‌তো বলুন ?

জগু। সাজ্‌তো ?—বলি, গাভীটে ওখানে কেন ? ঐ নিজয়গ্রামে কোকিল কি ছিল না ?

কানাই। তা কেন থাক্‌বে না ?

জগু। তবে কি ম'রেছিল ?

রঘু। এমন জ্যোৎস্নালোকে যদি তাকে পাওয়া না গেল, ত সে থাকায় ফল কি ? তেমন কোকিলের বাপ নির্ব্বংশ হোক্ না ?

কানাই। সে যা হোক্, এই—না আর কিছু ভুল আছে ?

জগু। ভুল ভুল কি ? ঐ ত এক বিষম ভুল—গাভী ওখানে থাক্‌তেই পারে না।

রঘু। ওর বাবার সাধ্য কি 'কুহু কুহু' রব করে ?

কানাই। তা এখন কর্‌তে বলেন কি ?

জগু। এখনি ও গাভীটে কেটে দিয়ে ওখানে 'কোকিল' ক'রে দিন।

রঘু। 'হম্বা' টা কেটে 'কুহু কুহু' ক'রে দিন।

কানাই। ভাল, তা হল, আর কিছু কর্ত্তে হবে ?

রঘু। ও গাছটা বদ্‌লাতে হবে।

কানাই। বদ্‌লে কি কর্‌ব ?

রঘু। 'তমাল' ক'রে দিন।

কানাই। তাও হ'ল।

জগু। এ বার একবার পড়ুন দেখি ?

কানাই। "নিদাঘ-রজনীর নিশীথ জ্যোৎস্নালোকে পৃথিবী হাসিতেছে; মলয়ানিল ধীরে ধীরে বহিতেছে; চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কেবল কুটীরের সম্মুখে তমাল গাছের তলায় একটা পলায়িত কোকিল রোমন্থন করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুহু কুহু রব করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।"

জগু। হাঁ, অনেকটা হ'য়ে এসেছে।

রঘু। অনেকটা; কিন্তু কোকিল কি যামিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ?

জগু। হাঁ হাঁ, ঐ টা 'নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে না' ক'রে দিতে হবে।

কানাই। আজ্ঞে, আজ তবে এই অবধিই ভাল, আবশ্যক হয় ত আর এক দিন তখন এসে ভাল ক'রে সব জেনে যাব।

রঘু। না না, তা হয় কি—কোথা যাবেন—বসুন বসুন! ঐ যে কবিতার মতন ও একটা কি দেখা যাচ্চে ?

জগু। হাঁ হাঁ, বসুন বসুন—আজ আমরা দুজনেই আছি—ঐ যে ও একটা কি দেখা যাচ্চে ?

কানাই। ও একটা ঐ উপন্যাসেরই কবিতার মত কয়েক ছত্র।

রঘু। ভাল ওটা পড়ুন দেখি ?

কানাই। আচ্ছা—তবে না হয় শুনুন :—

উৎসবের হাসি গিয়াছে ফুরায়ে,
হাহা রব শুধু নিশিদিন,
শ্যাম বিনে আজ আঁধার সকল,
গোকুল যেন প্রাণহীন।

রঘু। থাক্ থাক্, ও আর ব'ল্‌তে হবে না, বোঝা গেছে—বোঝা গেছে!

কানাই। কেন কি হ'ল ম'শায়! শেষ হতেই দিন—এর মধ্যেই কি বুঝ্‌লেন ?

জগু। কবিতার ও রকম নিয়ম নয়, (রঘু বাবুর দিকে ফিরিয়া) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। ও ত কবিতাই হল না—'সজনি' নেই, 'জোছনা' নেই, 'বাণী' নেই, 'স্বপন' নেই, 'কি-যেন-কি' নেই—আর ওর সব্‌ই ত বুঝ্‌তে পাল্লেম।

কানাই। বুঝ্‌তে পাল্লেন—তাতে দোষ হ'ল কি? সে টা ত বোধ হয় ভালই হ'ল।

রঘু। আজ্ঞে, না মহাশয়! প্রকৃত কবিতা—হৃদয়ের কবিতা যে কি তা আপনারা মোটেই বোঝেন না, তাই এমন কথা বল্‌চেন।

কানাই। তবে কি আপনি বল্‌তে চান, যা বুঝ্‌তে না পারা যায় সে গুলোই ভাল কবিতা?

জগু। অনেকটা তাই বটে, (রঘু বাবুর প্রতি) কি বল রঘু বাবু?

রঘু। নিশ্চয়ই তাই। আপনি বোধ হয় ইংরেজি কবিতা বেশি পড়েন না? ইংরেজিতে এমন ঢের ভাল কবিতা আছে, আমরা ত এখনও তা বুঝ্‌তে পারিই নাই, তা ছাড়া মাষ্টার মশাই ব'লেছিলেন যে, ইংরেজদের ত জাতিভাষা—তারাও বুঝ্‌তে পারে না।

কানাই। ভাল যদি তাই-ই হয়, তা হ'লেই কি এমন প্রমাণ হ'চ্চে যে সরল হলে, বোঝা গেলে, সেটা কবিতা হবে না?

রঘু। হাঁ তা-ই বটে, তবে ঠিক তা-ই নয়। ইংরেজি ভাষায় এমন অনেক সরল কবিতা আছে যে পড়্‌লে বা শুন্‌লে স্তম্ভিত হ'য়ে যেতে হয়। আমার এমন সহস্র সহস্র কবিতা মুখস্থ আছে।

কানাই। একটা শুনতে পাই নে?

রঘু। তা এখনি বল্‌তে পারি, আজ পারি, কাল পারি, আপনার যে দিন—যখন ইচ্ছা শুনতে পারেন।

কানাই। তা একটা এখনি বলুন না?

রঘু। তা কেন বল্‌তে পার্‌বো না? এখনি পারি, আজ পারি, কাল পারি—আপনি কি মিথ্যা কথা মনে কচ্চেন?

কানাই। এ আপনি কেমন বল্‌চেন? মিথ্যা মনে করবো কেন—আমি একটা শুন্‌বো ব'লেই ত আপনাকে ব'ল্‌তে বল্‌চি?

রঘু। আচ্ছা, বলচি। আপনি ড্যান্‌টির এ-টা পড়েচেন?

কানাই। কি টা?

রঘু। আচ্ছা, তায় আর কাজ নাই, আপনাকে সামান্য বই থেকেই একটা শোনাচ্চি, কবিতাটা কেমন চমৎকার দেখুন দেখি! কবিতা আছে—

Thirty days have September,
April, June and November;
February hath twenty-eight alone,
And all the rest have thirty-one.

কানাই। (একটু হাসিয়া) এটা কি বড়ই সুন্দর কবিতা?

রঘু। আপনি বুঝতে পাচ্চেন না?

জগু। (কানাইএর প্রতি) বলেন কি মশাই, একি কম কবিতা! আপনি এতে কবিত্ব দেখ্‌তে পাচ্চেন না? এর যে অক্ষরে অক্ষরে কবিত্ব, বিশেষতঃ ৩য় পংক্তিটা পড়ুন দেখি—"Februry hath twenty-eight alone"—উঃ, কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস! এই অসার সংসারে—এই ক্ষণভঙ্গুর মানব জীবনে ফেব্রুয়ারির কি অল্প পরমায়ু! আমি যখনি ফেব্রুয়ারির কথা মনে করি, তখনি অবসন্ন হ'য়ে পড়ি! উঃ, আপনি এখন ভেবে দেখুন দেখি, এতে কি কম কবিত্ব—কম উচ্ছ্বাস—কম আধ্যাত্মিক ভাব! এ লিখ্‌তে কি কম ফিলজফির দরকার?

কানাই। তা ভাল, এবার থেকে না হয় ঐ রকম লিখ্‌তে চেষ্টা করবো। আজ এখন তবে আমি চল্লেম মহাশয়!

(কানাইয়ের প্রস্থান)

রঘু। আমিও এখন তবে আসি।

(রঘুর প্রস্থান)

জগু। (পকেট হইতে খাতা টুকু বাহির করিয়া দুলিতে দুলিতে) মেকলে, জনষ্টুয়ার্ট্ মিল, হার্ব্বার্ট স্পেন্সর (ইত্যাদি মুখস্থ করণ)

———

রুক্মাবাই।

এ পোড়া হিন্দুস্থানে হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইয়াছে। হিন্দুর আর হিন্দু-হৃদয় নাই, হিন্দুর আর হিন্দুমস্তিষ্ক নাই। হিন্দু না ইংরাজ, না মুসলমান, না পার্শী। হিন্দু যে এখন কি, তাহা নির্ণয় করিতে বুঝি একা জগদীশ্বরই সক্ষম। বুঝি ইংরাজ, মুসলমান বা পার্শী হইলে হিন্দুর গতিমুক্তি স্থিরীকৃত হইবার অনেকটা সম্ভাবনা ছিল।

হিন্দু যদি এখন হিন্দুপ্রকৃতিস্থ হইত, তবে এই তুচ্ছ রুক্মাবাই আন্দোলনে কথা কওয়া নিতান্ত অনিবার্য্য হইলে, আগেই সহজ কথাটা কহিয়া নীরব হইত ও তৎসঙ্গে প্রতিকূলবাদীকেও নীরব করিত। কিন্তু, প্রকৃতিস্থ হওয়া দূরে থাক, হিন্দু এখন নিজ অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনুভব করিতে অক্ষম। হিন্দু এখন কি খায় তা জানে না, কি চায় তা জানে না; কি পরে তা জানে না, কি পড়ে তা জানে না; কি সাজে তা জানে না, কি ভজে তাহাও জানে না। হিন্দু এখন আপনাকে আপনি জানে না।

কিন্তু হিন্দু যে এখন মানুষের মত তাহা বটে। হিন্দু মানুষের মত খায়দায়, শোয়, কথা কয়, ইত্যাদি করে। আর একটী কথাও আধুনিক হিন্দু সম্বন্ধে সত্য। হিন্দু এখন উন্নতিশীল, হিন্দু "জাতীয় দাঁড়ীপাল্লায়" উঠিয়াছেন বা উঠিতেছেন। আর আমার বন্ধু মহাশয় কর্ণমূলে বলিতেছেন হিন্দুর একটী মাত্র অভাব বর্ত্তমান। অভাবটী গুহ্য—কিন্তু দীর্ঘ।

রুক্মাবাইয়ের মোকদ্দমার সহিত হিন্দু স্ত্রীশিক্ষার যে কি সম্বন্ধ তাহা স্থির না হইলেও, রুক্মাবাই আন্দোলনে হিন্দু স্ত্রীশিক্ষা লইয়া একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা এই সুযোগে "তর্কের পুঁজি" বৃদ্ধি করিতেছেন, হৃদয় চিরিয়া অশিক্ষিতা হিন্দু স্ত্রীর জন্য নিজ নিজ সহানুভূতির গভীরতা দেখাইতেছেন, নিজ জাতিকে গালি পাড়িয়া "কিংকর্ত্তব্য" বিষয়ে "পরামর্শ" ঝাড়িতেছেন, সভা করিয়া "প্রতিজ্ঞা"-পুঞ্জ জারি করিয়া, দুই আনা, পাঁচসিকা সহি করিতেছেন, সাহেবদের গদ্গদ প্রাণে নিজ নিজ গদ্গদ প্রাণ মিশাইয়া, সেই গদ্গদ গলিত প্রাণ খানায় মাখিয়া, স্যাম্পেনে সিক্ত করিয়া, দুর্ভাগ্য দাদাজির পিণ্ড

গিলিতেছেন। আর যাহা যাহা করিতেছেন, তাহা সংবাদ পত্রে দেদীপ্যমান!

আর রুক্মাবাইবিরোধীরা যে কি করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তবে একটা কথা বুঝিতে পারা যায়। তাঁহারা দুর্ভাগ্য দাদাজীর পক্ষ, হতভাগিনী রুক্মার প্রতিপক্ষ ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধে রাজসর্দারি পক্ষে খড়্গহস্ত। রুক্মাকে আমি "হতভাগিনী" বলিয়াছি, রুক্মা হতভাগিনীই বটে। হতভাগিনী না হইলে রুক্মা হতভাগাদিগের দলে পড়িত না, হতভাগাদিগের হাতে পড়িয়া বিপর্য্যস্তা হইত না। আর দাদাজী "দুর্ভাগ্য" কারণ তাহা না হইলে এমন হতভাগিনীর হাতে পড়িবে কেন? দাদার কিছু জোর কপাল, তাহা না হইলে হিন্দু হইয়া হিন্দু ধর্ম্মপত্নির পতিত্ব সংস্থাপনের জন্য তাহাকে কাজির আশ্রয় লইতে হইবে কেন?

কিন্তু রুক্মা হতভাগিনী হইলেও, রুক্মার বিবেচনায় রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী। তাহার কারণ, সাহেবেরা তাহাকে দেশে বিলাতে হতভাগিনী বলিয়া জানিয়াছে, হতভাগিনী বলিয়া তাহার জন্য লড়াই করিতেছে, তাহার জন্য "প্রাণের" সহানুভূতি করিতেছে, চাঁদা তুলিতেছে। এমন কি তাহার চাঁদমুখে মুগ্ধ হইয়া চাঁদমুখেরা—দাদার গোলমাল চুকিলে—তাহার বর হইতেও প্রস্তুত। নীচজাতীয়া হিন্দুর মেয়ে চাঁদ হাত বাড়াইয়া পাইয়াছে। দাদাকে দাদা বলার প্রায়শ্চিত্য যদি উর্দ্ধগতি হয়, তবে রুক্মা দাদাকে আর কিছু বলিতেও প্রস্তুত। রুক্মা সৌভাগ্যশালিনী। তবে রুক্মার সৌভাগ্যশশীর সম্প্রতি এক কলা লোপ পাইয়াছে। সে লোপ দাদা-কৃত। হতভাগাদের সাহায্যে রুক্মা ইংরাজিতে ইংরাজি সংবাদপত্রে লম্বালম্বা পত্র ঝাড়িয়া নিজ বিদ্যা জাহির করিয়াছিল। দাদা রুক্মার বিদ্যা বাহির করিয়া দিয়াছে।

রুক্মা দাদার বিবাহ খারিজ করিয়া বিলাতী বা দেশী সাহেব বিবাহ করিতে চায়। এই হাড়ি ডোমের অপেক্ষা নীচ ব্যাপারে হিন্দুর কথা কহিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু দেশী বিলাতী সাহেবেরা এই সুযোগে হিন্দু বিবাহ, হিন্দু আচারব্যবহার, রীতিনীতি লইয়া একটা কিচি-মিচি লাগাইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মবিবাহ পদ্ধতিতে তাঁহাদের অনাচার

সৌখীন বিবাহের পদ্ধতি চালাইতে চাহেন। স্পর্দ্ধা বড় কম নহে। হিন্দু খেপিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরাজি শিক্ষায় হিন্দুর হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিগড়িয়া না যাইলে, হিন্দু এই স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে অল্প ধীর ভাষায় বাহবা লইতে পারিত। কিন্তু একে "সুশিক্ষার" মাহাত্ম্য, তাহাতে আবার চটিয়া উঠিয়াছে। ধীর শান্ত ভাবে মর্ম্মভেদী, মস্তিষ্কভেদী সাদা কথা কহিবার হিন্দুর কোন উপায় নাই। তাই আবল তাবল যাহা যোগাইতেছে, তাহাই বলিতেছে; হাবড়হাটি যাহা কলমাগ্রে আসিতেছে তাহাই লিখিতেছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর রোষ উদ্রেক করা তর্কে জিতিবার এক প্রধান উপায়। সাহেববাদীরা তাই সুবিধা পাইয়া বেশ এক হাত লইতেছে। স্ত্রীশিক্ষার কথায় হিন্দু হারি মানিয়া 'আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিতেছে—" সময়ে আমাদিগের ললনাবৃন্দ শিক্ষিতা হইবে। হিন্দুনারীর শিক্ষা হইবার সময় চাই। জোর করিলে চলিবে না, ইত্যাদি" মাথামুণ্ড।

দাদা রুক্মাকে পান বা না পান, বা রুক্মা দাদাকে লইয়া সুখী হউন বা না হউন, সে বিষয়ে আমরা এক প্রকার উদাসীন। তবে হিন্দু স্ত্রীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে ব্যথা লাগে। সাহেবেরা বলিলে লাগে না, বরং হাস্যের উদ্রেক হয়, ক্ষণকালের জন্য অনেকটা বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগের সুযোগ হয়। ব্রাহ্ম বা দেশী সাহেবেরা বলিলেও সে আঘাত লাগে না। হিন্দু, হিন্দু নারীকে অশিক্ষিতা বলিলে মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে। হিন্দু যাহার কাছে নিত্য নিত্য উচ্চ শিক্ষা পান; যাহার সহবাস-মার্জ্জনে হিন্দু মার্জ্জিত রুচির বড়াই করিয়া থাকেন; যাহার অধ্যাপনে হিন্দু পশুবৃত্তি দমন করিতে শিখেন; যাহার স্বর্গীয় উপদেশে হিন্দু নিত্য দয়া, ধর্ম্ম পালন করেন; যে দেবীকে গৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া, যে দেবীকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া হিন্দু দেবভাবে পূর্ণ, তাহাকে অশিক্ষিতা বলা কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? এ কৃতঘ্নতা বুঝি সেক্ষপীয়র কথিত পাষাণ-হৃদয় দানবেও সম্ভবে না!

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের ধর্ম্মক্ষেত্র। এই পুণ্যভূমিতে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে ধর্ম্মদীপ জ্বলিতেছে। এই

দীপের উজ্জ্বল আলোকে প্রাচীন জগৎ আলোকিত ছিল, যেমন আজি এই নব্য জগৎ আলোকিত হইয়াছে। আজিকার এই নব্য জগতে এমন কোন সভ্যতাভিমানী জাতি বা স্থান নাই, যাহার ধর্ম্মদীপ ভারতীয় ধর্ম্মপ্রদীপ হইতে জ্বালিত নয়। এ কথা মুখের কথা নহে। ইউরোপীয় সভ্যতাভিমানী পণ্ডিতেরা ইহার প্রধান প্রধান সাক্ষী। ভারতবর্ষ যে ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এ কথা লইয়া এখন আর পাদ্‌রী সাহেবরাও বিবাদ করেন না। ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থানে যে ধর্ম্মই সকল বিষয় অপেক্ষা প্রবল থাকিবে, ইহা অতি সহজ কথা। শুদ্ধ প্রবল নহে, এই ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মই সার। এই ধর্ম্মক্ষেত্রে সকলই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, সকলই ধর্ম্মোদ্ভূত। রাজনীতি বল, সমাজনীতি বল, এই পুণ্যস্থানে ধর্ম্মই সকল নীতির, সকল অনুষ্ঠানের ভিত্তি ও মেরুদণ্ড। হিন্দুর বিবাহ ধর্ম্মার্থে। হিন্দুর পত্নী ধর্ম্মপত্নী বা সহধর্ম্মিনী। হিন্দুর সহধর্ম্মিনী হিন্দুর ধর্ম্মচিন্তার সহায়, ধর্ম্মোপার্জ্জনের সহায়, ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহায়। তাই হিন্দুপত্নীর শিক্ষার জন্য শৈশবকাল হইতেই হিন্দুমাতা ব্যস্ত। যখন ইংরাজমাতা বালিকা কন্যাকে এ, বি, সি, চিনিতে শিখান, হিন্দুমাতা তখন সেঁজুতির ব্রত ধারণ করাইয়া, ছয় সাত বৎসরের বালিকা-হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করেন। কোমল নারী-হৃদয়ের ন্যায় ধর্ম্মবীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র আর নাই। ক্ষুদ্র বালিকাবস্থায়, হৃদয়ে এই বীজ উপ্ত হইলে, এই বীজ অঙ্কুরিত হইলে, যৌবনাবস্থায় তাহা কিরূপ সুফলসুশোভিত পাদপে পরিণত হয়, তাহা হিন্দুর ভাগ্যক্রমে হিন্দুই অবগত। হিন্দু সে পাদপছায়ায় নিত্য শীতল হন, সেই পাদপের সুমিষ্ট ফলভক্ষণে নিত্য উদর পূরণ করেন, সেই পাদপস্থিত বিহঙ্গমের তানে বিভোর হইয়া নিত্য শ্রবণমন তৃপ্ত করেন, সেই স্নিগ্ধ মারুতহিল্লোলিত পাদপতলে শয়ন করিয়া নিত্য ইন্দ্রত্বস্বপ্নবিমিশ্রিত সুখনিদ্রায় অভিভূত হন, সেই শান্তিপবিত্রতাময় পাদপতলে সমাসীন হইলে, হিন্দুর চিন্তা সেই পরম ব্রহ্মের প্রতি ধাবিত হয়। হিন্দু ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

নারী যে শিক্ষার উপযুক্ত, নারীর যে শিক্ষার প্রয়োজন, নারীর যে শিক্ষা হইলে নারীর নিজ মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল সাধিত হয়,

হিন্দু নারীকে সেই শিক্ষা প্রদান করেন। কোমলাঙ্গী নারীর হৃদয় ও মন বড় কোমল, হৃদয় ও মনের বৃত্তি ও ভাবগুলি বড় কোমল। হিন্দু, নারীকে এমন শিক্ষা দেন যাহাতে সেই কোমল হৃদয়, কোমল মন, কোমল ভাব, কোমল বৃত্তিগুলি আরও কোমল হয়—যাহাতে হৃদয় বিশ্বব্যাপী হয়, মন প্রশান্ত হয়, ভাব প্রস্ফুটিত হয়, বৃত্তি নির্ম্মল হয়। ধর্ম্মশিক্ষায় তাহা করে—আর কোন ধর্ম্মে না করিতে পারে, হিন্দুধর্ম্মে তাহা করে। সেঁজুতির ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া, কুমারী অবস্থায় বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে, সপ্তাহে সপ্তাহে, হিন্দুনারী কত ব্রত ধারণ ও উদ্‌যাপন করে, তাহা হিন্দুতেই জানে। এই ব্রতানুষ্ঠানের জ্ঞানগর্ভ নীতি, পবিত্র উপদেশ ও স্বর্গীয় শিক্ষা মানবীকে দেবী করিয়া তুলে।

এই ত গেল হিন্দুনারীর ধর্ম্মনীতিশিক্ষা। এই ধর্ম্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর যাহা যাহা শিক্ষা হয়, তাহা হিন্দুনারী ভিন্ন, জগতে আর কোন দেশে, নারীর সে শিক্ষা হয় কি না, তাহা কোন ইতিহাসে লিখে না। অতি বালিকাবস্থায় হিন্দুনারী যে পতিসেবা শিক্ষা পায় তাহা জগতে অতুলনীয়। পতিই হিন্দুনারীর ইহকালের আশ্রয় ও পূজ্য পদার্থ, পরকালের আশা ও গতিমুক্তি। শৈশবে এই পতিপূজার উদ্বোধন আরম্ভ হয়। শৈশবেই ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুমাতা হিন্দুকন্যার কোমল উর্ব্বর হৃদয়ক্ষেত্রে এই পতিভক্তির বীজ বপন করেন। ধর্ম্মশিক্ষাব সহিত এই শিক্ষা বিজড়িত, বিমিশ্রিত, একীভূত। পতিই হিন্দুনারীর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। হিন্দু-পত্নীর চিন্তা, কামনা, উদ্দেশ্য পতিপদেই সীমাবদ্ধ। পতিপদই হিন্দুপত্নীর ব্রহ্মপদ। এই নীতি কেবল পুঁথিতেই প্রকটিত নয়, বচনে বিবৃত নয়, উপদেশে নিহিত নয়। এই স্বর্গীয় নীতি হিন্দুপত্নীর হৃদয়ে—আজিকার এই পোড়া হিন্দুস্থানেও—হিন্দুপত্নীর অন্তরের অন্তরে, সেই পবিত্র স্থানে, সেই স্বর্গভূমে এই স্বর্গীয় নীতি দৃঢ়বদ্ধ। এই পতিভক্তির শক্তি সহায়ে হিন্দুনারী জড়জগতে ও অন্তর্জগতে সর্ব্ববিজয়িনী হয়েন। হিন্দুপত্নীর এই পতিভক্তিশিক্ষার বিরুদ্ধে ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্ম ও ভ্রষ্ট সমাজের অনেক মাথামুণ্ড তর্ক আছে, তাহা পরিশিষ্টে বিচার করা যাইবে। এক্ষণে দেখা যাউক, হিন্দুনারীর এতদ্ভিন্ন আর কি শিক্ষা হয়। পতিগৃহে যাইলে হিন্দুনারীর

পরীক্ষা আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে এক পরীক্ষা গৃহকর্ম্ম। গৃহকর্ম্ম না জানিলে পতিগৃহে পৌরস্ত্রীগণ কন্যার নিন্দা করিবে, হিন্দুমাতা সে নিন্দার পথ পূর্ব্ব হইতে বন্ধ করেন, কন্যাকে বালিকাবস্থা হইতে সাধ্যমত গৃহকর্ম্ম শিখান। পতিগৃহে গমনকালে হিন্দুপত্নী গৃহমার্জ্জনা হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত অগণিত কার্য্যে সুদীক্ষিতা। পতিভাগ্যের সহিত যাহার ভাগ্য একীভূত, তাহাকে সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়। দাসদাসী না থাকিলে হিন্দুর গৃহকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। গৃহকর্ম্ম পড়িয়া থাকিলে পতিসেবার ত্রুটি হইবে, হিন্দুপত্নীর সে ত্রুটি অসহ্য। গৃহমার্জ্জনা, তৈজসমার্জ্জনা, রন্ধনক্রিয়া, শয্যারচনা এইরূপ প্রধান প্রধান গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য শত শত কার্য্যেও হিন্দুপত্নীর ন্যায় ক্ষিপ্রকারিতা দাসদাসীতে সম্ভবে না।

এখন জিজ্ঞাস্য, হিন্দুনারীর কোন্ শিক্ষার অভাব, যে আজি এই "মহাশিক্ষিত" বিলাতী সভ্যতালোকিত মহোদয়েরা হিন্দুনারীকে অশিক্ষিতা বলিয়া থাকেন? "ইউরোপীয় শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নারী" এই কথাটা আজি কালি ঘন ঘন শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু নারী কি শিক্ষিতা ও মার্জ্জিতা নয়? Educated এবং accomplished নয়? এই ইংরাজী কথা দুইটার যদি বাঙ্গালা অর্থ থাকে, এই শব্দ দুইটা যদি কোন দুর্ব্বোধ্য দেব বা দানব ভাষান্তর্গত না হয়, তবে হিন্দুনারীর ন্যায় শিক্ষিতা, মার্জ্জিতা, Educated, accomplished নারী জগতের আর কোন দেশে নাই। আর কোন দেশের শিক্ষামার্জ্জনাগৌরবান্বিত নারীবৃন্দ হিন্দুনারীর পাদপদ্মের সেবাদাসী হইবারও উপযুক্ত নয়। যদি গুণ লইয়াই কথা হয়, তবে গুণে হিন্দুনারী সাক্ষাৎ দেবী, ও তাহার তুলনায় অন্য দেশীয়া শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা নারীকে মানবী, দানবী বা রাক্ষসী বলিতে হইবে।

শান্তিসংস্থাপনই সমাজগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাউক, সমাজে সেই শান্তিসংস্থাপনের জন্য নারীর উপর কি কি কার্য্যভার ন্যস্ত। পুরুষ সংসার নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া পুরুষ গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিশ্রাম করিবেন। নারী সেই বিশ্রামবাসের কার্য্যকর্ত্রী। পরিশ্রমের পর গৃহে আসিয়া যাহাতে পুরুষ বিশ্রাম উপভোগ করিতে পারেন, বিষয়ব্যাপারবিক্ষুব্ধ মন যাহাতে শান্তিস্নিগ্ধ হয়, গৃহকর্ত্রীর তাহাই সর্ব্বপ্রধান

কার্য্য। ইহা না হইলে, পুরুষ পরিশ্রমে উৎসাহিত হইবে না, পরিশ্রম না করিলে অর্থোপার্জ্জন হইবে না, অর্থোপার্জ্জন না হইলে সংসার চলিবে না, সংসার না চলিলে দীনদরিদ্রপরিপূর্ণ সমাজে শান্তি থাকিবে না। হিন্দুপত্নী পতির জন্য বিশ্রামের সেই সকল উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখেন, সেই শান্তির সুধাময় সরবৎ শ্রান্ত পতির মুখে তুলিয়া দেন। তখন শ্রম অপনোদিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিত হয়, হৃদয় শান্ত হয়, মন তৃপ্ত হয়, চিন্তা ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এই ধর্ম্মপথেও তাঁহার সহধর্ম্মিণী সঙ্গিনী। তখন পুরুষ নারীকে যত জ্ঞান দিতে লাগিলেন, নারী ভক্তিপ্রদানে তাহা পরিশোধ করিতে লাগিলেন। পুরুষ যত বহির্জ্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন, নারী তত অন্তর্জ্জগতের কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে পুরুষ হারি মানিলেন, বলিতে বলিতে পুরুষের মনোবৃত্তিগুলি, পুরুষের হৃদয় ভাবগুলি কোমল হইল, রূঢ় প্রকৃতি মার্জ্জিত হইল। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইয়া, ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া, ভক্তিচক্ষে সম্মুখস্থ মানবীকে দেবী দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন নারী

> "কি গ্রন্থ নরের জ্ঞান হেতু!
> স্বর্গমর্ত্ত্য ব্যবধানে কি শোভন সেতু!"

হরি! হরি! পুরুষ ধ্যানে নিমগ্ন!—

> "সবিলাস বিগ্রহ মানস-সুষমার!
> আনন্দের প্রতিমা আত্মার!
> সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার!
> মুগ্ধময়ী মুরতি মায়ার!
> যত কাম্য হৃদয়ের
> সংগ্রহ সে সকলের—
> কি বুঝাব ভাব রমণীর?
> মণিমন্ত্রমহৌষধি সংসার ফণীর!

তখন পুরুষ মহোল্লাসে দেবীকে হৃদয়ে টানিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য মর্ত্ত্য স্বর্গ হইল!

আর নারীর? এ ধর্ম্মজীবনে, এই পতিসেবায় নারীর কি কোন সুখ নাই? আছে—নারীর যাহা সুখ তাহা পুরুষের নাই। পতিপদই নারীর

ব্রহ্মপদ। নারীর গতিমুক্তি সেই ব্রহ্মপদে, চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে—সেই পতিপদে। নারীর ধর্ম্মচিন্তা সীমাবদ্ধ, পুরুষের মহাসাগরের ন্যায় অসীম। হিন্দু পুরুষের ধর্ম্ম চিন্তার কূল নাই। নারীকে কূলে উঠাইয়া, হিন্দু পুরুষ অকূলে ভাসেন। তার পর, ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? প্রাণ ভরিয়া, প্রাণ পাতিয়া, আশ মিটাইয়া ভালবাসিয়া কি সুখ নাই? যে মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবাসিয়াছে, সেই জানিবে ভালবাসিয়া হিন্দুনারী কি অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রীতি সম্ভোগ করে। আহা! এই ধর্ম্মশিক্ষা, এই প্রেমশিক্ষা হিন্দু নারীকে কে শিখাইল?

এখন হিন্দুনারীর বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে পারিলে এই প্রবন্ধ লিখার যন্ত্রণা এড়াইতে পারি। হিন্দুসমাজ যে ধারায় গঠিত, হিন্দুসংসার যে নিয়মে সংরক্ষিত, তাহাতে হিন্দুনারীর যৌবনবিবাহ হইতে পারে না। হিন্দুসংসার একান্নভুক্ত। এই একান্নভুক্ত হিন্দুসমাজ এক একটী ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট। ইহাতে গবর্ণর জেনারেল আছে, লেফ্‌টেনাণ্ট-গবর্ণর আছে, কমিশনরগণ আছে, জেলা-প্রতিনিধি আছে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সকল নিম্ন কর্ম্মচারী যেমন গবর্ণর-জেনারেলের অধীন, তেমনি হিন্দুসংসারের সকলেই কর্ত্তা মহাশয়ের অধীন। এই কর্ত্তার একটী গিন্নি আছেন। তিনি জেনানা বিভাগের 'কর্ত্তা'। তাঁহার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ তাঁহার আজ্ঞাধীন। রন্ধন হইতে দেবসেবা পর্য্যন্ত কার্য্যসম্বন্ধে তিনি অপ্রতিহত প্রতাপশালিনী। তিনি যাহা করেন, যাহা হুকুম করেন, তাহাই হয়। তিনি যাহা করেন তাহাতেই হিন্দুসংসারের মঙ্গল সংসাধিত হয়, হিন্দুসংসার সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হয়, হিন্দু খাইয়া বাঁচে, পরিয়া বাঁচে, শুইয়া বাঁচে। কর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিভাগের আয় সংগ্রহ ও একত্রিত করিয়া ব্যয় করেন। আয়ের বিভাগগুলি বড় অল্প, ব্যয়ের বিভাগগুলি গণিয়া পাওয়া যায় না। স্বজনমণ্ডলী পুরুষস্ত্রী যে যেখানে আছেন, সকলেরই আহারবসনভূষণের ভার তাঁহার হস্তে। ইহার মধ্যে মাসতুত ভাইয়ের পিসতুত ভগ্নী আছেন, এবং মামাত ভগ্নীর পিসতুত নাতিও বিদ্যমান। ইহাদের খাইবার সংস্থান নাই, না খাইতে দিলে মরিবে। হিন্দুসমাজে লাইফ ইন্সুয়রান্স ফণ্ড নাই। সঙ্গতিপন্ন স্বজনই হিন্দুর ইন্সুয়রান্স ফণ্ড। হিন্দুর পুত্রবধূ সেই মাসতুতভায়ের পিসতুত ভগ্নী ও মামাত ভগ্নীর পিসতুত নাতি সম্বলিত সংসারে

আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। বাস করিতে করিতে, স্বামিসেবা শিখিতে শিখিতে, শ্বশুরসেবা, শাশুড়ীসেবা শিখিতে শিখিতে সমগ্র পরিবারের সেবা শিখিয়া ফেলেন। শ্বশুর শাশুড়ীর অন্তর্ধ্যান হইলে, পুত্রবধূর ঘোমটা খসিলে, স্বামীর উপর একাধিপত্য স্থাপিত হইলেও পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার স্নেহ সমান বর্ত্তমান! "কর্ত্তা গিয়াছেন, গিন্নি গিয়াছেন, বধূমাতা আছেন—বধূমাতা বাঁচিয়া থাকুন!" বধূমাতা এ আশীর্ব্বাদের যথাযোগ্য পাত্রী। তিনি অন্নপূর্ণা, তিনি অনাথের সহায়, বিপন্নের আশ্রয়, হিন্দুসংসার মধ্যে শান্তির একমাত্র কেন্দ্র! হিন্দুগৃহের গৃহলক্ষ্মী!

ইংরাজি-শিক্ষিতা, বিদ্যা-গর্ব্বিতা, কোর্টসিপ-লব্ধা ফুল্লযুবতী পুত্রবধূ হিন্দুসংসারে অকস্মাৎ প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করিবেন। হাতের বরণডালা হাতেই রাখিয়া শাশুড়ী একহস্ত লম্বিত ঘোমটা টানিয়া লজ্জা নিবারণ করিবেন। গৃহিণীর অঞ্চলধারণ ভিন্ন কর্ত্তা মহাশয়ের ভয় দূর হওয়া সুকঠিন। নববধূর বুট-তলে দুগ্ধালক্তক না শুখাইতে শুখাইতে পুরুষস্ত্রীগণ পলায়ন পথান্বেষণে ব্যতিবস্ত। এক নিশীথের "মশারি-বক্তৃতার" পর প্রাতে মহাপ্রলয়ক্রিয়া সমাপ্ত! নোয়ার আর্কের ভিতরে কেবল নবদম্পতী পরিদৃশ্যমান!

সাদা কথাটা এই, অগ্রে হিন্দুসমাজ, হিন্দুসংসার নূতন পদ্ধতিতে, ইংরাজী ধরণে গঠিত কর, তাহার পর হিন্দুস্ত্রীর যৌবন-বিবাহ দিয়া পঞ্চশত ডাইভোর্স কোর্টের কলঙ্ক-রহস্য বৃদ্ধি করিতে পার। আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা দিগের স্বামিগণ কিরূপ পত্নীসুখ সম্ভোগ করেন, তাহা আর আজকাল তাঁহাদিগকে খুলিয়া বলিতে হয় না। সম্প্রতি সম্প্রদায় বিশেষের জন্য একটী ডাইভোর্স কোর্টের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান আন্দোলনে দেশী-খৃষ্টান সম্প্রদায় বলিতেছেন তাঁহারা যুবতী পত্নী চাহেন না, বালিকা হিন্দুপত্নী চাহেন। ষ্টেট্‌স্ম্যান সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেব বলিতেছেন, "বিলাতী যুবতী-বিবাহে সুখ নাই, বুঝি বালিকা-বিবাহে আছে। তোমরা সুখে আছ, দাদা, আমাদের কোর্ট-সিপের মুখে ছাই!" কথা এই, যৌবনে যুবক কিম্বা যুবতীর মাথার ঠিক

থাকে না, রূপজ মোহ স্থিরবুদ্ধিকে নষ্ট করে। বাহ্য সৌন্দর্য্য, বাহ্য গুণই যুবক যুবতীর নয়ন মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। মাথায় রূপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে, বুদ্ধি, বিচার, দূরদর্শিতা সেই আগুণে দগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সময়ে সে আগুণ নিভে। তখন ডাইভোর্স কোর্টে সেই দগ্ধ বুদ্ধি, দগ্ধ বিচার, দগ্ধ দূরদর্শিতার সহিত দগ্ধ হৃদয়ের একত্রে শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাহিত হয়।

বলিবার আরও কথা আছে। তবে ছুতারের মেয়েকে লইয়া এত হাঙ্গামার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু ছুতারের মেয়ে যদি এখনও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতে আমি—হিন্দু ব্রাহ্মণ—প্রস্তুত।

যাও, রুক্মা, ঐ জাগ্রতা মহালক্ষ্মী-পদে পতিনিন্দা মহাপাপ ন্যস্ত করিয়া, ঐ সমুদ্র-সৈকতে পতিপদে ক্ষমা ভিক্ষা লইয়া, ঐ সাগরতলে গিয়া শয়ন কর! এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে তুমি পরজন্মে আবার হিন্দুনারী হইতে পার। তখন পতিপদ সেবা করিয়া পতিপদ ভেলায় অনায়াসে এই ভবসাগর পার হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গাঁথা মালা।

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!
সারা বন বুলে বুলে
বন-ফুল তুলে তুলে,
গাঁথিনু চিকণ মালা
দিব কারে উপহার?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

হৃদয়ে বাসনা ভ'রে
গাঁথিলাম যার তরে,
সে কোথা চলিয়ে গেছে
জানিনে ত কিছু তার;
কেন তবে গেঁথে মালা
মিছে বাড়াইনু জ্বালা,
হৃদয় ডুবায়ে দিনু
শোক-হ্রদে নিরাশার?

সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

আগে ত জানিনে মালা
গাঁথিলে কাঁদিতে হবে,
কাঁদিতে সাধনা ক'রে
কে মালা গাঁথিত তবে?
এত আশা ল'য়ে মনে
কে আসিত ফুল-বনে,
লতিকারে ব্যথা দিতে
কে হরিত ফুল তার?
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

গেয়ে এসেছিল অলি
চুমিতে কুসুম-কলি,
ফিরে তারা চ'লে গেল
ক'রে সবে হাহাকার!
তরু-তলে ফেলে গেল
বিরলে নয়নাসার!
আমি যেন তাই নিয়ে,
মালা গেঁথে তাই দিয়ে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি
আশা-পথ চেয়ে তার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইলসার!

অতি অবশেষ নিশি,
শেফালি পড়িছে খসি,
উষারে জাগাতে আসি
ডাকে বায়ু বারেবার;
অলসে আকাশ গায়
ম্লান চাঁদ ডুবে যায়,
তারা-মালা পড়ে খ'সে—
যামিনীর গাঁথা হার!
আমি শুধু সারা নিশি
প্রহর গণিনু বসি,
ফুল-দল পড়ে খসি,
ফুরায় সুরভি-ভার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

প্রাণের মাঝারে আজি
উথলে যমুনা-জল,
কি দিয়ে কেমনে সখি
রোধিব তাহারে বল্!
জীবন সে কোন্ পুরে
আলয় খুঁজিছে দূরে,
হৃদয় যে ভেঙেচুরে
হ'য়ে গেল একাকার;
সই রে জ্বলিনু মিছে
বাসনা হইল সার!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শাক্যসিংহের তপস্যা।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব নৈরঞ্জনানদীতীরে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত উৎকটতর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং অবিচ্ছেদে ৬ বৎসর তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াও তিনি নির্ব্বাণ বা স্বাভিমত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে বোধি-দ্রুম-তলে গমন পূর্ব্বক ধ্যানের অভিনব পথ উদ্ভাবন করতঃ কেবল ও বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ যেরূপ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন, সেরূপ উৎকট তপস্যা কেহ কখন করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বৌদ্ধেরা বলে, যাহারা ভবিষ্যতে বুদ্ধ হইবে এবং যাহারা আস্ফানক ধ্যান করিতে সমর্থ, তাহারাই কেবল তাদৃশ দুশ্চর তপস্যা করিতে পারে, অন্যে পারে না। (আস্ফানক ধ্যান কি তাহা পরে ব্যক্ত হইবে।)

বুদ্ধদেব শিষ্যগণের নিকট বলিয়াছিলেন—"শিষ্যগণ! আমি ইহলোকে অদ্ভুত অনুষ্ঠান দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রকারগণের দর্পবিঘাতের জন্য, পরপ্রবাদীদিগকে নিগ্রহ করিবার জন্য, কর্ম্মক্রিয়াপরিত্যাগীদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য, পুণ্য উদ্ভাবনের জন্য, জ্ঞানবল লাভের জন্য, বুদ্ধ-জ্ঞান সাক্ষাৎকারের জন্য, ধ্যানের অঙ্গবিভাগ স্থির করিবার জন্য, চিত্তের স্থিরতা ও মনের প্রভূত বল উৎপাদনের জন্য তাদৃশ উৎকট তপস্যা করিয়াছিলাম*।" বুদ্ধের এই কথায় বেশ বুঝা যাইতেছে, বুদ্ধদেব তপস্যাকে সফল বলিয়া জানিতেন বা মনে করিতেন, এবং তপস্যা করিলে যে ঐ সকল ফল অবশ্যম্ভাবী, ইহাও তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

হিন্দুদিগের পুরাণাদি-শাস্ত্রে ঋষিমুনিদিগের যেরূপ দুশ্চর তপস্যাপ্রণালী শুনা যায়, শাক্যসিংহের তপস্যাপ্রণালীও প্রায় সেইরূপ, পরন্তু তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত পূর্ব্ব মুনিদিগের উদ্দেশ্যের একরূপতা ছিল কি না সন্দেহ। শাক্যসিংহের তপস্যা আর পূর্ব্ব মুনিগণের তপস্যা উদ্দেশ্যবিষয়ে ভেদ

---

* ললিতবিস্তরের ১৭ অধ্যায় দেখ।

থাকাতেই বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় কিন্তু বাহ্য অনুষ্ঠানে কিছু মাত্র বিভিন্নতা দেখা যায় না।

শাক্যসিংহের তপস্যা কিরূপ? তিনি কি প্রকার তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বীক্রমে বর্ণিত হইতেছে। তদ্ যথা—

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শাক্যসিংহ বুদ্ধসংকল্পধারণ ও প্রবল উৎসাহ আহরণ পূর্ব্বক নৈরঞ্জনাতীরে তৃণময় ভূমিতে যোগাসন ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে প্রবলবল চিত্তের দ্বারা স্বকীয় শরীরনিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন *। যেমন বলবান্ পুরুষ দুর্ব্বল পুরুষের গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নিষ্পীড়িত করে, ভগবান্ শাক্যসিংহ তদ্রূপ ইচ্ছাবেগসমুদ্দীপিত প্রবলবল চিত্তের দ্বারা শরীরকে নিষ্পীড়িত বা নিগৃহীত করিতে লাগিলেন। শরীরক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি যতই নিষ্পীড়িত হইতে লাগিল, নিরুদ্ধ হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্মনিস্রাব হইতে লাগিল। নিদারুণ শীতকাল, বিশেষতঃ রাত্রি, তাহাতে আবার নিরাচ্ছাদিত নদীতীর—তথাপি তাঁহার দেহে ঘর্ম্মস্রোত বহিল † ।

নিগ্রহযোগ আয়ত্ত হইলে শাক্যসিংহ ভাবিলেন, এখন আমি আস্ফানক ধ্যান করিব। কুম্ভকযোগে মনোবৃত্তির লয় করার অথবা বাহ্য চৈতন্য হরণ করার নাম আস্ফানক ধ্যান। এই ধ্যানের কোনরূপ অবলম্বন নাই; সুতরাং ইহা নিরালম্ব-ধ্যান। শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনোবৃত্তির অনুত্থান করতঃ এই ধ্যান নিষ্পন্ন করিতে হয়। ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, "আশ্বাসপ্রশ্বাসানুরূপরোধয়তি—সন্নিরোধয়তি। অকম্পং তদ্ধ্যানং অবিকম্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চানিঃসৃতম্।" আস্ফানক-ধ্যানে শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয়; এ ধ্যান নিষ্কম্প, নিশ্চল, নিস্পন্দ, সর্ব্বানুগত ও সর্ব্বত্র অনিঃসৃত অর্থাৎ পূর্ণ। "আকাশসমং তদ্ধ্যানং তেন চোচ্যতে আস্ফানকমিতি।" এই ধ্যান আকাশের ন্যায় অর্থাৎ আকাশের

* অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

† আমাদের যোগশাস্ত্রে যাহাকে শম-দম-সাধন বলে, বৌদ্ধেরা তাহাকে, শরীরনিগ্রহ বলে। শাক্যসিংহ কয়েক মাস ব্যাপিয়া এই নিগ্রহ সাধন করিলেন এবং তাহাতে সিদ্ধি-লাভও করিলেন।

স্ফুরণ যদ্রূপ, ইহাতে চিত্তের অবস্থা তদ্রূপ *। অনন্তর আস্ফানক ধ্যান অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহার মুখ-নাসিকার বায়ু অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস অবরুদ্ধ হইল। মুখনাসিকাপথ অবরুদ্ধ হইলে শরীরে কুম্ভবৎ পরিপূর্ণ বাহ্য বায়ু প্রবলবেগে মহাশব্দে কর্ণছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তিনি পুনরপি আস্ফানক ধ্যান অবলম্বন করিলেন অর্থাৎ কুম্ভিত বায়ু যাহাতে কর্ণপথে না যায় তদুপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেন। এই দ্বিতীয় আস্ফানক ধ্যানে তাঁহার মুখ, নাসিকা, শ্রোত্র, সমস্তই রুদ্ধ হইল। কুম্ভিত বায়ু তখন উর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার শিরঃকপালে গিয়া (মাথার খুলির অভ্যন্তর ভাগে গিয়া) আঘাত করিল। এই তৃতীয় উদ্‌ঘাত কালে তাঁহার কুণ্ডলী (চেতনা শক্তি) শিবঃকপালে অর্থাৎ চিত্তস্থানে (মস্তিষ্কে) গিয়া একীভূত বা বিলয়প্রাপ্ত হইল। এখন তিনি নিশ্চল, নিস্পন্দ †। বুদ্ধদেবের এই কুম্ভকসমাপ্তি লিখিতে গিয়া আর্যযোগীর নিম্নলিখিত কথা মনে পড়ে।—

" যং ধ্যায়ন্তি বুধাঃ সমাধি সময়ে
শুদ্ধং বিয়ৎ সন্নিভম্ " ইত্যাদি।

এই সময়ে কোন কোন দর্শক লোক তাঁহাকে মৃত বিবেচনা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা বলে, এবং ললিতবিস্তর গ্রন্থেও লিখিত আছে, এই দিবসের অর্দ্ধরাত্র সময়ে বুদ্ধমাতা মায়া দেবী স্বর্গ হইতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তিনিও রোদন করিয়াছিলেন। তদ্ যথা—

"যদা জাতোঽসি মে পুত্র ! বনে লুম্বিনিসাহ্বয়ে।
সিংহবচ্চাগৃহীত স্ত্বং ক্রান্তঃ সপ্ত পদান্ স্বয়ম্ ॥
দিশশ্চালোক্য চতুরো বাচা তে ব্যাহৃতা শুভা।
ইয়ং মে পশ্চিমা জাতিঃ সা তে ন পরিপূরিতা ॥
অসিতেনাভিনির্দ্দিষ্টো বুদ্ধোলোকে ভবিষ্যতি।
ক্ষুন্নং ব্যাকরণং তস্য ন দৃষ্টা তেন নিত্যতা ॥

* আমাদের যোগ শাস্ত্রে ইহাকে কুম্ভক-সমাধি বলে।

† "তদ্ যথাপি নাম ভিক্ষব: পুরুষঃ কুণ্ডয়া শক্ত্যা শিরঃ কপালং মুপহন্যাৎ। ইত্যাদি। লং। কেহ কেহ কুণ্ডা শব্দের মৃৎপাত্র অর্থ লক্ষ্য করিয়া এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। "যেমন কোন পুরুষ বলপূর্ব্বক মস্তকে কুণ্ডাঘাত করে, অবরুদ্ধ বায়ুও সেইরূপ আঘাত করিল।"

চক্রবর্ত্তিশ্রিয়ং পুত্র ! নাপি ভুক্তা মনোরমা।
ন চ বোধিমনুপ্রাপ্তা জাতোঽসি নিধনং বনে ॥
পুত্রার্থে কং প্রপদ্যামি কস্ত ক্রন্দামি দুঃখিতা।
* * * * ॥

পুত্র ! তুমি যখন লুম্বিনি-বনে জন্মগ্রহণ কর, তখন তুমি সিংহবিক্রমে সপ্ত পদ গমন করিয়াছিলে। চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলে, এই আমার শেষ জন্ম, আর আমি জন্মগ্রহণ করিব না। কিন্তু হায় ! তোমার সে বাক্য সফল হইল না। অসিত মুনি বলিয়াছিলেন, তুমি বুদ্ধ হইবে, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, সেই ঋষিবাক্য মিথ্যা হইল ! পুত্র ! তুমি মনোরম রাজশ্রী ভোগ করিলে না, বুদ্ধও হইলে না। বনে জন্মিয়াছিলে এবং বনেই নিধনপ্রাপ্ত হইলে। এখন আমি পুত্র বলিয়া কাহার নিকট যাইব, কাহার নিকটেই বা কাঁদিব !

রোদনশব্দে বুদ্ধের যোগ ভঙ্গ হইল। নেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি দেখিলেন, এক দিব্যরূপা নারী রোদন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—

" কৈষাতীব করুণং রুদতে
প্রকীর্ণকেশী চ বিবৃত্তশোভা।
পুত্রং হ্যতীব পরিদেবয়ন্তী
বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা ॥"

কে তুমি আলুলায়িতকেশী ও দুঃখে অশোভমানা হইয়া অত্যন্ত করুণ বিলাপ করিতেছ ? পুত্র পুত্র বলিয়া রোদন করিতেছ ? আর ধুল্যবলুণ্ঠিতা হইতেছ ?

মায়াদেবী প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"ময়া তু দশ মাসান্ বৈ কুক্ষৌ বজ্র ইব ধৃতঃ।
সা তেঽহং পুত্রকা মাতা বিলপামি সুদুঃখিতা ॥"

পুত্র ! আমি তোমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, আমি তোমার মাতা। অতি দুঃখে বিলাপ করিতেছি !

শুনিয়া বোধিসত্ত্ব দয়ার্দ্র হইলেন এবং আশ্বাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন।

বলিলেন, "ন ভেতব্যম্। শ্রমং তে সফলং করিষ্যামি।" ভয় নাই—আমি আপনার কষ্ট দূর করিব। অসিত মুনির বাক্য মিথ্যা হইবে না—নিশ্চিত আমি বুদ্ধ হইব।

" অপি শতধা বসুধা বিকীর্য্যতঃ
মেরুঃ প্লবে চাম্ভসি রত্ন শৃঙ্গঃ।
চন্দ্রার্ক তারাগণ ভূপতেত
পৃথগ্‌জনো নৈব অহং মিয়েহহম্॥"

যদি পৃথিবী শতধা বিকীর্ণ হয়, সুমেরু পর্ব্বত জলে প্রবমান হয়, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা ভূপতিত হয়, তথাপি আমি প্রাকৃত মানুষ্যের ন্যায় মরিব না।

আপনি শোক করিবেন না, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, শীঘ্রই দেখিবেন, আমি বোধিপ্রাপ্ত হইয়াছি।

এইরূপে ভগবান বোধিসত্ত্ব দুঃখিনী জননীকে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, এবং মায়াদেবীও কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া অপ্সরোগণ সহ পুনর্ব্বার তুষিতপুরে গমন করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইল। একদা শাক্যসিংহের মনে হইল, ব্রাহ্মণগণ ও যতিগণ বলিয়া থাকেন, অল্পাহার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অতএব আমিও অল্পাহার আশ্রয় করিব। অনন্তর তিনি কোন দিন একটী মাত্র কোলফল, একটী মাত্র তিল, কখন একটী তণ্ডুল কখন বা বারিমাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অহরহ ও নিরন্তর আস্ফানক ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইল, তথাপি ধ্যান পরিত্যাগ করিলেন না এবং আহার গ্রহণও করিলেন না। কিছুকাল অতীত হইলে, পুনর্ব্বার তাঁহার মনে হইল, শ্রমণ ব্রাহ্মণেরা অনাহার দ্বারা বুদ্ধি নির্ম্মল হওয়ার কথা বলিয়া থাকেন; অতএব আমিও অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিব। পরে অনাহার-ব্রতেও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। এই সময়ে তাঁহার শরীর এত কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, কেবলমাত্র কয়েক খানি শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার শরীরে পরিদৃশ্য হইত না এবং ঈদৃক্ অবস্থাতেও তিনি ধ্যানচ্যুত হন নাই।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ শাক্যসিংহ বুদ্ধজ্ঞান লাভের

প্রত্যাশায় ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অল্পাশন ও অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া নিয়ত-কাল অচলবৎ, স্থিরবৎ, স্থাণুবৎ ও নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ স্থিরভাবে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য সমাধিতে অবস্থিত ছিলেন। শত শত শীত, বাত, আতপ, বর্ষা, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ, বজ্র,—তাঁহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি তত্তদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক একাসনে কাল কর্ত্তন করিয়াছিলেন, একদিনও ভাল করিয়া জানু প্রসারণ করেন নাই। তাঁহার শরীর এত নির্ম্মাংস কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিল যে, একগাছি তৃণ বা কার্পাসসূত্র তাঁহার নাসা দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া কর্ণ দিয়া বাহির করা যাইত এবং কর্ণ দিয়া প্রবিষ্ট করাইয়া মুখদিয়া বাহির করা যাইত। তাঁহার আকার এমনই বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কৌতুক করিত। তাদৃক্ কঠোর সাধনে তাঁহার কাঞ্চননিভ কান্তি কালিমায় পরিণত হইয়াছিল। শরীরের রক্তমাংস শুকাইয়া গিয়াছিল। নয়ন কোঠর মগ্ন, কণ্ঠা বহিরাগত, পঞ্জর দৃশ্যমান্ এবং মেরুদণ্ড উত্থিত হইয়াছিল। যখন ছয় বৎসর পূর্ণ হয়, তখন আর তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল না।

ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে রাজা শুদ্ধোদন চার-পুরুষের দ্বারা শাক্যসিংহের এই তপোবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার সংবাদ লইতেন এবং তাঁহার পরিদর্শনার্থ লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এই সময়ে কামাধিপতি মার তাঁহাকে তপস্যা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং নিম্নলিখিত প্রকারে প্রলোভিত করিয়াছিল। যথা—

"শাক্যপুত্র! সমুত্তিষ্ঠ কায়খেদেন কিং তব।
জীবতো জীবিতং শ্রেয়ো জীবন্ ধর্ম্ম চরিষ্যসি॥
কৃশো বিবর্ণোদীনস্ত্বংঅন্তিকে মরণং তব।
সহস্রভাগে মরণং এক ভাগে চ জীবিতম্॥
দুঃখোমার্গঃ প্রহাণস্য দুস্করশ্চিত্তনিগ্রহঃ।
ইমাং বাচং তদা মারো বোধিসত্ত্বমথাব্রবীৎ॥"

জ্ঞানবীর শাক্যসিংহ কামের ঈদৃক্ প্রলোভনে মুগ্ধ হন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়াছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—

" প্রমত্তবন্ধো, পাপীয়াং স্বেনার্থেন ত্বমাগতঃ।
অণুমাত্রং হি মে পুণ্যৈরর্থো মার! ন বিদ্যতে॥
অর্থো যেষাস্তু পুণ্যেন তানেবং বক্তুমর্হসি॥"

ইত্যাদি।

প্রমত্ত পুরুষের বন্ধু অরে পাপিষ্ঠ কাম! তুই স্বকার্য্য সাধন করিতেই আসিয়াছিস্। আমি পুণ্যপ্রার্থী নহি; যে পুণ্য কামনা করে, তাহাকে গিয়া তুই ঐ সকল কথা বল্। তুই আমার মরণের কথা বলিতেছিস্ কিন্তু আমি মরণ মানি না; কেন না, মরণান্তই আমার জীবন। আমি তোর কথা শুনিব না, ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিব। সমাহিত ব্যক্তির শরীর শুষ্ক হইলে মাংস শুষ্ক হয়, মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়, চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞা জন্মে, প্রজ্ঞা জন্মিলে অতিশক্তিভাক্ উৎসাহ জন্মে, তদ্বলে তখন সমাধি প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে। আমিও ঐরূপে তপস্যা করিব এবং সর্ব্বোত্তম বুদ্ধজ্ঞান লাভ করিব *।

এইরূপে তিনি কামকে পরাভূত করিলেন; কাম প্রতিগমন করিলে তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন,—

"নায়ং মার্গোবোধের্নায়ং মার্গো আয়ত্যাং জাতিজরামরণসম্ভবানামস্তঙ্গমায়।" আমি যাহা করিতেছি, ইহা (এই আস্ফানক ধ্যান) বোধি-লাভের পথ নহে, সুতরাং ভবিষ্যৎ জন্ম-জরা-মরণ-নিবারণের উপায়ও নহে। পরে এই ভাব মনে উঠিল যে, "যোঽহং পিতুরুদ্যানে জম্বুচ্ছায়ায়াং নিষণ্ণো বিবিক্তং কামৈর্বিবিক্তং পাপকৈরকুশলৈর্ধর্ম্মৈঃ সবিতর্কং সবিচারং বিবেকজং

---

* কোন এক লক্ষ্য লাভের উদ্দেশে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া শীঘ্র লক্ষ্য লাভ না হইলে মনের নানা প্রকার লক্ষ্যবিপর্য্যয়কারী আন্দোলিতাবস্থা জন্মে, অর্থাৎ কষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই সকল আন্দোলনের নাম কাম বা সুখপ্রলোভন। শাক্যসিংহের মনে চকিতের ন্যায় ঐরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা বিক্রমদ্বারা দূরীকৃত করিয়াছিলেন।

প্রীতি সুখং প্রথমং ধ্যানং উপসম্পদ্য যাবৎ চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য ব্যহার্ষং স্যাৎ স মার্গো বোধের্জাতিজরামরণদুঃখ সমুদায়ানামসম্ভবায়াস্তংগমায়।" পূর্ব্বে আমি যে পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া কামমুক্ত, পাপমুক্ত ও অকুশলধর্ম্মবর্জ্জিত হইয়া বিবেকজাত সবিতর্ক ও সবিচার নামক প্রথম সমাধি করিতাম; পরে চতুর্থধ্যানে অর্থাৎ নির্বীজ সমাধিতে বিহার করিতাম, তাহাই বোধিলাভের, নির্ব্বাপকজ্ঞান লাভের, ভবিষ্যৎ-জন্ম-জরা-মরণ-বিনাশের পথ বা উপায়। কিন্তু, সে পথ এরূপ দুর্ব্বল শরীরের গন্তব্য নহে, প্রাপ্যও নহে। এ শরীরে আমি বোধিদ্রুম-তলে যাইতে অক্ষম। এজন্য, এক্ষণে আমার ঔদরিক আহার দ্বারা অগ্রে বলসঞ্চার করা আবশ্যক হই-য়াছে। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভগবান্ বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব। পরে প্রথম দিনে তিনি মুদ্গাযূষ পান করিলেন, অনন্তর দিবসে কুল্মাষযুক্ত অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

তাঁহার সেই শিষ্যপঞ্চক শাক্যসিংহের তাদৃশ আহারতৎপরতা দেখিয়া ভাবিল, এই গৌতম ছয় বৎসর কাল এত কঠোর তপস্যা করিয়াও মনুষ্যোত্তর ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার। করিতে পারিল না। এক্ষণে এ ঔদরিক হইল, এখন আর এই ঔদরিকের নিকটে থাকিয়া ফল কি? এটা নিতান্তই বালক, সুখপ্রসক্ত ও কপট। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই শিষ্যপঞ্চক তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাশীগমন করিল, এবং তত্রস্থ মৃগদায় ও ঋষিপত্তন নামক স্থানে গিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইল।

উরুবিল্বের নিকটে নন্দিক নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের অধিপতির একটী কন্যা ছিল। কন্যাটীর নাম সুজাতা। সুজাতা অতিশয় সাধ্বী, ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা। সাধু সন্ন্যাসী ও শ্রমণদিগের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ছিল। এমন কি তিনি সাধু সন্ন্যাসীর সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। এই সুজাতা, যে দিন শুনিয়াছিল, নৈরঞ্জনাতীরে এক জন পরম তপস্বী আসিয়াছেন, সেই হইতেই তিনি প্রতিদিন নিজ সখিগণসহ এই নব সন্ন্যাসীর সেবা ও বন্দনা করিতে নৈরঞ্জনাতীরে আসিতেন। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্য অনেক কন্যা আসিত। শাক্য-সিংহ যখন কেবল মাত্র তিল, তণ্ডুল ও কোল ফল ভক্ষণ করিতেন,

তখন এই সুজাতাই তাঁহাকে ঐ সকল খাদ্য উপস্থিত করিয়া দিত। এক্ষণে এই সুজাতাই আবার তাঁহাকে মুদ্গযূষ ও অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। সুজাতার প্রদত্ত অন্নভোজনে ক্রমে তাঁহার দেহে পূর্ব্ববৎ বল-বর্ণাদি আগমন করিল। শরীরে বলসঞ্চার হইলে, তিনি আর সুজাতার আনীত ভক্ষ্য গ্রহণ করেন নাই, নিকটবর্ত্তী গোবর গ্রামে গিয়া অন্নভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আহারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন দেখিলেন, তাঁহার পরিধেয় কাষায় বসন ছয় বৎসরের বর্ষায় একবারে গলিত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাঁহার বস্ত্র আহরণের ইচ্ছা জন্মিল। পূর্ব্বোক্ত সুজাতার রাধানাম্নী এক দাসী ছিল, সে মৃতা হওয়ায় তাহার বস্ত্রবেষ্টিত শবদেহ শশ্মানে নিক্ষিপ্ত ছিল। শাক্যসিংহ তাহা দেখিতে পাইয়া সেই শবস্পৃষ্ট বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং পুষ্করিণীজলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিধান করিলেন। এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শুভদিনে ও শুভক্ষণে নৈরঞ্জনাজলে অবগাহন পূর্ব্বক শুচি ও শীতল হইয়া বোধিজ্ঞান উপার্জ্জনের উদ্দেশে বোধিবৃক্ষের অভিমুখে যাত্রা করিলেন *।

শ্রীরামদাস সেন।

কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাস।

অনুক্রমণিকা।

কলিকাতা বঙ্গদেশের ষষ্ঠ রাজধানী। বিগত ছয় শতাব্দীর মধ্যে বাঙ্গালীকে আরও পাঁচটি রাজধানীর মুখাবলোকন করিতে হইয়াছে। সময়ক্রমে একে একে গৌড়, রাজমহল, ঢাকা, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদে বাঙ্গালার শাসন-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল।

---

* ললিতবিস্তর গ্রন্থে লিখিত আছে, ভগবান্ বর্জ্জিত হইলে নন্দিকগ্রামপতিদুহিতা সুজাতা একদিন তাঁহাকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ ও স্বগৃহে আহ্বান করিয়াছিল এবং ভগবান্ও তাঁহার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া সুজাতার গৃহে একদিন ভোজন করিয়াছিলেন।

২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড় দশ লক্ষ লোকের আবাসভূমি ছিল। নগরের নিম্নে যে নদী প্রবাহিত ছিল, কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে উহা মন্দস্রোত ও ভিন্নশাখাগামী হইলে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ভয়ঙ্কর বিঘ্ন উপস্থিত হইল। লোমহর্ষণ মহামারি আবির্ভূত হইয়া সমৃদ্ধিশালী রাজধানীকে অরণ্যে পরিণত করিল। কলিকাতার ন্যায় একদিন গৌড়ের বিচিত্রগঠনসম্পন্ন সৌধমালা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিত। সেই অট্টালিকাশ্রেণীর ধ্বংসাবশেষ এখন পুরাবৃত্তানুরাগীর কৌতূহলের সামগ্রী। "শত রাজার রাজধানী" রাজমহল গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের শীর্ষস্থানে সন্নিবেশিত। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন যদি শিল্পচাতুর্য্যে ইউরোপের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ এবং রোমের সহিত কোনও রূপে সংসৃষ্ট না হইত, তাহা হইলে, হয় ত বাঙ্গালার ইতিহাস অন্য রূপে লিখিত হইত। নবদ্বীপ সাধারণত নদীয়া বলিয়া খ্যাত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শাস্ত্রচর্চ্চায় নবদ্বীপ বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় ছিল। হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্য এই স্থানেই অস্তমিত হয়। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার মুসলমান রাজধানী।

কলিকাতা একটি সামান্য পল্লীগ্রাম হইতে আজি কয় বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর মহানগর সমূহের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। এত অল্পকাল মধ্যে সভ্য জগতে রুস রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ ব্যতীত আর কোনও স্থান সামান্য হইতে এত সমুন্নত হয় নাই। জব্ চার্ণক কর্ত্তৃক কলিকাতার ভিত্তিমূল সংস্থাপনের সমকালেই সম্রাটমহান্ পিটর সেণ্টপিটর্সবর্গের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছিলেন। উভয় নগরই অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, আবার উভয়ই কালক্রমে সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হইল। শতাব্দীমাত্র অতীত না হইতেই আংলো ইণ্ডিয়া (ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারত) ও রুষ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে এতদূর ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে তাহা তখন কেহ ভাবে নাই। একদিকে ভারতে সিপাহিরা যে কার্য্য সংসাধিত করিয়াছে, অপর দিকে মধ্য আসিয়ার কসাক সৈন্যগণও ঠিক সেইরূপ কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছিল।

কলিকাতার সন্নিবেশ স্থান—ভাগীরথী-তীরে সমতল ধান্যক্ষেত্র, জলাভূমি এবং স্থানে স্থানে বন ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত তৃণপত্রাচ্ছাদিত মৃণ্ময় গৃহসমষ্টির পল্লীমাত্র ছিল। প্রকৃত পক্ষে কলিকাতার মহত্ত্বের ভিত্তিমূল এক শত

বৎসরের কিছু পূর্ব্বে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যদিও এই স্থানের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু সম্বন্ধ আছে, তথাপি এই নগর সম্বন্ধীয় যে সকল স্থানীয় ও ঐতিহাসিক মনোহারিতা ছিল, তাহা প্রায় উপরি উক্ত সময়ের মধ্যে নিহিত। কলিকাতার ক্রমশঃ যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ঐ সকল ঐতিহাসিক মনোহারিতার স্মৃতি লোকের মন হইতে ক্রমেই অপসারিত হইতেছে এবং পুরাতন ভূমির ও স্থানের চিহ্নসকল পরিবর্ত্তনের স্রোতে যেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতিচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতেছে। পুরাতত্ত্ব বিষয়ে তুলনা করিলে, নগর-পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি কলিকাতা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিকাতা নগরের মহত্ত্ব যে ইঙ্গরেজ অধিকারের পর হইতেই হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এক্ষণে "প্রাচীন কলিকাতা" বলিলে সার্দ্ধেক শত বৎসরের একটি নগরকে বুঝায় মাত্র। অনেকে এজন্য ইহাকে প্রাচীন বলিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এই মাত্র বলি যে, ভারতে ব্রিটিসদিগের সম্বন্ধে এই রূপই ঘটিয়াছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক ঘটনাস্রোত চলিয়া গিয়াছে এবং দৃশ্য সমূহের ঘন পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃগণেরও এত দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যে সেই ঘটনানিচয় আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটের (United States) ন্যায় নবীন কলিকাতাকেও প্রাচীন করিয়া তুলিয়াছে। ফলতঃ কলিকাতার পূর্ব্বতন শাসনকর্ত্তৃগণের কথা যেন সোমনাথ পত্তনের মুসলমান আক্রমণ অথবা সেকেন্দর বাদসাহের পাটলি-পুত্রাভিমুখে গমনের ন্যায় অতি পুরাতন ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রথম অধ্যায়।—ভূতত্ত্ব।

ভূতত্ত্ব বিষয়ক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা জল দ্বারা সঞ্চিত মৃত্তিকাসম্ভূত নিম্ন ও সমতল ভূমির উপর নির্ম্মিত, কেবল মাত্র জোয়ার সমতল হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উন্নত এবং নিকটবর্ত্তী রাজমহল পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে এক শত ক্রোশ দূরে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের নিম্নাংশে সন্নিবেশিত।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণা ও গণনা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে অতীব প্রাচীন অর্থাৎ ইতিহাসাতীত কালে, কলিকাতার ৭৫ ক্রোশ উত্তরে, মুরসিদাবাদ এবং মালদহের মধ্যস্থিত কোন একটী স্থানে সমুদ্রের তীর ছিল, এবং তথা হইতে ১৫ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত নির্ঝর-শোভিত উন্নতশেখর হিমালয়-নিস্থতা কলনিনাদিনী তরঙ্গিণী সগর্ব্বে সাগর-গর্ভে কর্দ্দম (পলি) নিক্ষেপ করতঃ ক্রমশঃ নিম্ন বঙ্গ রচনা করিয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়মে ভূভেদ বা খনন *।—১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বানুসন্ধানোপলক্ষে উইলিয়াম দুর্গে যে একটী সুগভীর কূপ খনন করা হয়, তৎসম্বন্ধীয় সভার মন্তব্য-সার পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে উহার ৩৯২ ফুট নিম্নস্তরে বালুকা মধ্যে গিরিনদী-গর্ভ-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট মৃদঙ্গার (fine coal) কতক গুলি জীর্ণ কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত পাওয়া যায়; এবং ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে এক খণ্ড চূর্ণ-প্রস্তর (Lime stone) উত্তোলিত হয়। ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট নিম্নস্তর সমূহের মধ্যে সমুদ্রোপকুল জাত সূক্ষ্ম সিকতা বিজড়িত অধিকাংশ আদি প্রস্তর (Primary socks) কোয়ার্টজ (quartz), ফেলস্পার (felspar), অভ্র (mica), শ্লেট (slate), এবং চূর্ণপ্রস্তরখণ্ড-মিশ্রিত উপলখণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিঘ্নসংঘটন প্রযুক্ত উপরিউক্ত নিম্ন তলই খনন কার্য্যের শেষ সীমা হয়। এই রূপ (course conglomerate) দ্রব্যাদি যে কত দূর নিম্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তাহা ঠিক নির্ণয় হয় নাই; কিন্তু অনুমিত হয় যে উহা প্রায় আর ৮০ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপরি উক্ত কারণ সমূহের দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে ইহার সন্নিকটে যে সকল উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী ছিল সেই সকল ক্রমশঃ অল্পে অল্পে বসিয়া যায়। ভূতত্ত্বানুসন্ধানে অনেক স্থলে সমভূমির নিম্ন ভূমধ্যস্তরে স্বভাবতঃ এই রূপ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়া থাকে, সেই কারণ বশতঃ এই অনুমান সপ্রমাণিত হইতেছে। এই রূপ ৮০ ফুট নিম্নে একটী উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর (stratum of peat)

---

* Boring Operations in Fort William, 1835-40, *vide* Journal of the Asiatic Society, Bengal, Vol. IX. p. 686.

পাওয়া যায়, উহার মধ্যে মান্দ্রাজী সসার (cucumis madraspatamus. Wildenow) বীজ এবং এক জাতীয় ইক্ষুপত্র (leaves of sugar grass) (saccharum sara Roxburgh) প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার হুকার বলেন যে, যে সময়ে স্রোতঃপ্রবাহিত কর্দ্দমরাশি (পলি) দ্বারায় প্রথম স্থল রচিত হয় সেই সময়ের কলিকাতায় সমতল ভূমির উপরিভাগের সঙ্গে বর্ত্তমান সমভূমির অবস্থার বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়, এবং উহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে সেই সময়ে এই স্থানের সমুদ্র খাড়ি (estuary) অনেক পরিমাণে টাটকা ছিল *। ১৫৯ ফুট নিম্নে এক প্রকার পীত বর্ণ শিরাযুক্ত আঁটাল মাটি, এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্ন হইতে প্রস্তরে পরিণত অস্থি (fossil bone) উত্তোলিত হয়, উহা কুক্কুরের স্কন্ধদেশের অস্থি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহা ব্যতীত ৩৭২ ফুট নিম্নে অন্যান্য অস্থি সকলও পাওয়া যায়।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট পুষ্করিণী খনন।—সারকুলার রোডের পূর্ব্বাংশে শেয়ালদহ ষ্টেসনের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহার খনন সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্নেলে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারাও আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব বিষয়ে অনেক অবগত হইতে পারি।

যে সময়ে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব উক্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেন সে সময়ে ঐ পুষ্করিণী ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইতে ৩০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছিল। ঐ সমতল ভূমি উক্ত পুষ্করিণীর নিকটস্থ খালের স্বল্প-জোয়ার (low spring tide) সমতল হইতে ১৫½ ফুট নিম্ন; এবং উক্ত সমতল ভূমি গ্রীষ্মকালীন ভাগীরথীর অত্যল্প-জোয়ার (lowest spring tide) সমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ, সুতরাং পুষ্করিণীর তলদেশ উক্ত জোয়ার সমতল হইতে ১৩ ফুট নিম্নে। পূর্ব্বতন ভূপৃষ্ঠের প্রমাণ সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিষয়টী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ঐ পুষ্করিণী খনন কালে দেখা যায় যে, উহার উপরিস্থ ন্যূনাধিক ৩ ফুট

---

* *Vide* Himalayan Journal, Vol. II., p. 341.

ভূমি উদ্ভিদসমুদ্ভুত মৃত্তিকা ও প্রস্তুত মৃত্তিকায় (made earth) পূর্ণ এবং অসমতল মৃত্তিকার উপর স্থাপিত। ঐ নিম্নস্থ অসমতল ভূমির মৃত্তিকা ধান্য-ক্ষেত্রের মৃত্তিকার ন্যায়; কিন্তু পুষ্করিণীর সকল স্থান একরূপ নহে। স্থল বিশেষ স্বল্পভারাসহিষ্ণু বালুকাকণাবিমিশ্রিত লবণাক্ত কর্দ্দম যুক্ত, অন্যত্র বা পরিষ্কার (ঘটাদি নির্ম্মাণোপযোগী) চিক্কণ মত্তিকাপরিপূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ উহা এরূপ খণ্ড খণ্ড উদ্ভিজ্জাবশেষপূর্ণ যে, তাহার (উদ্ভিদের) জাতি বিভাগ অসম্ভব। এই নিম্নস্থ ভূমিখণ্ডের নিম্নতর দেশ সমধিক পরিষ্কার মৃত্তিকাবিমিশ্রিত এবং উহার তলদেশে অাঁটাল মাটী পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ২০ ফুট নিম্ন হওয়ায় ঐ স্তরের বেধ ১১ ফুট।

তন্নিম্ন স্তরে অবিশুদ্ধ উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা (impure peat)। উহা শুষ্ক হইলে এক প্রকার অদাহ্য হয়। ইহাতে সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া যায়, ঐ সকলের শিকড় তন্নিম্ন ভূমিতেপ্রবিষ্ট। এই স্তর পুষ্করিণীর সমুদয় অংশে ব্যাপ্ত এবং অনুমান হয়, সর্ব্ব স্থানে সমান গভীর না হইলেও কলিকাতা এবং ভাগীরথী পারস্থ হাবড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঐ রূপ স্তর নিম্ন জোয়ার সমতলে গার্ডন রিচ এবং বোটেনিকেল উদ্যানের নদীতীরেও দেখা যায়। এই সকল স্থানে উহার চরম গভীরতা শেয়ালদহে দৃষ্ট গভীরতা হইতে ৬ ফুট অধিক। অপরদিকে ফোর্টউইলিয়মে তিন বার তিনটী স্থান খননে উহা ৫১ ফুট নীচে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল, এবং ফোর্ট ও শেয়ালদহের প্রকৃত ভূপৃষ্ঠ সমতলতা হইতে ৩ ফুট অন্তর ধরিয়া শেয়ালদহ অপেক্ষা ফোর্ট ২৮ ফুট এবং বোটানিকেল উদ্যান অপেক্ষা ৩৪ ফুট নিম্ন হইয়া পড়ে। উপরি উক্ত দুইটী খনিত ক্ষেত্রের সমতলতার বিশেষ প্রভেদ থাকা সত্বেও এই রূপ ভূভাগ দর্শনে ইহা উপলব্ধি হয় যে ঐ স্তর হয় ত একাদিক্রম অথবা উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম ব্যাপ্ত।

উক্ত উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর (peat bed) জমাট কর্দ্দম-রাশির উপর স্থাপিত, উহার উপরিভাগ সিকতাময় এবং নিম্ন দিকে নীল বর্ণ কঠিন মৃত্তিকা। এই স্তরে ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ ৩০ ফুট অথবা উদ্ভিদ-জাত অপরিণত খনিজকয়লা স্তর হইতে ১০ ফুট নিম্নে বিভিন্ন সমতলে সুন্দরীর গোড়া সকল পাওয়া যায়। ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে এই

বৃক্ষাবশেষের দুইটী নমুনা নিম্নদেশ হইতে বাহির হইয়াছিল। উহাদিগের মূল নিম্নস্থ কর্দ্দম মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে ৪ ফুট নিম্ন পর্য্যন্ত একটী কূপ খনন করা হয়, ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, উহাতে উক্ত জাতীয় বৃক্ষের শিকড় ইতস্ততঃ পরিব্যাপ্ত ছিল। অতএব এই সকল বৃক্ষ পূর্ব্বোক্ত খালের নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৫½ ফুট এবং ভাগীরথীর নিম্নতর জল-সমতল হইতে ঠিক ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের পরিদর্শন কালে আর অধিক খনন করা হয় নাই। কিন্তু তিনি লিয়োনাড সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ঐ পুষ্করিণীর তলে একটী সুগভীর কূপ খনন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ণ করা হইয়াছিল, তাহাতে পুষ্করিণীর নীচে ১৫ ফুট ঐ কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ স্তর আবার একটী জীর্ণ উদ্ভিজ্জাবশেষবিমিশ্রিত শিথিল কৃষ্ণবর্ণ সৈকত স্তরের উপর স্থাপিত। তদনুসারে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের (peat bed) নিম্নে ঐ স্তরের বেধ ২৫ ফুট হইবে। উইলিয়ম দুর্গের খাত স্থানের সঙ্গে ঐ উদ্ভিজ্জাত অপরিণত খনিজ কয়লা-স্তরের অনেকাংশে ঐক্য দৃষ্ট হয়। সেখানে (ফোর্টে) ঐ উদ্ভিজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর কঙ্কর ও কাষ্ঠ-বিমিশ্রিত নীল বর্ণ কর্দ্দম এবং তন্নিম্নে নূন্যাধিক ২১ হইতে ২৫ ফুট বেধযুক্ত পীত বর্ণ কর্দ্দম স্তরের উপর স্থাপিত; এবং এই স্তর ঈষদ্রক্তবর্ণ আর্দ্র সৈকত স্তরাশ্রিত।

শেয়ালদহের খাত স্থানের ৩০ ফুট নিম্নে গাছের গোড়া পাওয়া যায় এবং উহার দ্বারা 'ব'দ্বীপটী বসিয়া যাওয়া প্রমাণীভূত হইতেছে—এই দুইটি কথা প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য। যে সকল বৃক্ষের কথা উল্লিখিত হইল, উহার নমুনা ব্ল্যানফোর্ড সাহেব ডাক্তার অ্যাণ্ডারসন সাহেবের নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি উহাকে সুন্দরী বৃক্ষ বলেন। সমতলতা সম্বন্ধে এই জাতীয় বৃক্ষশ্রেণী উচ্চজোয়ার সমতলের ২ হইতে ১০ ফুট পর্য্যন্ত নিম্নে হইয়া থাকে। উহা কেবল কর্দ্দমের উপর অথবা যেখানকার ভূপৃষ্ঠ সর্ব্বদা জল-মগ্ন হইয়া হ্রাস বর্দ্ধিত হয়, অথচ প্রত্যেক জোয়ারের পরে বৃক্ষ সকলের গোড়া অনেকক্ষণ বাতাস পায় সেই সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে। ইহাতে

বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায় (সুন্দরবন) সেখানকার ভূপৃষ্ঠ ভাগীরথীর নিম্ন ভাটা সমতল হইতে ১৮।২০ ফুট নীচে না হইলে শেয়ালদহের যে খানে গোড়া প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেখানে ঐ বৃক্ষ জন্মান অসম্ভব। কিন্তু বাস্তবিক সুন্দর বন সেরূপ সমতলে অবস্থিত নহে। তবে শেয়ালদহের ঐ সকল বৃক্ষের উৎপত্তির পরে ঐ স্থানের ভূপৃষ্ঠের অনেক ফুট অধোগমন হইয়াছিল। ভাগীরথী এবং বহিঃ-সুন্দরবনের নিম্ন সমতল সম্বন্ধে ব্ল্যানফোর্ড সাহেব কোন বিশেষ প্রমাণ পান নাই বটে, কিন্তু তিনি ডাক্তার লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, ভাগীরথী ও ক্যানিং টাউনের অন্তর্গত মাতলার সমতল দ্বয়ের অন্তর অতি সামান্য এবং উহা প্রকৃত (Geological range of sundri) হইতে অধিক মাইল উপরে হইবে না। অন্য পক্ষে খালটী এত প্রশস্ত ও গভীর যে উহাতে ভাগীরথীর নিম্ন জলোচ্ছ্বাসের সমতলতার কিছু মাত্র অনুমান করিতে দেয় না। সুন্দরী বৃক্ষশ্রেণী যেস্থানে অবস্থিত এবং উহা যে ৬।৮ ফুট অত্যল্প জোয়ার সমতল মধ্যে জন্মায় না, এই সকল কারণে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, শিয়ালদহের খনিত পুষ্করিণীর যে সমতলে গোড়া পাওয়া গিয়াছিল, ঐ সমতলে ঐ বৃক্ষ জন্মিবার পরে যে ঐ ভূমির ১৮ কিম্বা ২০ ফুট অধোগমন হইয়াছিল তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন যে ফোর্ট উইলিয়মে খনন কালীন উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তরের উপরে এবং নিম্নে যে কাষ্ঠ পাওয়া যায় উহা যদ্যপি ঠিক ভাবে স্থাপিত হয় (তাহা তিনি সম্ভবত বিবেচনা করেন) তাহা হইলে সেখানেও যে ভূপৃষ্ঠের অধোগমন হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই ৪৬ হইতে ৪৮ ফুটের ন্যূন হইবে না। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না এবং তদনুসারে সমদূর পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক বসিয়া যাওয়া সত্য কি না তদ্বিষয়ে বিশ্বাসের বিশেষ প্রমাণাভাব।

ব্ল্যানফোর্ড সাহেবের মতে এই অধোগমনের পরিমাণ ন্যূনাধিক হইলেও উহা বহুদূরব্যাপী। তিনি লিয়োনার্ড সাহেবের নিকট অবগত হয়েন যে, মাতলার নিকট ক্যানিং টাউনে উদ্ভিদজাত অপরিণত খনিজ কয়লা স্তর ২০

ফুট নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানের প্রকৃত ভূপৃষ্ঠসমতল শেয়ালদহ হইতে যে অনেক ফুট নিম্নে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি কর্ণেল গ্যাষ্ট্রেল (Col: Gastrell) সাহেবের নিকট শুনিয়াছিলেন যে যশোহরান্তর্গত খুলনা নামক স্থানে একটী পুষ্করিণী খনন কালে, দেখিতে পাওয়া যায় উদ্ভিদসম্ভূত স্তর ১৬ ফুট হইতে ২০ ফুটের মধ্যে স্থাপিত এবং শিকড়যুক্ত বৃক্ষের গোড়া সকল ১৮ হইতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত বিভিন্ন বিভিন্ন সমতলে প্রোথিত।

উপরি উক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে গাঙ্গের 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত অধোগামী হইয়াছে। কেন না নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরী বৃক্ষ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল যে এক কালে ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্ল্যানফোর্ড সাহেব বলেন ইহাতে স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল স্থানের খনন বিষয় তিনি অবগত আছেন, সে সকল স্থানের বৃক্ষ সমূহ ৮ হইতে ১০ ফুট উর্দ্ধ স্থূলতার মধ্যেই (Vertical thickness) দেখিতে পাওয়া গিয়াছে ; এবং উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত শম্বূকাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বকার ভূপৃষ্ঠের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল অধোগমনের এক ভাবিতা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, অধোগমন এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদীস্রোততাড়িত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত শীঘ্র ভরাট হওয়া অসম্ভব।— [ক্রমশঃ।]

---

* Vide Journal of the Asiatic Society of Bengal vol. XXXII No. I to IV and a Supplement No.—1863.

Note on a Tank Section at Sealdah Calcutta by H. F. Blanford A. R. S. M., F. G. S.

ভালবাসা।

১

এত দিনে বুঝিলাম,—যখন কি হবে বুঝে!
অনন্তের মাঝে আমি ছুটিতেছি অন্ত খুঁজে!
যেখানে অনন্ত স্তব্ধ,
খুঁজিতেছি সেথা শব্দ!
যেখানে অনন্ত স্বপ্ন, খুজিতেছি সেথা কাজ!
নাহি সুখ, নাহি শ্রান্তি,
খুঁজিতেছি সেথা ভ্রান্তি!
চড়িতেছি স্মৃতি-ভেলা, অনন্ত খেলার মাঝ!
—এত দিনে বুঝিলাম, কি হবে বুঝিয়া আজ?

২

থামিয়া গিয়াছে গান,
শুইয়া প'ড়েছে প্রাণ,
টানিতে পারি না বায়ু আর আমি শ্বাস পূরে।
থেমেছে কল্পনা, ভাষা,
সুখ, দুখ, সাধ, আশা।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!

৩

কোথা তুমি ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে!
গান ত হইল শেষ,
কোথা তুমি সুর-রেস?
সুখ দুখ হ'লো শেষ, হ'লো শেষ কারে ঘুরে?

উলটি পালটি পাতা,
ক্রমে শেষ হ'লো খাতা ;
মুদে এলো আঁখি-পাতা, বুক গেল ভেঙেচুরে।
কোথা তুমি, ভালবাসা, যে তুমি—সে তুমি দূরে !

৪

মিছে এ কল্পনা মোর, লাগিল না কোন কাজে।
মিছে এ জোয়ার ভাঁটা ;
মিছে ফোটা, খোলা কাঁটা ;
মিছে বাঁধা বাঁধা-বীণা ; মিছে রঙ্ ছবি-ভাঁজে।
মিছে এ জোনাকী রেখা,
শারদ জ্যো'স্নায় লেখা ;
মিছে লঘু মেঘ-ছায়া মধ্যাহ্ণ তপন-ঝাঁজে।
মিছে এ তরুর কম্পে
ঝটিকার ভীম ঝম্পে ;
মিছে এ উর্ম্মির ঘূর্ণী তরঙ্গের রঙ্গ মাঝে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ঘুম ভাঙে না।

সর্ব্বতত্ত্বদর্শী সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ একদিন গাইয়াছিলেন—

"সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না।"

কি ঘুমের ঘোরে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথা হইতে যে এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছ, তাহার কিছু ঠিকানা নাই। এ ঘুমের ঘোরে যত ঘুরিতেছ ততই যেন ঘোর আরও চাপিয়া ধরিতেছে—মাথা তুলিতে দেয় না। এই সাধের ঘুম ঘুমাইতে ঘুমাইতে সাধের ঘোরে বিভোর হইয়া কি করিতেছ, কত কি স্বপ্ন

দেখিতেছ, কত দিন হইল কত কি দেখিয়াছিলে সে গুলির ঘোর না ছাড়িতে ছাড়িতে আবার কি নূতন ঘোর আসিল, আবার কি নূতন স্বপন দেখিলে, তাহাতে কে যে কি এক রকম বিহ্বলতা মাখাইয়া দিয়াছে, কি বিভোর তন্দ্রাময় ভাব মিশাইয়া দিয়াছে, যে তাহার বশে পড়িয়া আর ঘুম ছাড়িতে পারিলে না। যত ঘুমাও তত ঘোর বাড়ে, যত ঘোর বাড়ে তত স্বপনে কত কি কর—কত কি দেখ, দেখিতে দেখিতে—তাহার সঙ্গে মিশিতে মিশিতে—ঐ আরও যেন জড়তা বাড়িল—সে স্বপন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় কি গেল—ঘুম ত ভাঙ্গিল না। তুমি কোথায় শুইয়াছিলে? মনে ত হয় না,—যেখানে ছিলে সেই স্থানেই আছ কি? এখন কোথায় আছ? তোমার বিছানা কৈ?

"ভাল পেয়েছ ভবে কাল বিছানা"

সেই অনন্তকালের অনন্ত শয্যায় সাধে শয়ন করিয়াছিলে। সেই কাল বিছানায় শায়িত হইয়া কালের চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, সেই সাধের ঘুমের ঘোর কেবল বাড়িতেছে—অনন্ত জগতের অনন্ত ঘোরে পড়িয়াছ—এ ঘোর ও ছাড়িবে না, তোমার ঘুমও ভাঙ্গিবেনা।

অনন্তকালের—অনন্ত জগতের মধ্যে তুমি এতটুকু—কাল শয্যায় শুইয়া আছ, কত স্বপ্ন দেখিতেছ—পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কত কি—সবই কি স্বপন? এগুলি কোথা হইতে আসিল? স্বপনে কি পাতাইয়া লইয়াছ? যাদের সহিত পাতাইয়াছ—যাদের সহিত এই স্বাধের ঘুমের, ঘোর স্বপনের বাঁধন বাঁধিয়াছ তারাও কি তোমার মত এই কাল বিছানায় সাধের ঘুমে কাতর?—সবাই কি তোমার মত কালের ঘুমঘোরে—সাধের স্বপনে সব কাজ করিতেছে? এ স্বপন দেখিতে দেখিতে—এ জড়তায় সবাইকে জড়াইতে জড়াইতে—ঐ যে মাতার কাজ শেষ হইয়াছে!! তাঁর স্বপনের বাঁধন যে কাটিল! তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে না কি? তিনি কাটিলেন—তুমিত পারিলে না, বন্ধনরজ্জুর আর একদিকে তুমি তেমনই বাঁধা আছ। আবার ঐ! যাহাকে ভাই বলিতে, সেও ত এই অল্পদিনের জোর বাঁধনটি কাটিয়া গেল! তুমি বাঁধা পড়িয়া আছ। বাঁধনটি কম দিন হইল দিয়াছিলে কিন্তু বড় জোরে দিয়াছিলে—তথাপি কাটিয়া গেল! আহা!

এ বাঁধনের আবার সবই বিপরীত। পুরাণ বাঁধনগুলির জোর না কমিয়া আরও বাড়িতেছে। কাল-চক্রের কঠোর নেমীর পেষণে তুমি চূর্ণ হইয়া যাইতেছ, বল সবই যে গেল—বড় হীনবল হইয়া পড়িতেছ—তাই ঘুম আরও চাপিয়া ধরিতেছে। এ ঘুমের ঘোর—এ স্বপনের জোর কমে না কেন? তোমার এত ঘুম কেন?—

" এই যে সুখের নিশি জেনেছ কি ভোর হবেনা "

তোমার এত ঘুম কেন? এই অনন্ত কালের মধ্যে তুমি এতটুকু মাত্র কাল অধিকার করিয়াছ বৈ ত নয়—তাহা ত একদিন শেষ হইবে। অনন্তকাল-সাগরে তুমি একটী ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদ্—তোমাকে একদিন এই সাগরে মিশাইয়া লইবে। নিমেষের জন্য উঠিয়াছ—নিমেষের জন্য এত আড়ম্বর কেন? ভানুর সুবর্ণময় কিরণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া এত বাহার দিতেছ কেন? তুমি কিসের বশে এত বিহ্বল? কালশয়নে শায়িত হইয়া কি আকর্ষণে তোমাকে টানিয়া রাখিয়াছে যে তুমি এ ছাই ঘুমের ঘোর ছাড়িতে পারিতেছ না?—কাহার বাঁধনে বাঁধা পড়িয়াছ?—

" তোমার কোলেতে কামিনা কান্তা তারে ছেড়ে পাশ ফের না "

তোমার কাল বিছানায় সাধের ঘুমে আবার সঙ্গিনী মিলিয়াছে—একে ত নিজে পূর্ণমাত্রায় বিহ্বল—তাহাতে আবার প্রিয়তমা কামনার সহায়তা পাইয়াছ; তাহার প্রলোভনে—তাহার প্ররোচনায়, তোমার যে টুকু জড়তার অবশিষ্ট ছিল তাহাও পুরিয়া উঠিয়াছে। কামিনীর সহিত এক শয্যায় শায়িত হইয়া—তাহার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া—তাহার ভুবন ভুলান রূপের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—তাহার মনোহর অধরপ্রান্তে মুগ্ধকরী হাস্যছটা দেখিয়া তোমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ক্ষমতা পর্য্যন্ত গিয়াছে কি?

তুমি যখন প্রথম এ কালশয্যায় শয়ন করিয়াছিলে তখনকার কথা মনে হয় কি? তখন ত তোমার সহচরী ছিল না। দিন দিন তোমার যত ঘুমের ঘোর বাড়িতে লাগিল—স্বপনে যত নূতন দেখিতে লাগিলে ততই তোমার স্পৃহা বাড়িতে লাগিল—'আরও ঘুমাই আরও স্বপন দেখি'। কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ, কি করিতেছ, এ কাল নিশি পোহাইলে কোথায় যাইতে হইবে তাহা কিছু ভাবিলে না, দেখিতে দেখিতে নূতন নূতন স্বপনে মাতিলে, অবিরত

নূতনে ভুলিয়া দেখিতে দেখিতে এক দিন "কামনা" তোমার চক্ষে পড়িল—বড় মোহিনী মূর্ত্তি—যাহার চক্ষে একবার পড়ে সে মোহিনীর সর্ব্বজনমনোমুগ্ধকর রূপমোহে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না—তুমিও সেই মোহে পতিত হইলে। কামনাকে কালশয়নে সহচরী করিয়া লইলে, এখন মোহের বাঁধন কাটা দূরে থাকুক "কামনার" সংস্রব—"কামনার" স্পর্শ পর্য্যন্ত পরিত্যাগের ক্ষমতা তোমার নাই। "কামনা" সদাই এখন তোমার সহচারিণী, এই "কামনার" স্পর্শ সুখানুভবের স্পৃহা, দর্শনানন্দ অনুভবের লালসা একবার পরিবর্জ্জন কর—তাহার কোমল বাহুলতার দুশ্ছেদ্য বন্ধন একবার ছেদন কর—অত মোহিত হইও না, অঙ্কশায়িনী প্রিয়তমা কান্তা "কামনার" প্রতি বিমুখ হইয়া একবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন কর দেখি!

"আশার চাদর দিয়েছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খোল না"

সংসার চক্রের ঘূর্ণনে যথেষ্ট ঘূর্ণিত হইয়াছ—সুখস্বপনের আবেশভরে কামনার বিশ্ববিমোহিনী রূপ মধুরিমায় তুমি যার পর নাই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছ; এ বিহ্বলতা অপনোদনের চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তুমি আবার তৎসঙ্গে আর এক কুহকিনীর মুগ্ধকরী ছলনা বলে আপাদমস্তক কুহক-বিজড়িত হইয়া অধিকতর মত্ত হইয়াছ। যাদুকরী আশার আবরণ-বসনে আবৃত হইয়া সংসারের যথার্থ অবস্থা—তোমার আপন প্রকৃত ভাব দেখিতে তুমি এক্ষণে অক্ষম। এই কুহকে পড়িয়া তোমার এত আড়ম্বর—অনন্ত কাল মধ্যে এতটুকু মাত্র সময় পাইয়া এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর সামান্য স্থান দখল করিয়াও তোমার এত অস্ফালন, এত বাহার, এত জোর; এই আশাকুহকিনীর যাদু বিদ্যার এমনই বল—কুহকের এমনই মায়া মাখান ভাব—এমনই ছলনকৌশল—যে তোমাকে তিলেকের জন্য চক্ষুরুন্মীলন করিতে দিতেছে না, তুমি যে বাহ্য জগতের ভাবগতি দেখিয়া তোমার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবে তোমায় সে অবকাশ টুকুও দিবে না—তোমার সে ক্ষমতা টুকু অপহরণ করিয়াছে।

মায়াবিনীর ঘোর মায়াবশে বশীভূত হইয়া তুমি আপনার লইয়াই ব্যস্ত। কত আকাশকুসুম তোমার নয়নসমক্ষে সমুদ্ভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট

হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তার অপার সৃজনলীলা মধ্যে অপরিগণনীয় সামান্য জীবরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াও তুমি কত অসাধ্য সাধনের উদ্যোগ করিতেছ। তুমি তোমার এই সমগ্র নশ্বর জীবনে যত টুকু কাল অধিকার করিতে পারিয়াছ তাহার লক্ষগুণ অধিক কাল সংসার সাগরে বুদ্‌বুদ্‌ স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিলেও যে কার্য্য তোমার পক্ষে অতীব দুঃসাধ্য, আজ আশা কুহকিনীর প্রবল কুহকবলে—মায়াবিনীর অদ্ভুত ছলনার কৌশলে তাহা তোমার নিকট নিতান্তই নিমেষসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই মায়িক আবরণে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত রাখিতে তোমার যেন সাধ বাড়িতেছে—মুখের এ অবগুণ্ঠন, নয়নের এ কুহকমাখান আচ্ছাদন উন্মোচন করিতে তোমার কোন মতে প্রবৃত্তি জন্মিতেছেনা—এ মায়াবরণের মধ্য হইতে সকলই অতি সুন্দর, নিতান্ত মনোহর বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ—তাই তোমার মুখ খুলিতে ইচ্ছা করে না।

" আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে " * * *

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর আসিতেছে, যুগের পর যুগান্ত সংঘটিত হইতেছে তথাপি তোমার এ ছাই কুহকের ঘোর বিন্দুমাত্র অপনোদিত হই-তেছে না—চিরদিনই সমান ভাবে প্রতি নিয়ত সেই মায়ার বশে মোহিত হইয়া রহিয়াছ। সুখের শীতে সে "আশা"-আবরণে আবৃত হইয়া উত্তাপানুভবে পরম সন্তোষ সম্ভোগ করিয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের এ ঘোর গ্রীষ্মেও মিছা কুহকের আচ্ছাদন রাখিয়া আর কেন বাহ্যিক গ্রীষ্ম পরিবর্দ্ধিত করিতেছ ? কেন ও সন্তপ্ত হৃদয় অধিকতর উত্তপ্ত করিতেছ ? একবার মোহকরী ছলনার এ আচ্ছাদনবসন উন্মোচন কর "আশার" গাত্রাবরণ হইতে একবার মোহের মলা ধৌত কর দেখি !! তোমার সে ক্ষমতা আছে কি ? আর কিরূপে থাকিবে, যাহা ছিল তাহা ত একে তুমি মায়াবিনীদিগের প্রবল কুহকে সকলই হারা-ইয়াছ—তাহার উপর আবার একি !!

" খেয়েছ বিষয় মদ সে মদের কি ঘোর ঘোচে না
আছ দিবানিশি মাতাল হয়ে" * * *

তোমার মোহের কি কিছু বাকী ছিল ? তোমার বিহ্বলতা কি পূর্ণ মাত্রায়

পরিপূরিত হয় নাই? তোমার জড়তার কতটুকু অবশিষ্ট ছিল? মত্ততার মাত্রা ত কালে কালে পুরিয়াছে তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা।

ভবের গাছে নিয়ত পাক খাইতে খাইতে তোমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতেছে, হস্তপদাদি অবশ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে "কামনার" রূপের মোহ মিলিত হইয়া তোমাকে কতদূর মোহিত ও সংসারে জড়ীভূত করিয়াছে। তৎসঙ্গে আবার আশাকুহকিনীর ছলনাবলে তোমার মোহের ত কিছুই বাকী নাই, তুমি পূর্ণ মাত্রায় মুগ্ধ, তোমার আত্মভাবপর্য্যবেক্ষণ ও বাহ্য জগতের প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শনের ক্ষমতা ত গিয়াছে—তাহার উপর আরও মাতিবার ইচ্ছা! যদি মাতিবার এত বাসনা হইয়াছিল, যদি উন্মত্ততাই তোমার পক্ষে এত সুখকর—এত আনন্দদায়ক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তবে এ সংসারে—এ ভবের বাজারে আর কি অন্য মাদক ছিল না? এ তীব্র গরল সম "বিষয়" মদ্য পান করিলে কেন? ইহার মাদকতা কি এ জীবনে কখন দূরীভূত হইবে?

"আশার" মোহে তুমি বাহ্যজ্ঞানরহিত—যে কিছু আন্তরিক বিবেচনা শক্তি ছিল, তাহাও এই নেশার ঘোরে নষ্ট করিলে—তুমি যে হিতাহিতজ্ঞান-বর্জ্জিত হইয়াছ। "বিষয়" মদের নেশার জোরে ভাবিতেছ তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান—তুমিই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানবান—তুমিই শ্রেষ্ঠ বিবেচক—আজ যেন এ বিশ্ব সংসার তোমারই করতলস্থ—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আজ তোমার চক্ষে ক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডবৎ পরিদৃশ্যমান! তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাহারও প্রতি দৃক্‌পাত নাই—আজ তুমি স্নেহশীল সহোদরের সহিত ঘোর কলহে প্রবৃত্ত—তুমি আজ বিষম স্বার্থপর! তোমার আজ জন্মদাতা অন্নদাতা প্রতি-পালক পিতাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য নাই—তুমি আজ চরম অকৃতজ্ঞ—পরম দুরাচার! কেন এ বিষম বিষয়-মদ্য পান করিলে? এ নেশা যে কখন ছুটিবে না—দিন দিন বাড়িতেছে—আরও বাড়িবে। তুমি দিবারাত্রি সমান উন্মত্ত—অভি-ভাবকের প্রতি সম্মান নাই—ভ্রাতা ভগিনীর নিকট কুণ্ঠা নাই—আত্মীয় স্বজনের নিকট লজ্জা নাই—প্রতিবাসীজনের নিকট অপবাদভয় নাই— নেশা দিবারাত্রি সমান—বার মাস সমান ভাবে চলিয়াছে। তাহার উপর আবার মাত্রা বাড়াইতে পারিলে ছাড়না! মিনতি করি! আর মাত্রা বাড়াইয়া কাজ নাই, আর কেন? এততেও কি আশা মিটিলনা—কাল যে ফুরায়—

* "অতি মূঢ় প্রসাদ রে তুই ঘুমায়ে আশা পুরে না,
তোর ঘুমে মহাঘুম আসিবে ডাক্‌লে আর চেতন পাবে না।"

ভাই, এত ঘুমাইলে, এত কুহকে জড়াইলে, এত নেশা করিলে, এত ঘুমের ঘোর বাড়াইলে, তথাপি কি ছাই এ আশা পূরিলনা? যদি আশা না পূরিয়া থাকে, তবে ভব-সাগরে এ বর্ত্তমান জলবুদ্বুদলীলায় তোমার আর আশা পূরিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার জন্য একটি দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, সে দিন যে কোন্ দিন আসিবে, তাহা তুমি ত ঠিক জান না; তবে একবার ভাবিয়া দেখ না কেন সে দিন সদাই নিকটবর্ত্তী! আজ তুমি ঘুমের ঘোরে বিভোর, নেশার জোরে অচেতন, কিন্তু তোমাকে ডাকিয়া সাড়া পাইয়া কত কথা বলিয়া প্রাণের ভার লাঘব করিতেছি, সে দিন ত তোমার আর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে যে মহাঘুম—সে ঘুম ত কোন মতে ভাঙ্গাইতে পারিব না, সেই ঘুমে তোমার সব সাধের ঘুম—সকল মনোহর স্বপন, মিশাইয়া যাইবে। এ সুখ-স্বপনে যাদের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়াছিলে সে পিতামাতা, ভাই-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন সবাই তোমা হইতে সে দিন বিচ্ছিন্ন হইবে। সেই দিন অঙ্কশায়িনী প্রাণাধিকা কান্তা কামনার বাহুবেষ্টন তোমার কণ্ঠ হইতে সজোরে মোচন করিয়া লইবে। আশার এত মোহের আবরণ, এত যে ভুবন-ভুলান ছলনার আচ্ছাদন—সেই দিন তোমার অঙ্গ হইতে উন্মোচিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে। এ বিষয়মদের পানপাত্র যেমন তেমনি পড়িয়া থাকিবে। এ সাধের স্বপনের শেষ সেই খানে—তার পর সে মহাঘুমে আর কি স্বপন দেখিবে বলিতে পারি না—তাই বলিতেছি যে তোমায় লইয়া এত খেলা খেলাইতেছে, কত সামগ্রী আনিয়া কত বিধানে কত রকম রকম খেলা দেখাইতেছে, খেলিতে খেলিতে একবার সেই খেলানাওয়ালার সন্ধান কর দেখি, তাহাকে ডাক দেখি! সেই সব জানে, সেই সব করিতেছে, তাই বলিতেছি একবার সেই সবজান্তাকে ডাক-না ভাই!!

শ্রীষষ্ঠীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহাশক্তি।

এক্ষণে এই শক্তির মূল সংস্কল্প কি প্রকারে শিক্ষা করিতে হয় তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিব। প্রথমতঃ মনঃসংযোগ শিক্ষা করিতে হইলে দৃঢ় শক্তির (energy) আবশ্যক। এই মনঃসংযোগে মানসিক দৃঢ়তা জন্মায়, দূরদৃষ্টি জন্মায়, স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়। এই মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা আমরা নানাবিধ আবশ্যকীয় কাজ করিতে সমর্থ হই। এটী সপ্রমাণ করিতে বেশী দূর যাইতে হইবে না। আমরা দেখিতে পাই কত মহাত্মা পুরুষ এই অপূর্ব্ব মানসিক দৃঢ়তা দ্বারা কত অসামান্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। আজ Sir Wm. Thomson প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ এই মনঃসংযোগ দ্বারা পার্থিব বিষয়ে কত উন্নতি করিয়াছেন, আজ তাঁহারই মনঃসংযোগের বলে তারযন্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। Stephenson ও watt এর মনঃসংযোগ দ্বারা বাষ্পীয় যানের কত সুবিধা হইয়াছে। এগুলি অলৌকিক না হইলেও অসামান্য বলিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এ কথা কি একবার কেহ ভাবিয়াছেন যে এ গুলি কেবল এই শক্তির বাহ্যিক প্রয়োগ মাত্র ? এ কথা কি কেহ একবার মনে করিয়াছেন যে এ শক্তির আন্তরিক প্রয়োগে আরও কত অসামান্য কাজ করা যাইতে পারে ? শরীরের কার্য্যপ্রণালীর সহিত মনের কার্য্যপ্রণালীর তুলনা যেরূপ অসাধারণ, পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাবলীর সহিত শেষোক্ত গুলির সম্বন্ধও তদ্রূপ। তবে কেন বিশ্বাস করিব না যে কোন গূঢ় প্রণালী দ্বারা আমাদের ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই শক্তি মনের উপর প্রয়োগ করিয়া কত অলৌকিক ব্যাপার সংসাধিত করিয়া গিয়াছেন ?

তবেই সেই শক্তিটী প্রথমতঃ মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎকে ও দ্বিতীয়তঃ শরীর বা বাহজগৎ ও মানুষের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যকে শাসন করিতেছে। সুতরাং যখন এই মন অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও ক্রিয়া বা বাহজগৎ এ উভয়ের একত্র সমাবেশই অদৃষ্ট, তখন অদৃষ্টটাও কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যাধীন বলিতে হইবে। অদৃষ্ট বলিলেই কিছু আর "ঢেউ দেখে না ডুবান" গোছের কোন অমানুষিক কথা বুঝায় না—ইহাতেও মানুষের বেশ হাত আছে। ইহাকেও ইচ্ছা

করিলে এড়াইতে পারা যায়। তবে যাহার কারণ আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য তাহাই 'অদৃষ্ট'।

একটী কুকুরকে বহু দিবস বাঁধিয়া রাখিয়া পরে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহার এক প্রকার আশ্চর্য্য বিক্রম অনুভব করিতে পারা যায়। কুকুরটি যতদিন তাহার স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই তত দিন তাহার শক্তি তাহার শরীরে নিহিত ছিল। এক্ষণে স্বাধীনাবস্থায় সেই শক্তির স্ফুরণ দৃষ্ট হয়। তদ্রূপ মানুষ যদ্যপি বৃথা আমোদে, বৃথা উল্লাসে, সময় ক্ষেপণ না করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা করে তাহা হইলে পরিশেষে কোন প্রকৃত মহান্ বিষয়ে তাহার চিন্তাশক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে সমস্ত রিপুগণকে ঐ শক্তি দ্বারা বশে রাখিয়া যদি শুদ্ধ মনঃসংযোগ অভ্যাস করা যায় তাহা হইলে একটি প্রকৃত বীরের ও জিতেন্দ্রিয়ের ন্যায় কার্য্য করা হয়। তাই কি বলে The greatest conqueror is he who conquers himself? এই মনঃসংযোগ শিক্ষাকালে অন্যান্য সুফলদায়িনী শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়, রিপুগণকে দমন করিয়া রাখিতে হয়, উৎকট বাসনাগুলি পরিত্যাগ করিতে হয়। এইরূপে ঐ শক্তির রূপান্তর দৃঢ় সংকল্পরূপে পরিণত হইয়া হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব তেজের বা শক্তির বিকাশ করে। এই শক্তির বল, রিপুগণকে বশে রাখিবার বলের অনুরূপ (equivalent) বা সমান। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ এই রূপ ইন্দ্রিয়াদি দমন শিক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের সঙ্কল্পবল এত অসামান্য ছিল—আজকাল ইন্দ্রিয় দোষটাই সেই ব্রহ্মতেজঃ হ্রাসের এক মাত্র কারণ।

সাংসারিক নানাবিধ জঞ্জালে মনঃসংযোগ ব্যাপার বড় দুরূহ; আমাদের এক্ষণে সামান্য অবমাননা সহ্য হয় না, গাত্রের জ্বালা সহজে নিবারণ হইতে চায় না, সর্ব্বদাই মন উৎকট বাসনায় মগ্ন। প্রথম মুহূর্ত্তে অন্নচিন্তা, দ্বিতীয়ে কন্যাভার, তৃতীয়ে রোগ, চতুর্থে বৃথা আশা ইত্যাদি নানা কারণে মন কদাচ সুস্থির নয়। বিষয়ান্বেষণে কেবলই রত, অহঙ্কারে কেবলই মত্ত, অতএব মনের স্থিরতা বা দৃঢ়তা কোথায়? ইন্দ্রিয়গণের লালায়িততা সহজে পরিতৃপ্ত হয় না, উপভোগের দ্বারা কামবৃত্তি দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠে, কারণ সুখের উপর মন আবার সুখ চায়। এই রূপ নানা কারণে চিত্তের স্থৈর্য্য বিকলিত হয়,

ধারণাশক্তির হ্রাস হয়, সঙ্কল্পশক্তি জন্মাইতে পায় না। আজ কাল এই সকল গুলির শক্তি একত্রে ও একসূত্রে মনকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে—ইহা হইতে আর পুনরুত্থান অসম্ভব। যেরূপ বাহ্যিক ইচ্ছাপ্রকাশে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেইরূপ কপট ভক্তিতেও কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব—সেই জন্য মনের নির্ম্মলতা অগ্রে আবশ্যক।

আজ কাল থিওসফিষ্ট বলিয়া যে একটা সম্প্রদায় দেখা যায়, তাহাদের ধর্ম্মের মূলে এই মহতী শক্তি নিহিত আছে; তাহাদের সমস্ত কার্য্য দৃঢ়সঙ্কল্পদ্বারা সাধিত হয়। এই জন্যই তাহাদের মধ্যে আর্য্যঋষিগণের ন্যায় শুচি ও পবিত্রভাবের এত আদর। তাহারা প্রথমতঃ মানসিক বিকৃতি হইতে শুদ্ধাচার দ্বারা পবিত্রতা ও স্থৈর্য্যলাভ করে; পরে ক্রমশঃ মনঃসংযোগ অভ্যাস করিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প লাভ করিয়া থাকে। এই সঙ্কল্প দ্বারা তাহারা গত আত্মার সাহায্যে নানা প্রকার অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। এই জন্যই আমরা থিওসফিষ্টগণকে একেবারে ভ্রান্ত বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। তাহাদের মূলসূত্র যখন দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তখন তাহাদের কার্য্যকলাপ একবারে উপহাস্য কখনই হইতে পারে না—তবে যাঁহারা চক্ষুরতীত কিছুই বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র কথা। আমরা কোন কোন আশ্চর্য্য বিষয় বিশ্বাস করি না। সাধারণতঃ যাহা অনুভব করিতে পারি তাহাই বিশ্বাস করিয়া থাকি। জগতে একেবারে অসম্ভব কিছুই হইতে পারে না। আমরা শূন্যমার্গে হস্তী বিচরণ, মধ্যাহ্নে চন্দ্রোদয় অনুভব করিতে পারি, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারি না। দুইটী সমান রেখা দ্বারা একখণ্ড জমী বেষ্টন অনুভব করিতেও পারি না, বিশ্বাস করিতেও পারি না। সেক্ষপীরের গল্পে যে একজাতীয় লোক আছে, তাহাদের মস্তক স্কন্ধের নিম্নদিকে, এটী অনুভব করিতে পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারি না—আবার একটী ক্ষুদ্র কীটের দংশনে একটী বৃহৎ হস্তী হত হইয়াছে এটী অনুভব করিতেও পারি, বিশ্বাসও করিতে পারি। তাই আমরা বলিয়াছি 'সাধারণতঃ' আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহা অনুভাব্য। আমরা এটি বিশ্বাস করি না ওটি বিশ্বাস করি না ইহার কারণ কিছুই নাই—কেবল মনের অবস্থান্তর মাত্র। সেই জন্য যিনি সর্ব্বকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করেন না, তাঁহাকে বুঝাইয়া বিশ্বাস

করান যায় না—বিশ্বাস কতকটা স্বাভাবিক। আমরা যেমন কতক অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করিতে পারি—কতক পারি না, কেন পারি না তাহার হেতু নাই, তদ্রূপ কেহ এটি বিশ্বাস করেন না, কেহ ওটি বিশ্বাস করেন না তাহাতে কিছু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। কিন্তু আমাদের মতে যতদূর পারা যায় সকলেরই বিশ্বাসটা দৃঢ় থাকা ভাল; ইহাতে অনেক বহুদর্শিতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি জন্মায়। বিশেষতঃ ভাল মন্দ বিচারে ইহা একটী প্রধান সহায়। তবে জোর করিয়া কাহারও মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না।

(৮) ইংরাজী ভাষায় একটী কথা আছে "The dawn of a very brilliant life is involved in some obscurity".—এটি কি সত্য? বলিতে পারি না ইহা কিরূপে প্রমাণ করিব; কিন্তু ইহার অনুকূলে অনেকগুলি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বীরবর Achilles কে, জন্মগ্রহণ কালে, দুইপ্রকার জীবনের মধ্যে একটি মনোনীত করিতে বলা হইয়াছিল (১)A long but inglorious life—সাধারণ দীর্ঘজীবন (২) A short but gloriuos life. প্রতিষ্ঠাবন্ত ক্ষুদ্রজীবন। দেবতাদিগের এরূপ বাক্য আমাদিগের মনে হঠাৎ গিয়া বাজিল। আমরা বুঝিলাম, বুঝি বা একটি আর একটির বিপরীত। পরে দেখিলাম বাস্তবিকই তাই। দেখিলাম প্রতিভাশালী লোক বেশী দিন জীবিত থাকে না, ফুলটি কোরক অবস্থাতেই কীটদষ্ট হয়; ঈশ্বরও রমণীয় জিনিসটির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। দেখিলাম যাঁহাদের জীবনের কৃতিত্ব অতি সত্বরেই লব্ধ হয় তাঁহাদের জীবন অতি অল্পস্থায়ী। আর যাঁহাদের প্রতিষ্ঠালাভ কিছুদিন পরে হয়, কিম্বা ধীরে ধীরে হয়, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইলেও হইতে পারেন। তাহার কারণ—যে সীমাবদ্ধ শক্তিটি একটি জীবনকে গঠিত করিবে বলিয়া প্রেরিত হইয়াছিল তাহার কার্য্য শীঘ্র সম্পাদন করিয়া সেটি হ্রস্ব ও শিথিল হইয়া পড়ে সুতরাং তাহার জীবনের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। আর যাঁহার জীবনে ঐ শক্তিটি ধীরে ধীরে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য করে তাঁহার জীবন কিছু বেশী হইতে দেখা যায়। এই জন্যই warren Hastings, wellington, প্রভৃতি যাঁহাদের জীবনের পূর্ব্বভাগ সামান্য ঘটনাপূর্ণ ছিল, তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী দেখা যায়; আর Shelley, Keats প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা একেবারে উল্কার ন্যায় জ্বলিয়া একেবারে

নির্ব্বাপিত হইল। যে লোক প্রকৃত প্রতিষ্ঠাশালী হইতে চান, তাঁহাকে নিরন্তর ধীরে ধীরে, নিরহঙ্কারে, বিনা মদে কার্য্য করিতে হইবে। লম্ফ দিয়া প্রতিষ্ঠা ধরিতে গেলে তাহা বেশীক্ষণ হাতে থাকে না—(He who grasps too much holds little)। যিনি অবিনশ্বর প্রতিষ্ঠালাভ কামনা করেন তাঁহাকে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে চলিতে হয়, যিনি একেবারে কোন বিষয়ে জগতের নিকট বড় হইতে চান তিনি অহঙ্কার গর্ব্ব সবই করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের মন্তব্য বা বক্তব্য কিছুই নাই। তাই আমরা পরামর্শ দিতেছি হঠাৎ যেন কেহ 'বড়লোক' হইতে চেষ্টা বা আশা না করেন। ধৈর্য্য ও বিশ্বাস থাকিলে অবশ্যই পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ইহাই আমাদের স্থির ও অবিচলিত বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি প্রভৃতি অন্যান্য গুণ থাকিলে সোণায় সোহাগা হইয়া উঠিল। যাঁহারা আমাদের কথায় বিশ্বাস বা আস্থা দেখাইবেন না, তাঁহাদিগকে বলিবার আমাদের বেশী কিছুই নাই। তবে আমরা বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিলাম বলিয়া আমাদের মনে বিশ্বাস আছে যে অনেকেই এ যুক্তিগুলি সহজে অবহেলা করিতে পারিবেন না। যাঁহারা আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রকে শিরোধার্য্য করেন, যাঁহারা Huxley, Tyndall, Spencerএর প্রিয় শিষ্য তাঁহারা অবশ্যই আমাদের বাক্যগুলি একেবারে Stuff and nonsense বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিবেন না—তবে অবজ্ঞা (indiffrence) একটা স্বতন্ত্র জিনিস, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ হয় না, সুতরাং জয়াশা বৃথা।

রিপুর বশীভূত হইলে লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে কেন? রিপুর অধীনতাবশতঃ যে বাহিক অঙ্গবৈকল্য ও অঙ্গশৈথিল্য উপস্থিত হয় তাহাতে কতকটা চিৎশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং তাহার কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। সময় কিম্বা অন্য কোন বাহিক শক্তি ব্যতীত এই নষ্টশক্তির পূরণ হয় না। এই রিপুযুদ্ধের অব্যবহিত পরে অন্যান্য কার্য্যে আর সমধিক শক্তি পাওয়া যায় না। যাহার যত বেশী রিপুপরতন্ত্রতা ও রিপুপ্রাবল্য তাহার কার্য্যক্ষতি তত বেশী। এই হেতুই অবিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করিলে অনেকে প্রায়ই ভ্রমপণ্ডতানিবন্ধন অমনোযোগিতা অথবা অবিমৃশ্যকারিতার জন্য অনুতাপ করিয়া থাকেন। আমাদের যাবতীয় কার্য্যেই, ধীরতা, স্থিরতা ও মনঃসংযোগ আবশ্যক, ইহার

উপর ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিলে আরও অধিক উপকার হইবার সম্ভাবনা। সকল কার্য্যেই শান্তভাব (Temperence) থাকিলে আমরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারি। Temperence শিখিতে বিশিষ্ট শক্তির আবশ্যক, কারণ ইহার মূল ধৈর্য্য, ধৈর্য্যের মূল শক্তিপ্রয়োগ। শক্তিই সুখের মূল, শক্তিই সন্তোষের মূল, শক্তিই জয়লাভের মূল। Temperence থাকিলে উচ্চ আশা হয় না, মদ মাৎসর্য্য থাকে না, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় না, সংশয় থাকে না—বাস্তবিক যে গুলি স্থির সুখের উপকরণ সেই গুলিই অবিকৃত থাকে। তাই Bain এর মুখে Plato বলিয়াছেন "The conditions of happiness are not wealth and power but justice and temperence"। সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিতাবস্থায় মনস্থির রাখিতে যত শক্তির প্রয়োজন তত আর কিছুতেই নয়—এই মনঃস্থৈর্য্য কালে মন একপ্রকার অপূর্ব্ব শক্তি দ্বারা আবেশপ্রাপ্ত হয়—সেই শক্তির পরিণতাবস্থায় যে স্ফূর্ত্তি তাহাই আনন্দ—তাহাই বিশুদ্ধ ও বিমল আনন্দ। এই কারণ বশতঃ আমরা অশিষ্টাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিলে এক প্রকার মানসিক আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। সে আনন্দটুকু আমাদের নিজের সম্পত্তি—অন্য লোকের নয়। আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিয়াও পরের এই রূপ আনন্দ আমরা নিজে অনুভব করিতে অসমর্থ হই। কারণ যে শক্তিটি অবস্থাবিশেষে তাহাকে চালিত করিতেছে সেটি আমাকে ঠিক সেই অবস্থায় চালিত করিতেছে না। এই হইতেই সহানুভূতির সৃষ্টি—কারণ সহানুভূতির কারণ ও অবস্থা এক। সেই জন্যই দেশভেদে, জাতিভেদে, বিদ্বেষ দৃষ্ট হইলেও সহানুভূতি বিজাতীয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত প্রবল। এক্ষণে আমরা দেখাইলাম কিরূপে ক্রোধসংবরণাদি কাজে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ও কি কারণে আমরা অন্যের দোষে সাধারণতঃ অন্ধ হইয়াই থাকি।

তিন খানি ছবি।

(১)

প্রলয় পবনে উড়িছে গগন
ওড়ে রবি শশী তারা,
উড়িছে ভূধর ওড়ে মহাসিন্ধু
ওড়ে হ্রদ নদীধারা ;
রাজ্য মহারাজ্য পশু পক্ষী কীট
মানব মানবী ওড়ে,
উড়িছে ধরণী উড়িছে জগৎ
ব্যোম অন্তঃ শূন্য ক'রে।
মহাশূন্য পারে দাঁড়া'য়ে রমণী
বদনে করুণা ঝরে,
প্রসারিয়া বাহু আকুল জগতে
হৃদয় মাঝারে ধরে।
ছায়াময় হ'য়ে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড
সে হৃদয়ে হয় লীন,
অন্য প্রান্ত হ'তে হেরে যুবা তাঁয়
নয়ন পলক-হীন।

---

(২)

সাগর হৃদয়ে তরঙ্গ ভেদিয়া
উঠিছে রমণী ধীরে,
চৌদিকে তাঁহার উত্তাল তরঙ্গ
বিস্ময়ে পশ্চাত ফেরে।
দুই পার্শ্বে দুই ভুজ প্রসারিয়া
পরশি তরঙ্গদ্বয়,

অপূর্ব্ব কিরণে বিভাসিয়া সিন্ধু
রমণী উদয় হয়;
নিবিড় চিকুর পড়েছে ছড়া'য়ে
প্রসারি সুদূর জলে,
উন্নত উরস করিয়া পরশ
সাগর-হৃদয় টলে;
রবি শশী তারা গ্রহ অগণন
দাঁড়ায়ে আকাশময়,
বিস্ময়ে পূরিয়া অনন্ত জগৎ
রমণী উদয় হয়।

---

(৩)

(Ovid's) metamorphose এর অনুকরণ)

দাঁড়ায়ে রমণী অনাবৃত দেহ
উর্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
অর্দ্ধ ভুজ দ্বয় শাখায় পল্লবে
ঝাউ বৃক্ষে পরিণত;
স্খলিত চিকুর উর্দ্ধে প্রসারিত
অর্দ্ধভাগ তরুকায়,
লজ্জা—বিভীষিকা— বিস্ময়—যন্ত্রণা
নেত্রে ফুটি বাহিরায়;
প্রফুল্ল উরস মর্ম্মর আকারে
হইতেছে পরিণত,
কটি বস্তি উরু জানু জঙ্ঘা পদ
ক্রমে ক্রমে শৈল মত।
সম্মুখে যুবক বিস্মিত নয়নে
সেই রূপান্তর হেরে,

না পারে ধরিতে না পারে সবিতে
দুই নেত্রে অশ্রু ঝরে ;
চিত্রপট-অর্থ দুই ছত্রে লেখা
আলেখ্যের নিম্নদেশে,
" পাষাণীব মত করেছিলে পণ
পাষাণী হইলে শেষে। "

ঈশান।

কাব্যের বর্ণনা।

বর্ণনা অনেক প্রকারের আছে। কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টি যেন প্রতিলিখিত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পড়ে—কোন প্রকার বর্ণনায় বর্ণিতব্য বিষয়টির সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই প্রতিভাসিত হইয়া থাকে—মূল বিষয়টি তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণিত হয় না, আবার কোন প্রকার বর্ণনা বর্ণিত বিষয়টিকে কেবল মাত্র বিবিধ শব্দালঙ্কারে ভূষিত করিয়াই ক্ষান্ত থাকে। এ সকল বর্ণনার একটি বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, স্থানচ্যুত হইলেও ইহাদিগের সৌন্দর্য্য অবিকৃতই থাকে। যেখানে সেখানে ইহার যোজনা করা যায়, যেখানে সেখানে ইহার সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকারের বর্ণনা আছে—সে বর্ণনা উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই প্রায় অন্তর্নিবিষ্ট থাকিয়া উহাকে সমধিক শোভান্বিত করে, নিজেও সমধিক শোভান্বিত হয়। কিন্তু এরূপ বর্ণনা একেবারে স্থানচ্যুত করিলে, ইহার শোভা প্রভূত পরিমাণে হ্রাস হইয়া পড়ে—এরূপ বর্ণনা যেখানে সেখানে সংযোজনা করিতেও পারা যায় না। এরূপ বর্ণনাই প্রকৃত কাব্যের বর্ণনা। অন্যবিধ বর্ণনা যে কাব্যের শোভা সম্পাদন করে না, এরূপ নহে ; তবে সে গুলি ঠিক কাব্যের বর্ণনা নহে —সাধারণ বর্ণনা, শোভা সম্পাদনার্থ কাব্যে স্থান পায় মাত্র। মূল কাব্যের সহিত তাহার কোন সংস্রব নাই।—বলা বাহুল্য যে, আমরা কাব্য শব্দে

কাব্য গ্রন্থই অভিহিত করিলাম—যাহাকে সচরাচর কাব্য বলে, কাব্যের সেই সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইহা ব্যবহার করিলাম।

উপরে যাহাকে কাব্যের বর্ণনা বলা হইল, আজি প্রচারের পাঠকবর্গ সমীপে তাহার ৪টি বর্ণনা উপস্থিত করিলাম। বর্ণনা কয়টি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, তাই সে আনন্দের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইল। যদি পাঠকবর্গের অরুচিকর না হয়, তবে পুস্তকান্তর হইতে এরূপ আরও বর্ণনা উদ্ধার করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

আর একটি কথা না বলিয়া প্রকৃত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায় না। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদিগের ২। ১ মন্তব্য বা ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে, উহা কেবল মাত্র আমাদিগেরই সন্তোষ জন্য—হৃদয়ের আবেগে লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত বর্ণনার শতাংশের একাংশ সৌন্দর্য্যও ঐরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা পরিস্ফুট হইতে পারে না, ও হয় নাই।

(১)

নবকুমারের সঙ্গীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবকুমার সেই লোকালয়শূন্য বালুকাস্তূপশ্রেণী মধ্যে বসিয়া একাকী. ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, তাঁহার জঠর জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। "দুরন্ত শীতনিবারণের জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল-বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। হয় ত রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ভল্লুকে, প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত। এই রূপ চিন্তাকুল হইয়া মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

"ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল ; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন ;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই প্রস্তুত হইল। দৃশ্যটী যেন নবকুমারের অবস্থার

সহিত—নবকুমারের চিন্তার সহিত এক লয়ে বাঁধা। ইহা ত যেন সহজেই পাঠকের মানসপটে সমুদিত করা যায়, কিন্তু "শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল"—ইহা বুঝান আমাদিগের সাধ্যাতীত। কথাগুলি যেন ঠিক সেই আকাশের নক্ষত্রাবলীর ন্যায় নীরবে এই বর্ণনামধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার কোন্ কথা ব্যাখ্যা করিব? 'শিশিরাকাশে'? 'নীরবে'? না, 'ফুটিতে'? ইহার কোন্ ভাব ব্যাখ্যা করিব? সেইরূপ সমুদ্রতীরস্থ নির্জ্জনপরিত্যক্ত আশাশূন্য নবকুমারের নিকট সেই শূন্য প্রদেশের নীরবের নক্ষত্রোদয়? না, সেই নক্ষত্রোদয় দেখিয়া নবকুমারের সেই চিরপরিচিত স্বদেশের নক্ষত্রোদয়ের নীরব স্মৃতি—সেই "যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে তেমনি ফুটিতে লাগিল?" ইহার ব্যাখ্যা? ভাবের ব্যাখ্যা করিব, না, সেই ভাব প্রকাশের অপূর্ব্বশক্তি ব্যাখ্যা করিব? আমরা কিছুই করিব না—কিছুই করিতে পারিব না। এ সঙ্গীত আমরা গাহিতে অক্ষম—তাই কেবলমাত্র সঙ্গীতটির স্বরলিপি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদিগেরই মতন গাহিতে না জানেন, তাঁহারা মৃদুমধুর নিনাদে সেতারঝঙ্কারবৎ এ সঙ্গীতের ধ্বনি মানসকর্ণে উত্থিত করিয়া সুখানুভব করুন। আর যদি কেহ এ সঙ্গীত গাহিতে জানেন, গলা ছাড়িয়া মধুর ভৈরবে ইহার সুস্বররাশি এইরূপ আকাশের দিগন্তে ভাসাইতে পারেন, তাঁহারা সাধ পুরাইয়া তাঁহার সঙ্গীত-ক্ষমতার সার্থকতা লাভ করুন;—আমরা দূর হইতে অনন্যকার্য্য—অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করি; শুনিয়া শুনিয়া সংসারতাপে জর্জ্জরিত এ শ্রান্ত হৃদয়খানিকে একবার সেই নবকুমারের মত তন্দ্রাভিভূত করি। হায়, ইহা কি কেহ গাহিবে না?

২

নবকুমার ফলমূলান্বেষণে এক নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন না। এমন সময়ে,

গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্যে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয়

পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপকৃত বিমলকুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায়; সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্ জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে সময়—পরিমাণ—বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে আশ্রম সন্ধান করিতে হইবে. দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * * গাত্রো-ত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন—"অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার,—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির. অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর-হৃদয়ে ক্রীড়াহীন চন্দ্রকিরণ-লেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশ রাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহু-যুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।

মনোহর দৃশ্যপট। এখানেও আমরা সেই সাগর বর্ণনা, সেই সাগরতীরস্থ সুন্দরী বর্ণনা, সেই একের সৌন্দর্য্যে অপরের সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—

ইহার কিছুই বলিব না। আমরা বলিব সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দণ্ডায়মান কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তির সহিত, নবকুমারের তাৎকালিক হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব লয়ের কথা—সেই অপূর্ব্ব সুর-সংযোজনার কথা। অনন্তবিস্তৃতা নীলবসনা বারিধি দেখিয়া নবকুমারের কাব্যময় হৃদয়ে স্বতঃই একরূপ অস্পষ্ট অজ্ঞাতচরিত্র সুখের মৃদু হিল্লোল প্রবাহিতেছিল। সেই সন্ধ্যালোকের ন্যায় সেই আধভাঙ্গা অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্ন লইয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তদবস্থ দেখিলেন—স্বপ্ন পূর্ণ হইল, অস্পষ্ট স্পষ্ট হইল। সে সুখের সহিত এ সুখ যেন বিনা ওজরে মিশিয়া গেল। সঞ্চিত উপলরাশিবিভক্ত সলিলরাশি যেরূপ উপলোন্মোচনে মিলাইয়া যায়, নবকুমারের সেই সমুদ্র দর্শনজনিত মনোভাব যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষজনিত চিত্তভাবের সহিত মিলাইয়া গেল। নবকুমার এক সমুদ্র পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন,—আর এক সমুদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই তেমনই শোভান্বিত, তেমনই চিত্তমোহকারী, তেমনই চিত্তভাববিশ্লেষী!

(৩)

দৃশ্যটির রেখাপাত মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিব। কপালকুণ্ডলা শ্যামার জন্য ঔষধ আনিতে বনমধ্যে গমন করিতেছেন—উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নিজের স্নিগ্ধ কিরণরাজি নিশীথ জগতের ক্রোড়ে অকাতরে ছড়াইয়া দিতেছে। কি অপূর্ব্ব সুর মিলিল—সেই স্নিগ্ধ রশ্মিময়ী চন্দ্রমাশালিনী মাধবী যামিনীর সহিত কপালকুণ্ডলায় সেই পরোপচিকীর্ষার কি অদ্ভুত মিলন হইল। দেখিয়া দেখিয়া আবার কপালকুণ্ডলার সেই অতীতস্মৃতি কেমন সুন্দরভাবে সুরে মিশিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আবার ঘটনার পীড়নে যখন কপালকুণ্ডলা অন্যরূপ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন—চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইল, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল। ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন সুরে আবার আর একটি সঙ্গীত গীত হইল। ইহার পরে যখন "বিদ্যুতালোকে" কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গণভূমিতে দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকায় পুরুষ—সেই কাপালিক, সুর পঞ্চমে উঠিল। ইহাকেই কাব্যের বর্ণনা বলে।

(৪)

কপালকুণ্ডলা শ্মশানভূমিতে আনীতা হইয়াছেন। পাঠকবর্গ একবার সেই দৃশ্যটি স্মরণ করুন। শ্মশানের কথা বলিতেছি না—শ্মশানে সেই কাপালিকের সেই ভবানীপুজার কথা বলিতেছি না—সেই শ্মশানপথে কিরূপ করিয়া নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, তাহার কথাও বলিতেছি না—সেই নদী আর সেই নদীতীরস্থ সেই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথা বলিতেছি। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "বিশাল তরঙ্গিনীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া বহিয়াছে। চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার কারণ তরঙ্গাভিঘাত জনিত কলকল রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" দম্পতির হৃদয়ের সহিত এই তরঙ্গিনীর কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পান কি? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার হৃদয়েও কি সেই রূপ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চৈত্রবায়ু প্রধাবিত হইতেছিল না? কে বলিবে। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া কপালকুণ্ডলা ভৈরবী আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য যখন পঞ্চভূতের বিষম বন্ধনটিও ছিঁড়িবার কথা ভাবিতেছিলেন ছিঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয়খানি ঐ তরঙ্গিণীর মত বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গময় হইতেছিল না কে বলিবে? যখন নবকুমার আপনার হৃৎপিণ্ড সদৃশ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহস্তে ছেদন করিতে সংকল্প করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, এই চৈত্রবায়ুপ্রক্ষিপ্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তখন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিবে? আবার দেখুন, যখন ধীরেধীরে নবকুমারের চৈতন্য হইতেছিল, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে রমণীসুলভ দয়ার ভাব বিকাশ পাইতেছিল,—সম্মুখস্থ নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। কপালকুণ্ডলা যখন হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে কহিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই,' যখন নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিতেছিলেন 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ—গৃহে চল!' তখন সেই নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইতেছিল। আবার যখন কথা কহিতে কহিতে কপালকুণ্ডলার সেই ভবানীর আজ্ঞা মনে পড়িল, বলিলেন, 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি

মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না' এবং নবকুমার 'না—মৃণ্ময়ি!—না!'
—এই রূপ উচ্চশব্দ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন—'চৈত্র বায়ু বিতাড়িত এক বিশাল নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল; অমনি তট-মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।"—বর্ণনার পরাকাষ্ঠা হইল।

সন্ধ্যায়।

দেবকুমারী ও বিজয়।

দেব। বিজয়, সন্ধ্যা হ'ল যে!—দিন কি তবে ফুরিয়ে এল? সংসারের খেলায় দাঁড়ি প'ড়ল? বিজয়, শৈশবের দিন কি আর ফিরে আসে না? শৈশবে পা, কেমন, কত দ্রুত চলিত। এখন পা আর চলে না কেন? এখন পদে পদে কত বাধা! সংসার, কারাগার।

বি। দেব, গোলাপ ফুট্‌লে পর, তার কাঁটা গুলো ঝরে পড়ে না কেন? এ জ্যোৎস্না-মাখান সুখের গঙ্গায় পূর্ব্বস্মৃতির ভাঁটা কেন? জীবন থাকিতে দিন ফুরাইয়া আসিবে কেন? আর সন্ধ্যা? আজ ত নূতন নয়। প্রতি-দিনই ত সন্ধ্যা আসে-যায়? জগতের সূর্য্য অস্তমান বটে। কিন্তু তোমার সূর্য্য, তোমার জগতের সন্ধ্যায় এখন ত অস্ত যায় নাই। সে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া জাগিয়া আছে। (আপনার মনে) এত দিনের পর আজ এ চিন্তা কেন? সুখের আকাশে দুরাশা-স্বপ্নের ছায়া কেন?

দেব। (উদাস নয়নে) না বিজয়, দেরী আর নাই!—যাবার সময়ের আহ্বান চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। (হায় পুরুষ! তুমি কি অন্ধ! নারীর মন কিছু বোঝ না। নারী-জীবনের রহস্য, তোমাদের চোখে চির-অন্ধকারই রহিয়া গেল!)

বি। কি বল্‌চ তুমি? আমি ত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে? কাল বুঝি

কথাগুলো মুখস্থ করেছিলে? দেখ, সন্ধ্যা আমার বড় ভাল লাগে। সন্ধ্যার গীতোচ্ছ্বাস বড় মর্ম্মস্পর্শী। সন্ধ্যার কবিতা সকলে পড়িতে পারে না। তাহা বড় গভীর—জগৎব্যাপী, জগতাতীত। তাহা জগতের স্তরে স্তরে প্রচ্ছন্ন। সন্ধ্যায় অনন্তের খেলা। সন্ধ্যায় তারা ফুটে, চাঁদ হাসে, প্রকৃতি জাগে। স্বপ্নেরা আনাগোনা করে। ফুলেরা সাড়া দেয়। সন্ধ্যায় প্রকৃতি কথা কয়। সন্ধ্যা প্রকৃতির সচেতন ধর্ম্ম। সন্ধ্যায় প্রকৃতির কাজের আবর্ত্ত। প্রকৃতি, দিবসে মানুষের। সন্ধ্যায় মানুষ প্রকৃতির। দিবসে আপনাকে চিনা যায় না, বুঝা যায় না। সন্ধ্যায় আপনাকে চিনিতে পারি, বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি এই বিরাট অসীম প্রকৃতির কাছে আমরা মানব, কত—কত ক্ষুদ্র। দিবসে আপনাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া মনে করি। সন্ধ্যায় তাহার ঠিক বিপরীত দেখি। দেখি, আমরা প্রকৃতির কৃপার পাত্র, ক্রীড়নক। দিবসে আমরা বাহ্য কাজে রত থাকি। তখন যা-কিছু করি, তাহা কেবল বাহ্যজগৎ লইয়া। অর্থাৎ তাহা বাহ্যজগৎ সম্বন্ধীয়। তখন গৃহই সর্ব্বে সর্ব্বা, জগৎ হইয়া উঠে। আর সন্ধ্যায় আমরা আধ্যাত্মিক মর্ত্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া যে, অতি-জগৎ রহিয়াছে, সেই জগতে তখন প্রবেশ করি। অসীমে ব্যাপ্ত হই। একে-অসংখ্য হই। এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে গৃহরূপে দেখি। দিবসে আমরা মানুষ। সন্ধ্যায়, দেবতা। এমন চিরযৌবনা সন্ধ্যায়, এই অসীম সসীমের মিলনের মুখে, তুমি অসুখী হচ্ছ? যাহারা আধ্যাত্মিক অনুশীলনে জীবন অর্পণ করেছে, তাহাদের সন্ধ্যা ভাল লাগে না? আশ্চর্য্য! যতদিন মানুষ, প্রকৃতিকে না বুঝিতে পারিবে, প্রকৃতির সহিত সমান ভাবে না মিশিতে পারিবে, ততদিন মানুষ, মানুষের শিক্ষা, অসম্পূর্ণ। মানুষ, অস-ম্পূর্ণ। প্রকৃতিকে লইয়া সে পূর্ণ। জগতে কবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন? প্রকৃতির নাড়ীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে বলিয়া। প্রকৃতির প্রেমে প্রেমিক হইতে পারে বলিয়া। এই প্রকৃতি-ধনে কবি, ধনী-শ্রেষ্ঠ, মহাধনী। জগতের পূজ-নীয়। এই প্রকৃতির তালে চিরদিন নৃত্য করিতে পারে বলিয়াই কবি, অমর। দেবকুমারী, প্রকৃতির জীবন্ত মূর্ত্তি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাবে-গুণে জন্মিয়া, ফুটিয়া, তোমাতে প্রকৃতি-জ্ঞানের অভাব দেখি কেন? প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতির ভাব, বোঝ না কেন?

দেব। বিজয়, আমার জগৎ-বন্ধন, ইহজীবনের সুখের একমাত্র মূল, বল-দেখি, সুখের সুর একঘেয়ে কেন? প্রতিপদক্ষেপে সুখের বৈচিত্র্যহীন কাঁটা পায়ে বিঁধে কেন? সুখে আর সুখ নাই। সুখের সেবা আর ভাল লাগে না। সুখ আমার অস্বাস্থ্যকর হয়েছে। সুখের জন্য সুখ কে চায়? সুখের জন্য সুখ নয়। বাঁচিবার জন্য সুখ। অনন্তকে পাইবার জন্য সুখ। সুখে বাঁচা যায় কৈ? সুখের তরণীতে চাপিয়া, জীবন-সমুদ্র পার হওয়া যায় কৈ? সুখের তরণী বড় ভারী। অনেক যাত্রী এই সুখের তরণীতে চাপিয়া জীবন-সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। পরপারে যাইতে পারে নাই। জীবনের পরপারে সুখের নৌকায় যাওয়া যায় না। তবে সুখ আর কেন? জীবনের পারে আমাকে কে লইয়া যাইবে? সুখের পাপ শিকল যার পায়ে বাঁধা, সে কখন কি অসীমে যাইতে পারে? গৃহের বাহির হইতে পারে? বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে পারে? অসীমের জগত বন্ধনাতীত অবিশ্রাম আহ্বান, সে কি-শুনিতে পায়? বিজয়, এতদিন ধরিয়া তুমি আমায় যাহা শিখাইয়া আসিলে, আজ তুমি নিজে তাহা ভোল কেন? আজও সুখের দিকে এত ঝোঁক কেন? আজও ভোগের আকাঙ্ক্ষা কেন? প্রকৃতির মধ্যে অপার আনন্দ আছে বটে। কিন্তু তাহাতে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা, ভোগের বাসনা, সদা অতৃপ্তিকর ব্যাকুলতা কোথায়? মানবের ভোগ-সুখ-জাত আনন্দের সঙ্গে প্রকৃতিজাত আনন্দের তুলনা হয় কি? যে সুখ তুমি চাও, প্রকৃতি তাহা দেয় না। প্রকৃতির সুখ, বিমল, অনন্ত, পরার্থপর। প্রকৃতির সুখ, কাহাকে ডাকে না, হাসে না, কাঁদে না, মায়ার জাল পাতে না। প্রকৃতির সুখ, দুর্লভ। সকলে তাহা পায় না। যাহারা আত্মার অচেতনতা ঘুচাইতে পারিয়াছে, জড়ে ও আত্মায় বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের শিক্ষা, জগতের অনন্ত ঐক্যের মর্ম্মভেদ করিতে পারে, তাহার মূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, তাহারাই প্রকৃতির সুখ-লাভে সমর্থ। বাসনার ছাই গায়ে না মাখিলে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যগত স্থায়ী সুখ লাভ করা যায় না। বিজয়, স্বামিন, দিন দিন তুমি এত আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ কেন? এত পিছিয়ে পড়্ছ কেন? জীবনের যে এখন সমস্ত পথই বাকি। তুমি একা এ সুদীর্ঘ পথ-চিহ্নহীন-পথ কি করিয়া চিনিয়া যাইবে? কে তোমাকে আলো ধরিবে? আমার অন্ধকারের আলো

তুমি। তোমার অন্ধকারের আলো আমি। পথে দু'আলোরই প্রয়োজন তাহা না হইলে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছান যায় না। পদে পদে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়। যদি বা অতি কষ্টে পৌঁছিলাম, তাহাতে কোন কাজ হ'ল না, কোন ফল ফলিল না। যে পর্য্যন্ত সঙ্গী না আসে ততদিন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সঙ্গী আসিলে তবে কার্য্য আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রী পরস্পরে চিরদিনের সঙ্গী। তাহারা অনন্তকালের জন্য একসুরে বাঁধা। প্রেমের আদর্শ স্বামী-স্ত্রীতে। বাহিরে আমরা দু'জন দেখিতে। ভিতরে দুই এক। এক আত্মা—এক মন—এক ইচ্ছা—এক কার্য্য। প্রাণাধিক, জ্ঞানের ভ্রান্তি আমার, না তোমার ?

বি। দেখ, পৃথিবীতে থাকিতে গেলে সুখ চাই। পৃথিবীতে থাকিয়া মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া, সুখের অনুসন্ধানে বিরত কে ? সুখই এ পৃথিবীর একমাত্র সম্পত্তি। পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ, যে সুখী। সুখের জন্যই মনুষ্য-জন্ম। জগৎকে সুখের ইন্দ্রালয় করাই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সুখের কথা সকলের মুখেই শুনা যায়। সুখের অর্থ অনেকে অনেক রকমে করিয়া থাকে। সুখ কি ? আমি জানি না, ঠিক বুঝি না। সুখের সন্তোষজনক দর্শন শাস্ত্র কোথাও পাওয়া যায় না। আজও উদ্ভূত হয় নাই। তবে ইহা বুঝিতে পারি এবং দেখিতেও পাই যে, বাহ্যজগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ, অন্তর্জগতে তেমনি সুখের আকর্ষণ। দুয়ের আকর্ষণই সমান। প্রতিপদে মানুষকে টানিতেছে। প্রতিপদেই তাহাদের আকর্ষণ বাড়িতেছে। সুখের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। সুখের অনির্বায্য আকর্ষণ হইতে আপনাকে ছাড়ান, দূরে রাখা, বড় কঠিন। মানবের তাহা সাধ্যা-তীত। সুখের সোহাগময় প্রাণ-উদাসী বাঁশী "রাধা রাধা" স্বরে অবিরাম বাজিতেছে। সে রবে পৃথিবী মুগ্ধা, পাগল। মানুষ, চির-বিরহী। বাঁশী কোথা বাজিতেছে, কে বাজাইতেছে, কে জানে ? কিন্তু তাহা "কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিয়া মোর প্রাণ।" সে বাঁশী দেখা যায় না। তাহা দেখিবার নয়। কেবল শুনিবার ও অনুভব করিবার। সেই অনুভূতিময় স্বর্গের সাড়াপাওয়া বাঁশীর ডাকে

চলিয়াছি। কোথায় যাইতেছে, জানিনা। আবার এই সুখই সমাজ-বন্ধন। জগতে একাকী থাকা যায় না। একা থাকিয়া সুখী কে? জগৎকে লইয়া সুখ। পরিবারের সকলকে লইয়া সুখ, সুখের জীবন। সুখী-হইতে গেলে কাহাকেও ছাড়িতে পার না। সুখের নিন্দা করিও না। মানুষ হইয়া সুখের নিন্দা কর কি বলিয়া? বল দেখি, তুমি কি চাও? কিসের জন্য তোমার প্রাণ সদা ব্যাকুল? এই যে আজ তুমি জগতের সকল বস্তুতেই অতৃপ্তি, অপূর্ণতা, অশান্তি অনুভব করিতেছ, তাহার মুল, কারণ জান কি? কি পাচ্চ না? সুখ। তুমি অসুখী। তাই জগতের চারিদিকেই সুখের অভাব দেখিতেছ। তাই জগতের মধ্যে সুখের চির-নূতন চির-তৃপ্তিকর নানারূপময় মধুর প্রেম-গীতি শুনিতে পাইতেছ না। আর সুখইত মানুষকে বাঁচিযে রাখে। সুখ না থাকিলে কি মানুষ কখন বাঁচিত? তুমি যে বলেচ "সুখে বাঁচা যায় কৈ?" ও কথাটা তোমার মস্ত ভুল। তোমার সুখ, আমি বুঝিয়াছি। তোমার সুখ সংকীর্ণ, ব্যক্তিগত। তুমি খুঁজিতেছ, আপনার সুখ। আপনার সুখের মধ্যে সুখের পূর্ণতা, সুখের বিশ্বজনীন অপার আনন্দ নাই। সুখের পরিপূর্ণতা, সুখের চিরদিনের আনন্দ, বিশ্বের অসীম প্রাণেব ভিতরে। সুখের সীমা এককাঠা জমি নহে। যথার্থ সুখ পাইতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই। তুমি ত জগতের সুখের দিকে একবারও চাইচনা। বিশ্বের নিয়ম আদান-প্রদান। সুখ দিলে তবে সুখ পাওয়া যায়। তুমি যদি জগৎকে সুখ না দাও, জগৎ তোমাকে সুখ কেন দেবে? আপনার প্রাণের মধ্যে সুখ কোথায়? বিশ্বের প্রাণের সহিত আপনার প্রাণ মিশাও। সুখী হইবে। ভূমানন্দলাভ করিবে। আপনাকে আপনার মধ্যে জড় করিতেছ বলিয়াই ত পৃথিবীর কিছুতেই সুখ পাও না। কথাটা বোঝ। মানুষ পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ রাখিতে পারে না। মানুষ জগতের? এক ক্ষুদ্র অংশ। জগৎ হইতেই জন্মিয়াছে, আবার জগতের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে। সেই ক্ষুদ্র মনুষের সুখ-দুঃখ জগতের সুখ-দুঃখ লইয়া। জল-বিন্দু অপেক্ষা সমুদ্র কত বড়। তোমার সুখের চেয়ে জগতের সুখ কত বড়। জল-বিন্দু যদি মনে করে, আমি সমুদ্রকে ছাড়িয়া থাকিব।

আমি সমুদ্র হইব। তাহা হইলেই সে ক'দিন বাঁচে? সে সমুদ্র হ'তে পারে কি? সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সমুদ্র হইতে হইবে। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হইবার ক্ষমতা জল-বিন্দুর নাই। সমুদ্রকে ছাড়িয়া সমুদ্র হওয়া যায় না। তাই বলি জগতের প্রতি জগতের সুখ বাড়াইতে মন দাও। জগৎকে ভালবাস। আমিই কি তোমার সব? আমিইকি তোমার জগৎ? আমাকে সুখী করিলেই কি জগৎকে সুখী করা হ'ল? আমাকে অতিক্রম করিয়া কি জগৎ নাই। আমি যে তোমার আলো, আমি যে তোমার সাহায্য, তোমার এ জীবনের একমাত্র স্বামী, তাহা কিসের জন্য? কেবল কি তোমার নিজের সুখের জন্য? তোমাকে কেবল আমার মধ্যে পুরিবার-জন্য? না। আমার মধ্যে মরিবার জন্য তুমি আস নাই। আমার আলো তোমাকে অনন্তপথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। তোমার আমার প্রতি ভালবাসা, জগৎকে ভালবাসিবার জন্য। আমি তোমার অনন্ত সুখের দ্বার মাত্র। তোমার সুখের অনন্ত পথ দেখাইয়া দিতেছি। আমি তোমার স্বর্গও নহি। তাহার সিঁড়ি মাত্র। তুমি যে বলিয়াছ, "বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া বিশ্ব-প্রাণে প্রাণ মিশাইতে হইবে।" সে কথাত আমি ও বলি। কিন্তু তাহা কিরূপে? তাহা কি মানবকে দূরে রাখিয়া? মানবের সঙ্গে না মিশিয়া? তুমি বিশ্বকে মানব থেকে তফাৎ করিয়া দেখিতেছ। তা'ওকি কখন হয়? বিশ্বের সার অংশ মানব। বিশ্ব হইতে মাবকে বাদ দিতে পার না। যদি বিশ্ব-আত্মায় প্রাণ মিশাইতে চাও, তবে সমস্ত মানবের প্রাণের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। যাহা তুমি চাও, যে perfections'র জন্য তুমি ক্রমাগত চেষ্টাকরিতেছ, তাহা humanity 'র মধ্যে। humanity কে জাগাতে হইবে। humanity কে জাগাতেগেলে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আবশ্যক। বিশ্বব্যাপী প্রেমের প্রভাবেই humanity জাগিবে। প্রকৃতিকে পাইবে। সুখী হইবে। অনন্ত বিশ্বময় জীবনলাভ করিবে।

দেব। বিজয়, জীবন-তত্ত্ব, জগৎ-রহস্য-কথা তাহার আদ্যন্ত মধ্য, তোমার কাছ থেকে অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। এতকাল ধরিয়া তোমার জ্ঞানের সুন্দর কথা গুলির গভীর ভাবে আলোচনা করিলাম। অধিক কি, তোমার ভাবেই আমি অনুপ্রাণিত। তবু সত্য কথা বলিতে গেলে, তোমার ওসব

পাশ্চাত্য-ভাব-ঘেঁসা-কথা, আজও আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। ওসব কথা গুলাকে আজও আমার অস্থি-মজ্জা করিতে পারিলাম না। প্রাণ ধরিয়া তুলিতে পারিলাম না। উহা হইতে পরলোকের জন্য সঞ্চয় করিবার কিছুই পাইলাম না। উহা জীবন-পথে আমাকে এক পাও অগ্রসর করিয়া দিল না। অত বড় বড় উদার কথা, যাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, তাহা বহিব কিরূপে? আমরা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোক চিরকালই স্ত্রীলোক থাকিবে। তাহাকে তুমি যতই শিক্ষিত করনা কেন। চিরকালই সে অবলা —আত্মময়ী। সেই জন্য স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের কাজ, পুরুষের কাজের ঠিক উল্টো। জগৎময় হওয়া, জগৎকে দেখা, জগতের স্রষ্টা হওয়া, পুরুষের ধর্ম্ম, পুরুষের কাজ। নারীর নহে। তুমি পুরুষের দিক হইতে নারীকে দেখিয়াছ। পুরুষের কাজকে স্ত্রীলোকের কাজ বলেছ। নারীর ধর্ম্ম কি? নারীর সমস্ত জীবন, স্বামী ও ঈশ্বরের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। তাহাই নারার এক মাত্র শিক্ষা। নারীর কাজ গৃহ প্রতিষ্ঠা করা। গৃহিণী হওয়া। গৃহে স্বামীরূপ চির-প্রিয় সজীব মঙ্গলময় দেবতার নিত্য পূজা করিতে করিতে, সেই তাঁহার—যিনি আমার স্বামীর স্বামী, সবলের দেবতা,—পূজা-পদ্ধতি-প্রেম, শিক্ষা করা। স্বামী-রূপ সসীম ধ্রুবে অচল থাকিয়া, সেই অসীম মহা-ধ্রুবের দিকে অগ্রসর হইতে শিক্ষা করা। আমরা অহর্নিশ—দূর হইতে—জগতের মঙ্গল কামনা করি। পুরুষকে জগতের কাজে উৎসাহিত করি। পুরুষের কাজের অংশ লইয়া জগতের মঙ্গল করা, কাজ করা, নারীর ক্ষমতার অতীত। নারী তাহা পারে না। পুরুষের সহিত কি নারীর তুলনা হয়? নারী অচৈতন্য, পুরুষ চৈতন্য। নারী দেহ, পুরুষ আত্মা। সেই স্বামী আত্মার মধ্যদিয়া নারী মহা-আত্মার প্রবেশ করিতে চায়। আর কিছুই সে চায় না। বিজয়, আমাদের দিন ফুরাইয়াছে। আমাদের অত সব কথায় কাজ কি। যাহাদের এখন দিন আছে, তাহারা ওসব কথা লইয়া নাড়া চাড়া করুক। চল ঈশ্বরে জীবন সমর্পণ করি। আর গৃহ কেন? জীবনের গৃহ-অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। পরলোক অধ্যায় সম্মুখে বিরাজমান। দেখ, এত বড় এই আকাশে-মেশা সাগরে-ঘেরা শত ফুল-হাসি-রঙ্গের ছড়াছড়ির সুখের বিচিত্র পৃথিবীতে মানবের খেলা

দু'দণ্ড মাত্র। প্রতিদিন অভ্যাস-সূত্রে কত খেলাই খেলিতেছি। প্রত্যহ নূতন নূতন আশা লইয়া জগৎ-মহারণ্যের ফুলে ফুলে পাগল হইয়া মধু অন্বেষণে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছি। জগতের চারিদিকে মায়ার অনন্ত শয্যা পাতিয়া গভীর আত্ম-বিস্মরণ-নিদ্রায় মগ্ন আছি। হায়! তাহা ক'দিন? একবার চোখ বুজিলেই ত সব ফুরাইল! জন্মের মত গেল! হায়! মানুষ পিছনে একবার চায় না! পিছনের জন্য কিছু রাখিয়া যায় না! সকলেই অধিকার বাড়াইতে দৌড়াইতেছি। অধিকার কোথায়? কিসের অধিকার? সুখের? তাহা অস্থায়ী—চঞ্চল। আশা? এখানে মিটে না। এ জগৎটা ঘোড়-দৌড়ের মাঠ। এ জগতের ভিড়ে আমাদের স্থান নাই। জগৎ থেকে আমাদিগকে পালাতে হবে। জগতে স্বাধীনতা নাই, সুখ নাই। জগতের সুখ, জগতের স্বাধীনতা, আমি চাই না। তাহা পরলোকের পথের বাধা—কণ্টক। জগতের দাসত্বে বৃথা সময় যাইতেছে। জগতের দাসত্ব আর ভাল লাগে না। জীবন মহত্ব চায়। জীবনকে জগতের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া মহৎ করিগে চল। জগৎ-মলা, জগতের দূরে গিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে। এখানে ঝাড়িলে মলা পুনরায় ঢুকিবে। জগৎ-মলা, জগতের ভিতরে বসিয়া ঝাড়া যায় না। জগতের বাহিরে ঝাড়িতে হয়। আর সময় নাই। সময় যত চলিয়া যাইতেছে, ততই যেন কিসের হাহাকার রব কোথা হইতে শুনিতেছি। শুনিতেছি, কে যেন আমার আপনার লোক, আমার অনন্ত কালের হারাণ সঙ্গী, আমার ঠিক পাশে বসিয়া কাণের কাছে কি এক স্নেহ পূর্ণ-মধুর ক্রন্দনের মৃদুভাষায় আমাকে অবিরত আহ্বান করিতেছে। কে সে?—সন্ধ্যা? জগতের অনন্ত সন্ধ্যা?

বি। না। তাহা মানবের অনন্ত অভাব। তাহা Humanity'র আকুল-আহ্বান। তাহা পৃথিবী যুড়িয়া এক প্রাণ হইবার বিপুল প্রাণগত চেতনা—প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু।

সখি দেখন-হাসি।

সকাল হ'ল ঘুম ভাঙিল সখি দেখন-হাসি,
মুচ্‌কে হেসে মধুর ভাষে জিজ্ঞাসিল আসি।
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা,
ফুটেছে ফুল ভ্রমর কুল করছে ফুলে খেলা।
চাঁপা গাছে ফুটে আছে কত শত ফুল,
পুকুর পাশে গোলাপ হেসে হতেছে আকুল।
গাছের ডালে গায় কোকিলে, কতই সুধা ঢালে,
তৃণের আশে হরিণ আসে কতই পালে পালে।
তরুণ রবি—সোণার ছবি, সোণার হাসি দিয়ে,
ফুলের শিরে মুকুট ঘিরে দিচ্ছে সাজাইয়ে।
সুবাস আশে ফুলের পাশে সমীর ঘুরে ফিরে,
দোলায় লতা, গাছের পাতা কাঁপায় ধীরে ধীরে।
সেথায় গিয়ে ফুল তুলিয়ে বেছে মনের মত,
সোণার গায়ে দিব ছেয়ে সাজ্‌বে যেথা যত।
বৃন্দাবনে গোপীর সনে যে ফুল ল'য়ে সাধে,
কতই খেলা খেল্‌লে কালা কৃষ্ণচূড়া বেঁধে।
সেই ফুলেতে তোর চুলেতে খোঁপা বেঁধে দিব,
ফুলের বালা ফুলের মালা কতই পরাইব।
কানন মাঝে তেমনি সাজে 'বনদেবী' হ'য়ে,
হাস্‌বে তুমি দেখ্‌ব আমি প্রফুল্ল হৃদয়ে।
গিয়ে সেখানে কোকিলা সনে গাব খুলে গলা,
কেমন সখি, বাগানে কি যাবি সকাল বেলা?

শ্রীস্বর্ণময়ী দেবী।

সিপাহিযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারকাহিনী।

মধ্য ভারতবর্ষে নওগাঁও নামক স্থান উত্তেজিত সিপাহিদিগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তথাকার একদল ইউরোপীয় প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন। ভারতবাসীর পরোপকার গুণে ইহাদের কোনও রূপ অনিষ্ট হয় নাই। ১২ গণিত ভারতীয় পদাতিকদলের অধ্যক্ষ লেপ্টেনেণ্ট জ্যাক্‌সন্‌ পলায়ন বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেন।—"মহোবা পরিত্যাগের পর মদনপুর (ছত্রপুর) নামক পল্লীতে আমাদের থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পথ দুর্গম হওয়াতে, বিশেষ ১০।১২ খানি গাড়ীতে অনেক গুলি মহিলা থাকাতে আমরা উক্ত পল্লীতে অবস্থিতি করিতে পারি নাই। সূর্য্যোদয় সময়ে আমরা জুরা নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই খানে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই মহোবার কলেক্টর কর্‌ন্‌ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। কলেক্টর সাহেব চিরকুরার রাজার নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা ধার করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা ঐ টাকায় এই দিনই, আমাদের সঙ্গে যে সকল লোক ছিল তাহাদের মে মাসের মাহিনা পরিষ্কার করিয়া ফেলি।

"সূর্য্যাস্ত সময়ে আমরা এলাহাবাদ হইতে বাঁদা যাওয়ার পথে আর একটি পল্লীতে উপনীত হই। * * * স্থানীয় লোকে আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে বিমুখ হয় নাই। তাহাদের দয়ায় ও তাহাদের সৌজন্যে আমাদের অনেক উপকার হয়। পরদিন দুই জন পথপ্রদর্শক আমাদের সহিত মিলিত হয়। ইহারা আমাদিগকে কালী নগর যাইবার পথ দেখাইয়া দেয়। কালী নগর হইতে আমরা নাগোদ নামক স্থানে প্রস্থান করি।

"সূর্য্যাস্তের কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অন্যান্য পল্লীবাসীর মধ্যে ৮।৯ জন লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। এই ঘোরতর বিপ্লবের সময় ইহাদের প্রভুভক্তি বিচলিত হয় নাই, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। এ সঙ্কট কালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ সমর্থনে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সাধনে ও গবর্ণমেণ্টের আদেশপালনে ইহাদের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ

ছিল। যদি আমরা এই প্রভুভক্ত বন্ধুগণের দেখা না পাইতাম, তাহা হইলে, আমাদের বড় অসুবিধা হইত। এ সময়ে বিশেষ সত্বরতার সহিত যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। যেহেতু ৪৫ মাইল অতি দ্রুতবেগে ধাবমান হওয়াতে আমার অধিষ্ঠিত অশ্ব অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ঐ সকল দয়ার্দ্রহৃদয় বন্ধু আমাদের যথোচিত আতিথ্য সৎকার করে। পরদিন আমরা উহা অপেক্ষা বহুলোকসমাকীর্ণ বহুবিস্তৃত আর একটি পল্লীতে উপস্থিত হই। এই স্থান হইতে আমি অজয়গড়ের রাণীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র পাঠাই। এই পত্র পঁহুছামাত্র আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। আমরা ১০।১২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নিরাপদে অজয়গড়ে উপস্থিত হই। পল্লী হইতে কতকগুলি অস্ত্রধারী লোক সমস্ত পথ আমাদের রক্ষক হইয়া আইসে। অজয়গড়ে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করি, যেহেতু আমাদের একজন সঙ্গী পথশ্রান্তিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার দাঁড়াইবার সামর্থ্য ছিল না। আমরা এই খানে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রান্তি বিনোদন করি। আমাদের বাহন গণও আমাদের সহিত সুস্থ ও সবল হয়। অজয়গড় হইতে আমরা নাগোদে যাত্রা করি। পরহিতৈষিণী রাণী আমাদিগকে লইয়া যাওয়ার জন্য কয়েকটি হাতী দেন।” বলা বাহুল্য যে উপস্থিত সঙ্কট কালে ভারতীয়দিগের এই রূপ সাহায্য না পাইলে পলাতক ইউরোপীয়দিগের প্রাণবিয়োগ হইত। দুর্গম পথ অতিবাহনে, দুর্দ্দান্ত লোকদিগের তাড়নে বা দুরাশয় অস্ত্রধারী দিগের আক্রমণে তাঁহারা যাতনার একশেষ ভুগিয়া হয় ত শেষে মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিতেন।

নওগাঁও হইতে আর এক দল পলাতক আর এক পথে যাত্রা করেন। ইঁহারাও ভারতবাসীর করুণায়, সদাশয়তায় ও হিতৈষিতায় অভীষ্ট স্থানে উপনীত হন। ইঁহাদের পলায়ন কাহিনীতেও ভারতবাসীর পরোপকারের চিহ্ন জাজল্যমান রহিয়াছে। ইঁহাদের এক জন এই ভাবে আপনাদের দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। “আমি যখন সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছিলাম, তখন একটি লোক আমার নিকট উপস্থিত হয়। এই লোক আপনাকে রাজার দূত বলিয়া

পরিচয় দেয়। রাজা আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই শুভ সংবাদ পাইয়া আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হই। লুগাসির রাজা আমাকে যথোচিত আদরের সহিত গ্রহণ করেন, এবং নওগাঁওর সিপাহিযুদ্ধের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। তাঁহার তদানীন্তন মুখভঙ্গীতে স্পষ্ট প্রতীত হইয়াছিল যে তিনি ইঁউরোপীয় আফিসরদিগের নিরাপদ হওয়ার সংবাদের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। রাজা আমাকে কোন আফিসর নিহত হইয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু আমি সন্ত্রস্ত ভাবে পলায়ন করাতে নওগাঁর সিপাহিযুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানিতে পারি নাই; সুতরাং রাজার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অসমর্থ হই। রাজা আমার আহার্য্য সামগ্রী আনিয়া দিতে অনুচরদিগকে আদেশ দেন, এবং আমাকে সেই রাত্রিতে পল্লীর একটি নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিতে কহেন। কেহ আমার কোনও অনিষ্টসাধন করিতে না পারে এই জন্যই আমার বাসের নিমিত্ত ঐ গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা আমাকে আহ্বান করিয়া কহেন যে, ছত্রপুরে মেজর কার্ক নামক একজন সৈনিক পুরুষের নিকটে তিনি পত্র লিখিবেন। এতদ্ব্যতীত উত্তেজিত সিপাহিরা নওগাঁও পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে কি না ইহা জানিবার জন্য এক জন গুপ্তচর পাঠাইতেও তাঁহার ইচ্ছা আছে।

তৃতীয় দিন রাত্রিতে আমরা কালিঞ্জরের অভিমুখে যাত্রা করি। প্রথমে জোরাই নামক পল্লীতে উপনীত হই। এই খানে হামিরপুরের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কারন্ সাহেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ইনি আমাদের জন্য ১০০০্ টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এই টাকা চিরকারীর রাজা তাঁহাকে ধার দেন।

পথে আমাদের নিকট এই সংবাদ উপস্থিত হয় যে, কুত্রাই নামক পল্লীর অধিবাসিগণ আমাদিগকে উক্ত পল্লী হইতে তাড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। কাহার দ্বারায় এই সংবাদ প্রচারিত হয়, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বোধ হয়, আমাদের বিপক্ষগণ দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য এই সংবাদ প্রচার করে। উত্তেজিত সিপাহিরা এখন আপনাদের কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহাদের দ্বারা এই জনরব প্রচারিত

হওয়া বিচিত্র নয়। যাহা হউক, পরিশেষে উক্ত সংবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আমরা ১২ কি ১৩ দিন ঐ পল্লীতে নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করি। পল্লীবাসিগণ আমাদের আহারীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য পর্য্যাপ্ত না হওয়াতে শেষে আমরাই আমাদের খাদ্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে থাকি।

কুত্রাই হইতে আমরা বাঁদা যাইবার জন্য মিতাউন নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করি। অপরাহ্ন ৬টার সময় আমরা ঐ পল্লীতে উপনীত হই। পল্লীতে প্রবেশ সময়ে অধিবাসিগণ যথোচিত দয়া ও সৌজন্যের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করে, এবং তাহারা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পল্লীমধ্যে লইয়া যায়। এই খানে আহারের জন্য দ্রব্যাদি ও শুইবার জন্য খাটিয়া দিয়া আমাদের তৃপ্তি সাধন করে। এই স্থানে ৪।৫ দিন থাকিবার জন্য আমরা স্থানীয় জমিদারের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি। জমিদার যথোচিত ভদ্রতার সহিত কহেন যে,—"আপনাদের যত দিন ইচ্ছা হয় ততদিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে পারেন।" স্থানীয় ভূস্বামিগণ কেবল এইরূপ সৌজন্য দেখাইয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা আমাদের প্রত্যেককে এক এক প্রস্থ পরিধেয় বস্ত্র ও এক এক খানি কম্বল দেন। বেনিয়াগণ (শস্যব্যবসায়ী) যদিও কঠোর-হৃদয় বলিয়া পরিচিত, তথাপি তাহারাও আমাদের জন্য ময়দা যোগাইতে বিমুখ হয় নাই। কেহ কেহ আমাদের তৃপ্তির জন্য চুরুট আনিয়া দেয়। এই স্থানে আমরা শুনিতে পাইলাম যে বাঁদার ইউরোপীয়গণ নিহত হই-য়াছেন; এজন্য আমরা উক্ত স্থানে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। যাহাতে আমরা নিরাপদে নাগোদে উপনীত হইইতে পারি, তদ্বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আমি বুন্দেলখণ্ডের সহকারী পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ইলিস্ সাহেবের নিকট এক খানি পত্র লিখি। স্থানীয় ভূস্বামী পত্র-বাহককে একটি টাকা দিয়া ঐ পত্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাঠাইয়া দেন। পত্র-বাহক দশ দিনে প্রত্যাগত হয়। সে ইলিস্ সাহেব ও কাপ্তেন স্কট্ নামক একজন সৈনিক পুরুষের পত্র সঙ্গে করিয়া আনে। প্রায় এক মাস কাল অবস্থিতির পর আমরা ৯ই আগষ্ট মিতাউন হইতে যাত্রা করি। ৫০ জন

লোক আমাদের রক্ষক হইয়া নগর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত হয়। মিতাউন হইতে পনর মাইল দূরে গৌরীচর নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানের জায়গীরদার আমাদিগকে অতি শীলতা ও আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করেন। আমরা এই নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে পারি নাই। গৌরীচরে আমাদিগকে ১৭ দিন থাকিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে উক্ত জায়গীরদার আমাদের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার জন্য দরজি আনিতে বাঁদায় লোক পাঠান। কিন্তু বাঁদায় নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে এই লোক কৃতকার্য্য হইয়া আসিতে পারে নাই।

প্রেরিত লোক বাঁদা হইতে কেবল কয়েক জোড়া চর্ম্মপাদুকা আনিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু অনেক বড় হওয়াতে আমরা উহা ফেরত দিতে বাধ্য হই। যাহা হউক, স্থানীয় ভূস্বামী আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট দ্রব্য দিতে তাঁহার লোকদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটে যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ২৮শে আগষ্ট স্থান পরিত্যাগ করি। ভূস্বামী আমাদের যাত্রার সময় সঙ্গিনী মহিলাদের জন্য তাঁহার পাল্কী এবং আমাদের জন্য তাঁহার হস্তী সজ্জিত করিয়া দেন।”

উপস্থিত সময়ে সকল সিপাহিই যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া ইংরেজদিগের বিনাশ-সাধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় নাই। সময়ের উত্তেজনায়, লোকের কুমন্ত্রণায়, ইংরেজের কুটিল রাজনীতির তাড়নায় এ সময়ে অনেকে অধীর হইয়াছিল; অধীর ভাবে অনেকে ইউরোপীয়দিগের শোণিতে ভারতের অনেক স্থান রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র সিপাহিসৈন্য ইঙ্গরেজদিগের বিপক্ষতা করে নাই। কেহ কেহ আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও নিরাশ্রয় নিপীড়িত ও নিদারুণ শোচনীয়দশাগ্রস্ত ইঙ্গরেজের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। একজন আফিসর এইরূপ একটি দয়াপর সিপাহির বিবরণ এই ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।—“কতকগুলি সিপাহি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে থাকে। আমি তখন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি ‘কি!—তোমরা কি সকলেই আমার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছ!’ এই কথা শুনিবামাত্র কতকগুলি আমার অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে আসিয়া দাঁড়ায়। আমি তাড়াতাড়ি এক জন সেনা নায়কের গৃহে লুক্কায়িত হই।

তিন জন রসলদার এবং প্রায় ৪০ জন অশ্বারোহী সিপাহি আমাকে রক্ষা করিতে কিম্বা আমার পতনের সহিত তাহাদের দেহপাত করিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়। দুই জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাদের স্ত্রী ও শিশুসন্তান লইয়া পদ-ব্রজে পলাইতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া আইসি। রসলদার ও সিপাহিগণ আমাকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত থাকিলেও আমি সহসা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। যেহেতু ঐ মহিলা ও সন্তান গণের রক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না।

তৃতীয় দিন আমি ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করি। অশ্বারোহী সিপাহিগণ আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া যাইতে থাকে। স্থানীয় ভূস্বামীর একজন উকীলের যত্নে পূর্ব্বোক্ত সৈনিকপুরুষদ্বয়ের স্ত্রী ও সন্তানগণ রক্ষা পায়।

আমি আবু নামক স্থানে উপনীত হইলে, সেই স্থানের লোকে যথোচিত সদয় ভাবে আমার ব্যবহারের জন্য কাপড় তামাক ইত্যাদি আনিয়া দেয়।

যে রসলদার আমাকে এইরূপে রক্ষা করিয়াছিল তাহার নাম আব্বাস আলি। আমার বিশ্বাস যে তাহার জীবনের কোনও হানি হয় নাই। আমি মাড়বারের ইংরেজ সেনাপতি ও পলিটিক্যাল এজেণ্ট্কে এই সাহসী সৈনিক পুরুষের জীবনরক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি; যেহেতু এই ব্যক্তি বিপদাপন্ন হইয়াছিল এবং বিপক্ষদিগের প্রায় বন্দী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলি সাহসী অশ্বারোহী তাহার সহায় থাকাতে বিপক্ষগণ আপনাদের স্বার্থ নষ্ট না করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইতে পারিবে না।”

ভারতীয় সৈনিক পুরুষের যত্নে আর একটি ইউরোপীয় সেনানায়কের জীবন এইরূপে রক্ষিত হয়। দুই জন হাবিলদার লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি নামক একজন সৈনিক পুরুষের প্রাণরক্ষা করে। ইহারা বিবাহে যাইবার ডুলিতে করিয়া রেলিকে ভাগলপুরে আনে। এই ডুলি ভাড়া করা হইয়াছিল। লেপ্টেন্যাণ্ট রেলি পরিশ্রান্তি ও ক্ষুধায় এইরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে হামাগুড়ি দিতেও তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। চারি দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে তিনি হাবিলদারদ্বয়ের চেষ্টায় রক্ষা পান। এইরূপে জীবন রক্ষা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে।

গ্রিগর গ্র্যাণ্ট্ নামক আর একজন ইউরোপীয় দুই দিন অনাহারে ছিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি আর একটি পল্লীতে উপনীত হন। পল্লী-বাসিগণ তাঁহার আহারের জন্য দুগ্ধ ও মুড়কি আনিয়া উপস্থিত করে। ক্ষুধার্ত্ত ইউরোপীয় যথোচিত কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার খিদমদ্গার ঐ পল্লীতে লুক্কায়িত রহিয়াছে। গ্র্যাণ্ট সাহেব তাহাকে নিজের নিকটে আহ্বান করেন। খিদমদ্গার উপস্থিত হইলে একটি ডুলি প্রস্তুত হয়; কেন না গ্র্যাণ্ট্ সাহেবের পদতলে গভীর ক্ষত হওয়াতে তাঁহার চলিয়া যাইবার সামর্থ্য ছিল না। রাত্রিতে যে কাপড় ব্যবহার হয়, তিনি কেবল সেই কাপড়ে ছিলেন, ইহা ব্যতীত অন্য কোন কাপড় বা পাদুকা ছিল না। তাঁহার ঘোটক ও হস্তী পরহস্তগত হইয়াছিল, তাঁহার বস্ত্রাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি খিদমদ্গারের সঙ্গে বস্ত্রাবৃত ডুলিতে যাইতে লাগিলেন। খিদমদ্গার ঐ ডুলিতে তাহার নিজের স্ত্রী আছে বলিয়া সাধারণের নিকট ভাল করিতে লাগিল। পলাতক ইউরোপীয় এইরূপে শঙ্কিত হৃদয়ে বৃত্তাকার পথ অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে তিনি শুনিতে পাইলেন যে অন্যান্য সেনানিবাসের সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় আফিসরদিগকে হত্যা করিয়াছে। এই সংবাদে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে সিপাহিদিগের হস্তগত হইলে স্বয়ংও ঐ রূপে নিহত হইবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় ও তাঁহার বিশ্বস্ত খিদমদ্গারের অসীম চেষ্টায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্র্যাণ্টের জীবন রক্ষা পাইল।

দেওঘরের সিপাহিসৈন্য যুদ্ধোন্মুখ হইলে, যে দুই জন হাবিলদার তাহাদের অধিনায়ক লেপ্টেন্যাণ্ট রেলিকে ভাগলপুরে আনিয়া রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের এক জনের নাম দরিয়া সিংহ ও অপরের নাম ঠাকুর দোবে। ইহারা ৩২ গণিত পদাতিক সৈন্যদলের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ভাগলপুরের অধিবাসিগণ চাঁদা করিয়া ৮ শত টাকা সংগ্রহ করে। ঐ টাকা উক্ত বিশ্বস্ত হাবিলদার দ্বয়ের পারিতোষিক দেওয়া হয়।

ফইজাবাদের ডেপুটি কমিসনর কাছারিতে গিয়া শুনিলেন নিকটবর্ত্তী

সেনানিবাসে সিপাহিরা যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তিনি আপনার স্ত্রীকে গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক অবিলম্বে নদীকূলাভিমুখে যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। একজন বিশ্বস্ত চাপরাশি তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য আদিষ্ট হইল। ডেপুটি কমিশনর এই সংবাদ পাঠাইয়া স্বয়ং সেনানিবাসে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সৈনিক কর্ম্মচারিগণের সাহায্যার্থে যদি কোন কার্য্য করিতে হয়, সেই জন্যই ডেপুটি কমিসনর কাছারি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এ দিকে ডেপুটি কমিশনরের বনিতা বিশ্বস্ত চাপরাসির সঙ্গে পাল্কীতে নদীকূলের দিকে যাইতে লাগিলেন। রাত্রি সমাগমে তাঁহাকে একটি পল্লীতে আশ্রয় লইতে হইল। বাহকেরা পাল্কী নদীর ধারে রাখিয়া চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে উত্তেজিত সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল সমুত্থিত হইল। সিপাহিরা ইউরোপীয়দিগের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী চারিদিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল। উক্ত পল্লীবাসিনী একটি দরিদ্র মহিলা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও তাঁহাকে একটি অব্যবহার্য্য তুন্দুরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী ভীতিবিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি সেইখানে রহিলেন। সিপাহিরা চারিদিকে পলাতক ইংরেজদিগের অন্বেষণ করিতেছিল; লুক্কায়িত পলায়িতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে প্রাণদণ্ড হইবে বলিয়াও সকলকে ভয় দেখাইতেছিল। যখন উক্ত ইঙ্গরেজমহিলা গ্রামমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন গ্রামীন পুরুষেরা গোধন সঙ্গে লইয়া কৃষিক্ষেত্রে গিয়াছিল, সুতরাং এ বিষয় তাহাদের গোচর হয় নাই; কিন্তু গ্রামের মহিলারা প্রায় সকলেই ইহা জানিত। সিপাহিরা ভয় দেখাইলেও তাহারা ঐ ইংরেজকুলকামিনীর কথা প্রকাশ করিল না। দয়া ও সাধুতার সম্মান তাহাদের নিকটে উচ্চতর বোধ হইল। আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহারা হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইল না। সিপাহিদিগের ভীষণ কোলাহল মধ্যে দরিদ্রা আশ্রয়দাত্রীর অনুগ্রহে বিদেশিনী সেই তুন্দুরের অভ্যন্তরে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইল, ভীষণ কলরব অনন্ত আকাশে মিলিয়া গেল, উত্তেজিত সিপাহিরা কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে প্রস্থান

করিল। ডেপুটি কমিশনরের পূর্ব্বোক্ত বিশ্বস্ত চাপরাসি স্থানীয় ভূম্যধিকারী মহারাজ মানসিংহের নিকটে যাইয়া নৌকা প্রার্থনা করিল। মানসিংহ বিপন্নদিগের উদ্ধারার্থ চাপরাসির প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। ডেপুটি কমিশনরের স্ত্রী এবং অপর কয়েকটি ইংরেজ কুলকামিনী বালক বালিকার সহিত নৌকার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহিরে কয়েকটি বিশ্বস্ত সিপাহি ও চাপরাসি বসিয়া রহিল এবং এখানি তীর্থযাত্রীর নৌকা বলিয়া সাধারণের নিকট ভাণ করিতে লাগিল। পথিমধ্যে ইহাদের সহিত কতকগুলি উত্তেজিত সিপাহির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্তু নৌকার অভ্যন্তরে যে ইংরেজ কুলকামিনীগণ রহিয়াছে ইহা কেহই ঐ সিপাহিদিগের নিকটে প্রকাশ করিল না। সন্ধ্যা সমাগমে নৌকা নিরাপদে তীরে আসিয়া লাগিল। এই সময় ২।৩ জন চাপরাসি দুগ্ধ ও রুটির জন্য নিকটবর্ত্তী পল্লীতে গেল। এই পল্লীর মহিলারাও বিপন্নদিগের যথোচিত যত্ন করিতে ক্রটি করিল না। একটী দরিদ্রা মহিলা নৌকাশ্রিত শিশু সন্তানদিগকে ক্ষুধায় কাতর দেখিয়া তাড়াতাড়ি গ্রামে প্রবেশ করিল এবং কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী সঙ্গে করিয়া নৌকার নিকটে উপস্থিত হইল। শিশুসন্তানগুলি ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছিল। যাহারা এক সময়ে সর্ব্ব প্রকার সুখসৌভাগ্যে লালিত হইত, সর্ব্বপ্রকার কষ্ট হইতে বিমুক্ত থাকিয়া নিরন্তর আমোদে কালাতিপাত করিত তাহারা এখন দুগ্ধের অভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আপনাদের দুঃসহ যাতনা প্রকাশ করিতেছিল। ধাত্রীগণ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা আপনাদের স্তন্য দিয়া ক্ষুধার্ত্ত শিশুসন্তানদিগকে সন্তুষ্ট করিল। এই প্রকার সাহায্য দানে যে আপনাদের জীবনহানির সম্ভাবনা আছে ইহা তাহারা জানিত, তথাপি তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইল না; আশঙ্কা বলবতী হইয়া তাহাদিগকে এই মহত্তর কার্য্যসাধনে বাধা দিল না। তাহারা অসঙ্কুচিত ভাবে, নির্ভীকহৃদয়ে, বিপন্নের বিপদুদ্ধার করিয়া জগতের সমক্ষে মহান্ ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিল। পলায়িত ইংরেজ কুলকামিনীগণ ইহাদের সহিত এক দেশে বাস করিতেন না, ইহাদের সহিত এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন না, ইহাদের সহিত এক প্রণালীতে—এক দেবতার আরাধনা করিতেন না এবং ইহাদের সহিত এক

জাতীয় বলিয়াও পরিচিত হইতেন না। এরূপ ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের হইয়াও ইঁহারা দরিদ্রা মহিলাদিগের অসাধারণ দয়ায় ঘোরতর সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইলেন। ভারতের পর্ণকুটীরবাসিনী এ পবিত্র স্নেহময়ীর নিঃস্বার্থ ভাবের সহিত অন্য কোন কার্য্যের তুলনা সম্ভবে না।

ইংরেজমহিলাগণ এইরূপ অসাধারণ পরোপকারগুণে শিশু সন্তানদিগের সহিত অক্ষত শরীরে এলাহাবাদে উপনীত হন। ডেপুটী কমিশনর ও তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণা বনিতা এই মহৎ উপকারের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। যাহারা আপনাদের জীবন বিপদাপন্ন করিয়াও অসময়ে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল; আশ্রয় দিয়া, আহার্য্য দিয়া ও অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাহারা তাঁহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর সময়ে নিরাপদে রাখিয়াছিল, শান্তি স্থাপিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

শান্তি।

নবম পরিচ্ছেদ।

বড় ভয়ানক কাণ্ড! শশী ভট্টাচার্য্য রাত্রে কাটা পড়িয়াছেন! প্রাতে তাঁহার কুটীরের চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। পুলিসের ইনিস্পেক্টর, হেড কনষ্টবল ও কনষ্টবল গস্ গস্ করিতেছে। কুটীর প্রাঙ্গনের অদূরে, একটা বনের অন্তরালে, লাস পড়িয়া আছে। লাস একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা। ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে। ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, যেখানে লাস পড়িয়া আছে সে পর্য্যন্ত, রক্তের ধারা রহিয়াছে। লাসের দুই দিকে দুই জন কনষ্টবল দাঁড়াইয়া আছে।

দূরে এক স্থানে, পাঁচ জন কনষ্টবলবেষ্টিত হইয়া, কালী ও রামলাল

বসিয়া আছে। তাহাদের উভয়েরই হাতে হাতকড়ি। কালীর ললাট কুঞ্চিত, ভ্রূযুগল স্ফীত, চক্ষু রক্তবর্ণ, এবং তাহার ভাব নিতান্ত ভীতিশূন্য। রামলাল নিতান্ত কাতর ও অবসন্ন। বহু ক্রন্দন হেতু তাঁহার চক্ষু লাল। সে অধোমুখ। উভয়েরই পরিধান বস্ত্র রক্তাক্ত। রামলালের বস্ত্রাপেক্ষা কালীর বস্ত্র অধিক রক্তাক্ত।

অদূরে, একটী বৃক্ষতলে, ইনিস্পেক্টর বাবু, এক জন প্রতিবাসিপ্রদত্ত, একটী মোড়ায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে, হুঁকায় পাতার নল লাগাইয়া, তামাকু খাইতেছেন, তাঁহার সম্মুখে রক্তরঞ্জিত এক দা। তাঁহার নিকটে কয়েকজন কনষ্টবল দণ্ডায়মান।

সকল স্থানেই লোক। ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ—লোকের আর সীমা নাই। স্ত্রীলোকেরা ভিড়ের বড় নিকটে যাইতে পারিতেছে না; দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে ও শুনিতেছে। তাহাদের দেখিলে পোড়ারমুখো পুরুষগুলার মন ঠিক থাকিবে না বলিয়া যে সকল যুবতী ও অর্দ্ধবয়সী নারীর বিশ্বাস আছে, তাহারা গাছের আড়ালে ও অবগুণ্ঠনের অন্তরালে থাকিয়া, নিতান্ত ঔৎসুক্যের সহিত চাহিয়া আছে। প্রাচীনারা লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছে এবং তাহাই আবার দশগুণ বাড়াইয়া, হাত মুখ নাড়িতে নাড়িতে,নবীনাদের নিকটে আসিয়া গল্প করিতেছে। ছেলেরা ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে; তাহাদের মা, বা পিসী, বা মাসী তাড়া দিয়া যাইতে বারণ করিতেছে। দুই একটা দুষ্ট ছেলে তাড়া ও চখরাঙ্গানীতে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, লোকের পায়ের ফাক দিয়া, গুড়ি গুড়ি আসিয়া, যাহা দেখিবার তাহা দেখিতেছে। দুই একজন বৃদ্ধ আপনার যুবক পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র, বা ভাগিনেয়কে স্বাক্ষী দিতে হইবে ভয় দেখাইয়া গোলের নিকটে যাইতে নিষেধ করিতেছে; কিন্তু যুবকেরা সে উপদেশে বড় একটা কর্ণপাত করিতেছে না।

ভট্টাচার্য্যের কুটীরের দ্বার হইতে উকি দিয়া যাহারা ভিতরে দৃষ্টিপাত করিতেছে তাহারা সেখানকার রক্তগঙ্গা কাণ্ড দেখিয়া চমকিত হইতেছে। তক্তাপোষের উপর হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িয়া ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। সুতরাং তক্তাপোষের উপরে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন নিদ্রিত ছিলেন,

তখনই যে তাঁহাকে কাটিয়াছে, তাহার আর ভুল নাই। তাহার পর সেই রক্তের উপর পায়ের দাগ এবং মৃত ব্যক্তিকে ছেঁচড়াইয়া আনার দাগ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

যেথানে লাস সেখানে লোকে কেবল হায় হায় করিতেছে। দুই এক জনের চক্ষু ছল ছল করিতেছে। দুই এক জন সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিরীহ ও শান্ত ব্যক্তি। গ্রামের যাবৎ লোকেই তাঁহাকে ভাল বাসে ও আত্মীয় জ্ঞান করে। তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত। কিরূপে কাটিয়াছে, কোথায় কিরূপে আঘাত করিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য অনেকে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। লাস কাপড় ঢাকা থাকায় তাহাদের সে ইচ্ছা সফল হওয়ার কোনই সুযোগ হইতেছে না। তাহারা কৌতূহল নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া কখন বা কনষ্টবলদের পীড়াপীড়ি করিতেছে, কখন তাহাদিগকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতেছে। কনষ্টবল মহাশয়রা কৃপা করিয়া দুই একটা কথা বলিতেছেন। যাহা বলিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে, লাসের সর্ব্বাঙ্গে পঁচিশ ত্রিশ স্থানে সাংঘাতিক আঘাত আছে; তাহার মধ্যে ঠিক গলার নিকট হইতে বুকের উপর পর্য্যন্ত যে এক প্রকাণ্ড আঘাত তাহা দেখিতে যেমন ভয়ানক তেমনই গুরুতর।

যেথানে কালী ও রামলাল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া বসিয়া আছে সেখানে অনেক লোক। তাহাদের দেখিয়া অনেকেই নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নানা কথা বলিতেছে। একজন ইয়ার যুবা বলিয়া ফেলিল, "ফাঁসির কাঠে ঝুলিতে ঝুলিতে এখন ইয়ারকির চূড়ান্ত হইবে বাবা।" কালী একথায় একটুও বিচলিত হইল না। কিন্তু রামলাল কাঁদিয়া ফেলিল। আর এক উদ্ধত ব্যক্তি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিল, "ডালকুত্তা দিয়া ইহাদের খাওয়ায় না?" এবার কালী কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টিতে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এক বৃদ্ধা কোন প্রকারে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে কালীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কালামুখী, ধিক্ জীবনী! তোর গলায় দড়ি!" কালী এবারেও ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আর এক প্রবীণ লোক বৃদ্ধার কথার উত্তরে বলিল,

"সে কথা আর তোমার বলিয়া দুঃখ পাইতে হইবে না। আর বড় জোর মাস খানেকের মধ্যে গলায় দড়িই হইবে।"

যেখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইনিস্পেক্টর বাবু বসিয়া আছেন সেখানে তাঁহার শ্রীবদনারবিন্দবিনির্গত বাক্যসুধালালসায় অনেকে নিতান্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, তিনি কিন্তু বাক্যবিতরণে নিতান্ত কৃপণ। তাঁহার তদারকসংক্রান্ত লেখাপড়া ও অন্যান্য সমুদয় কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি লাস চালান দিবার জন্য একখানি গরুর গাড়ি আনিতে কনষ্টবল পাঠাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনি বড় লোক জ্ঞানে লোকে তাঁহাকে সাহস করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছে না। দুই এক ভদ্রগোছের প্রবীণ লোক তাঁহাকে বিনীতভাবে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। তিনি দিন দুনিয়ার মালিক ভাবে প্রশ্নের সিকি খানা, কদাচিৎ আধ খানা, উত্তর দিয়া কাজ সারিতেছেন।

কিন্তু কিরূপে এ কাণ্ড পুলিসের গোচর হইল তাহা এখনও বলা হয় নাই। ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর অনতিদূরে সদানন্দ দাস নামে এক কৈবর্ত্তের কুটীর। সদানন্দ কোন কার্য্য উপলক্ষে গ্রামান্তর যাইবে বলিয়া সেদিন ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। রাত্রি যখন একটা তখন সদানন্দ হাত মুখ ধুইবার জন্য ঘটী হাতে করিয়া বাহিরে আইসে। বাহির হইয়াই সে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘর হইতে ধপাস্ করিয়া এক শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিকট 'মাগো' শব্দ তাহার কাণে যায়। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ছট্‌ফট্, গোঁ গোঁ, ধপাস্ ধপাস্, দুম দাম শব্দ সে শুনিতে পায়। ভট্টাচার্য্য-পত্নীর স্বভাব চরিত্রের কথা এবং ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মনান্তরের কথা পাড়া প্রতিবাসী সকলেই জানিত। ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে তখন আলো জ্বলিতেছিল। সদানন্দ ঘরের আরও নিকটে আসিয়া শুনিতে পাইল ঘরের মধ্যে দুইজন লোক ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা কহিতেছে। গত বর্ষায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘরের এক দিকের দেয়াল পড়িয়া গিয়াছিল। সেদিকে এখনও নূতন দেয়াল দেওয়া ঘটে নাই, দরমার বেড়া দেওয়া আছে মাত্র। সদানন্দ অতি সাবধানে, সেই বেড়ার নিকটে আসিয়া, একটা ছিদ্র দিয়া ভিতরকার ব্যাপার দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

যতদূর সে দেখিতে পাইল তাহাকে তাহার পেটের পীলে চমকাইয়া গেল। সে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া এবং আপনার প্রয়োজন সমস্ত ভুলিয়া গিয়া ঘটী হাতে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে যাহা যাহা দেখিয়াছে, শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে সমস্তই সে সেখানে অকপটে ব্যক্ত করিল। তখনই পুলিসের লোকেরা তাহার সঙ্গে আসিল। রাত্রি তখন প্রায় ৪টা। এই পর্য্যন্ত কথা সদানন্দ দাসের জবানবন্দীতে ব্যক্ত হইয়া ইনিস্পেক্টর বাবুর কলমের গুণে কাগজজাত হইয়াছে। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল তাহা পুলিস স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

পুলিস আসিয়া দেখিল কালী ও রামলাল শশী ভট্টাচার্য্যের মৃতদেহ টানাটানি করিয়া বনের দিকে লইয়া যাইতেছে। সে সময়টা জ্যোৎস্না থাকায় তাহাদের দেখার বিশেষ অসুবিধা হইল না। তাহারা নিকটস্থ হইয়া কালী ও রামলালকে ধরিয়া ফেলিল। রামলাল প্রথমে পলাইবার, পরে আত্মহত্যা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে তখন অকপটে সমস্ত অপরাধ, কাঁদিতে কাঁদিতে, স্বীকার করিল। কালীর বিশেষ উত্তেজনায় এবং আপনার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে এ কাজে লিপ্ত হইয়াছিল, কালীর সহায়তা ভিন্ন সে আর কিছুই করে নাই; এবং ভট্টাচার্য্যের শরীরে সে স্বহস্তে একটীও অস্ত্রাঘাত করে নাই, একথা সে বিশেষ করিয়া বলিল। কালীও অকাতরে সমস্ত পাপ ব্যক্ত করিল। ভট্টাচার্য্য তাহার সুখের পথে কণ্টক সুতরাং তাঁহাকে মারিয়া ফেলা আবশ্যক মনে করিয়া সে, স্বহস্তে দা দিয়া বারম্বার আঘাত করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছে, একথা সে নির্ভীকভাবে স্বীকার করিল। রামলাল স্বেচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। কালীর বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া সে সামান্য সাহায্য করিয়াছে মাত্র এবং সে না থাকিলে কালী একাই সব করিত এমন কথা পর্য্যন্ত কালী বলিল।

বেলা যখন ১০টা তখন গাড়ি আসিল। ইনিস্পেক্টর বাবু গাড়িতে লাস উঠাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়িবদ্ধ কালী ও রামলালকে চালান দিয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িল। ক্রমে ক্রমে সেখানকার লোকের ভিড়

কমিতে লাগিল এবং কেহ বা কালীকে গালি দিতে দিতে, কেহ বা শশী ভট্টাচার্য্যের জন্য আক্ষেপ করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নিতান্ত দার্শনিক ভাবে মানবচরিত্রের এতাদৃশ দুর্জ্ঞেয়তার কথা আলোচনা করিতে করিতে এবং কেহ কেহ বা কালী ও রামলালের কাহার কিরূপ সাজা হইবে তাহার বিচার করিতে করিতে বাটী ফিরিল। কিন্তু কয়েকদিন প্রতিবাসী নরনারীগণ নিরন্তর এই কাণ্ডের বিবিধ ভঙ্গীতে আলোচনা করিতে ভুলিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে শশী ভট্টাচার্য্য হত হন তাহার মাসাধিক কাল পরে একদিন সন্ধ্যার অনতিকাল পূর্ব্বে রাধানাথ রায়ের বহ্বায়ত ভবনের অন্তঃপুরমধ্যস্থ এক সুবৃহৎ ছাতের উপর রমাপতি পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমাপতি একাকী নহেন। তাঁহার বামকরের মধ্যমাঙ্গুলি ধারণ করিয়া এক সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বালিকা সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। স্তবকে স্তবকে ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি বালিকার কপালে, গ্রীবায়, কর্ণমূলে ও আস্তে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। বালিকার বয়স চারি বৎসর। তাহার আকর্ণ বিস্তৃত, স্থূল সূক্ষ্ম ভ্রূযুগতলস্থ আয়ত, সমুজ্জ্বল লোচন, তাহার দেহের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও লাবণ্য-জ্যোতিঃ, তাহার কোমল রক্তাভ বিম্বোষ্ঠের হসিত ভাব, এবং তাহার অস্ফুট ও ভঙ্গ, মৃদু ও মধুর, আনন্দ ও হাস্যময় বাক্যাবলী যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে সে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। এই বালিকার নাম মাধুরী। পাঁচ বৎসর হইল রমাপতি ও সুরবালা বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছেন, বিধাতা তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয় বন্ধন দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে এই কন্যা সন্তান, এবং তাহার দুই বৎসর পরে একটী সুকুমার পুত্র সন্তান প্রদান করিয়া

তাঁহাদিগের প্রতি কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। জগতে যে যে পদার্থ মানবের সুখ-সম্বিধানে সমর্থ তাহার সকলই তাঁহাদের আয়ত্ত। ধনই, অনেক স্থলে, ভোগবিলাসানুরক্ত বা পরোপকারপ্রবণহৃদয় মানবের আশা নিবৃত্তির অনন্ত সাধন এবং তৃপ্তির সর্ব্বপ্রধান উপাদান। সে ধন, প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রমাণে, তাঁহাদের করায়ত্ত। দাম্পত্য প্রণয়, সৎস্বভাব সম্পন্ন যুবকযুবতীর পক্ষে, সর্ব্বসুখবিধায়ক সামগ্রী। ভগবৎ-কৃপায় এই সৌভাগ্যবান্ যুগল তাদৃশ প্রণয়ের আদর্শ স্থলাভিষিক্ত হইবার উপযোগী। এই সকল দুর্ল্লভ সুখও শিশুকণ্ঠোত্থিত অস্ফুট আধ আধ স্বরের সহিত বিজড়িত না থাকিলে মধ্যমণিহীনা রত্নহারের ন্যায়, সতীত্ব সম্পত্তিশূন্যা সুন্দরীর ন্যায়, কপর্দ্দকমাত্রবিহীন দাতার ন্যায় এবং সুরভি-কুসুমপরিশূন্য কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানের ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল বলিয়া অনেকে বোধ করেন। কিন্তু অনুকূল বিধাতৃ-অনুকম্পায় তাঁহাদের সে অভাবও নাই। সুতরাং তাঁহারা সৌভাগ্যশালীগণের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু জগতে অব্যাহত সুখ সম্ভোগ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। তাঁহারা বড় দাগা পাইয়াছেন—বড় ঝড় তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। রাধানাথ ও তাঁহার ব্রাহ্মণী উভয়েই ইহলোক হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনতিকাল পরে রাধানাথ রায় লীলা সম্বরণ করেন। সেই দারুণ দুর্ঘটনার তিনমাস পরে, সেই দুর্দ্দমনীয় শোক কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবার পূর্ব্বেই, সুরবালার জননী পতিপরিগৃহীত পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে দুই সুমহান্ তরুর সুশীতল ছায়াতলে নিরুদ্বেগে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আর তাঁহাদের নাই। যে দুই জীবন সংসারের কঠোর সংঘর্ষণ হইতে অন্তরিত থাকিয়া, আনন্দ ও সৌভাগ্যসম্ভোগমাত্র লক্ষ্য করিয়া, সুখে অতিবাহিত হইতেছিল তাহাদের অতঃপর সংসারের সম্মুখে বুক পাতিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। যে পর্ব্বতের অন্তরালে তাঁহারা অবস্থিত ছিলেন তাহা চূর্ণীকৃত হইয়াছে। তাঁহাদের সুখ ও সন্তোষ, আনন্দ ও প্রীতি ভোগ ও বিলাস বিধায়ক ব্যবস্থা করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল, তাঁহারা আর নাই। রাধানাথ রায়, ভবরঙ্গভূমি হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, এক উইল পত্র-

দ্বারা স্বীয় বিপুল বিভবাদির বিহিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই উইল অনুসারে তাঁহার জামাতা রমাপতি সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব ও সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছেন।

রমাপতি মাধুরীর সঙ্গে বেড়াইতেছেন। মাধুরী তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে বলিলেই হয়; কারণ সে কখন জোরে জোরে চলিয়া পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কখন বা পশ্চাতের বা পার্শ্বের পদার্থ বিশেষে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া পা ফেলিতে ভুলিয়া যাইতেছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে রমাপতি বাবুও থামিতেছেন। আর যে তাহার গজর গজর বকুনি তাহার কথা আর কি বলিব। বেদ কোরাণের বহির্ভূত সে অনেক গল্প করিতেছে। ভাষার উচ্চারণবিধির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, পদস্থাপনের রীতি ও পদ্ধতি উপেক্ষা করিয়া এবং প্রসঙ্গের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে প্রসঙ্গান্তর অবতারিত করিয়া মাধুরী ব্যাকরণ ও ন্যায় শাস্ত্রের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করিতেছে। কিন্তু তাহার সেই অসম্বদ্ধ ও অযথা-ব্যক্ত বাক্যাবলী তাহার পিতার কর্ণে অজস্র ধারায় মধুবর্ষণ করিতেছে। স্বভাবসঞ্জাত অপত্যস্নেহ, তনয়ার তাদৃশ অপরিস্ফুট বচনবিন্যাস মধুময় করিবার প্রধানতম হেতু হইলেও, মাধুরীর সুস্বরবিজড়িত ভঙ্গ ভাষা নিতান্ত নির্লিপ্ত শ্রোতৃবৃন্দের অন্তরকেও মোহিত করিতে সমর্থ।

পিতা ও পুত্রী যখন এইরূপে নিযুক্ত সেই সময়ে সুন্দরীশিরোমণি-স্বরূপা সুরবালা সেইস্থানে সমাগতা হইলেন। তাঁহার অঙ্কে এক নির্ম্মল-কান্তি, নিরুপম নয়নানন্দ নন্দন। সেই ভুবনমোহন পুত্র দূর হইতে রমাপতি ও মাধুরীকে দেখিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে, মধুরস্বরে, মধুময় হাস্যের সহিত, "ধু—ধু—বা—বা" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। শিশুর নিতান্ত নবীন বাগ্‌যন্ত্র মাধুরীর নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। সে সেই জন্য স্বকৃত অত্যদ্ভুত ব্যাকরণের সহায়তায়, সেই কঠোর শব্দের ভূরিভাগ 'ইৎ' করিয়া কেবল ধু টুকু বজায় রাখিয়াছিল। শিশুর সেই অমৃতময় বাক্য কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রমাপতি ও মাধুরী ব্যস্ততা সহ সেই দিকে ফিরিলেন। রমাপতি দেখিলেন, অপূর্ব্ব দর্শন! সেই রবিকরপরিশূন্য, স্নিগ্ধ ছায়ারাশি পরিবৃত, সমুচ্চসৌধশিরে; সেই নীড়গামী, নানাদিগ্‌বিহারী

বহুভাষী, বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবেষ্টিত দৃশ্যমধ্যে; সেই প্রীতিপ্রদ, প্রবহমান, সুস্নিগ্ধ, সুশীতল, বসন্তানিল সাগরে, রমাপতি দেখিলেন, সুরবালা, তাঁহার সুরনায়ক তুল্য সুকুমার শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, দাঁড়াইয়া! মৃদু মন্দ বায়ু হিল্লোলে শিশুর কেশের গুচ্ছ নাচিয়া নাচিয়া উড়িতেছে এবং সুরবালার প্রলম্বিত অঞ্চল কেতনবৎ উড্ডীয়মান হইতেছে। বালিকা সুরবালা এখন যুবতী হইয়াছেন। যৌবনসমাগমে এখন সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্য পূর্ণোজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত হইয়াছে। রমাপতি অতৃপ্ত নয়নে সেই লাবণ্যময়ীর স্বর্ণকান্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মাধুরী, "বাবা! ডেক ডেক, ঐ মা" বলিয়া সেই দিকে প্রধাবিত হইল। তখন রাজরাজমোহিনী সুরবালা মাধুরীর হস্তধারণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। রমাপতিও কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া মধ্যপথে সুরবালার সমীপাগত হইলেন এবং বলিলেন,—

"এই বুঝি তোমার শীঘ্র আসা? আঠারো মাসে বুঝি তোমার বৎসর?"

সুরবালা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"তা আমি জানি। এতক্ষণে তোমার হুকুম তামিল করিতে না পারায়-অবশ্যই দাসীর অপরাধ হইয়াছে। আমি আসিতেছি এমন সময়ে পুঁটের মা ছেলের জন্য জ্বরের ঔষধ চাহিতে আসিল। তাহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে দেরি হইল। তা যাই হউক, দাসী গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া মান ভিক্ষা করিতেছে। যদি নিতান্তই হুজুর তাহাকে ক্ষমা না করেন তাহা হইলে দাসী শেষে এমন কল খাটাইবে যে হুজুরের তখন নাকালের সীমা থাকিবে না।"

কিন্তু রমাপতি তখন উত্তর দিবেন কি? সেই রূপসীর মধুর বাক্য, মধুর ভাব, এবং মধুর ভাষা তাঁহাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। কথায় কি ছাই তখন প্রাণের কথা বাহির হয়? কটা কথা লইয়াই বা ভাষা, কটা ভাবই বা তাহাতে ব্যক্ত হয়! রমাপতি সে কথার উত্তর দিবার কোন প্রয়াস না করিয়া, খোকাকে কোলে লইবার জন্য হাত পাতিলেন। খোকা সানন্দে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার কোলে পড়িল। রমাপতি বারম্বার তাহার বদন চুম্বন করিলেন। তখনই কয়েক জন ঝি, তাঁহাদের কোন

আদেশ আছে কি না জানিবার নিমিত্ত, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রমাপতি মাধুরী ও খোকাকে লইয়া ছাতে ছাতে বেড়াইতে আদেশ করিলেন। তখন সুরবালা আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"মানিনীর মান কি ভাঙ্গিয়াছে? না শেষে মানের দায়ে নিজে নাকে কাঁদিতে সাধ আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"সাধ যাহা আছে তাহা দেখিতে পাইবে এখনই। 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা' জানতো? দোষ করিলে নিজে, নাকে কাঁদাইতে চাও আমাকে! তোমার মত লোক বিচারক হইলে দেশে সুবিচারের স্রোত বহিয়া যাইবে।"

সুরবালা রমাপতির হাত ধরিয়া অন্য এক ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি বিচারক হইলে এই কপট পুরুষগুলাকে বিলক্ষণ জব্দ করিয়া তবে ছাড়ি।"

রমাপতি জিজ্ঞাসিলেন,—

"সকলের প্রতিই কি তাহা হইলে ধর্ম্মাবতার সমান বিচার করিবেন? কেহই কি আপনার ন্যায় দণ্ডের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না?"

সুরবালা মুখের হাসি অঞ্চলে চাপিয়া বলিলেন,—

"কেহ না। যাহাদের মধ্যে সকলেই কপট তাহাদের আবার ছাড়াছাড়ি কি? সকলেরই সাজা।"

রমাপতি বলিলেন,—

"পুরুষ যে অত্যন্ত কপট তাহার আর সন্দেহ কি? তাহা যদি না হইবে, তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য কখন কি কালীকে এত ভাল বাসিত?"

সুরবালা কালীর নামোচ্চারিত হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, তোমরা—তোমরা দেবতা।—আমরা সামান্য মেয়ে মানুষ—আমরা তোমাদের মহিমা কি বুঝিব? তোমরা আমাদের মত ক্ষুদ্র কীটকে পদে দলিত না করিয়া হৃদয়ে স্থান দেও, এ তোমাদের আশ্চর্য্য দেবত্ব। বলিলেন,—

"জানি না কোন্ স্বর্গে শশী ভট্টাচার্য্যের স্থান হইবে। স্বর্গ যদি থাকে এবং স্বর্গে যদি শ্রেণী থাকে তাহা হইলে শশী ভট্টাচার্য্য অবশ্যই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে স্থান পাইবেন। আর কালী? নরকেরও কি নরক নাই? সে কেন মানবদেহ পাইয়াছিল? বিধাতঃ! তোমার রাজ্যে তাহার জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছ?"

রমাপতি দেখিলেন, ক্রোধে ও হৃদয়ের যাতনায় সুন্দরীর বদন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। লোচনযুগল উজ্জ্বল হইয়াছে। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবন্ যে হস্ত হইতে কালীর ন্যায় পিশাচীর সৃষ্টি, এই দেবীও কি সেই হস্তেরই ফল? সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

কিন্তু মানবরাজ্যে কালীর ঘোর দুষ্কৃতির কি শাস্তি হইল তাহা আমি জানিতে পাই নাই। তাহার পাপ আত্মা আজিও কি সেই দেহে আছে?"

রমাপতি বলিলেন,—

"বিচারে কালীর ফাঁসি ও রামলালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম হইয়াছে। বোধ হয় আর পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কালীর ফাঁসি হইয়া যাইবে।"

সুরবালা আবার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"ফাঁসি হইবে! ফাঁসিই কি তাহার শাস্তি? ফাঁসি না হইলে কি চলে না? কিন্তু সে কথায় আমাদের কাজ কি? যাহা হইবার তাহাই হউক।"

অনেকক্ষণ আর কেহই কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর সুরবালা বলিলেন,—

"তোমার সহিত আমার এবার ভারি ঝগড়া হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"অপরাধ?"

সুরবালা মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—

"মোকদ্দমার জন্য তুমি কলিকাতায় যাইবে বলিতেছ, সেখানে দশ পনর দিন দেরি হইবে তাহাও বলিতেছ। কিন্তু একবারও আমাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার কথাটী বলিতেছ না। বেশ, যাও তুমি, আমি ইহার এমন শোধ তুলিব যে তোমাকে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখিতে হইবে।"

রমাপতি বলিলেন,—

"কেন তোমাকে লইয়া যাইব? আমার কি আর কেহ নাই? মনে কর আমার সুকুমারীর সহিত দেখা হইবে।"

সুরবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"এমন দিন কি হইবে? ভগবান যেন তাহাই করেন।"

রমাপতি বলিলেন,—

"এমন দিন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই জান বলিয়া একথা বলিতেছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা যাহাই মনে কর, সুকুমারী বাঁচিয়া আছেন। মনে কর যদিই কলিকাতায় গিয়া সুকুমারীকে পাই তাহা হইলে তুমি কি কর?"

সুরবালা নীরব। তাঁহার মুখমণ্ডল গম্ভীর। তাঁহার হৃদয় ভাবে পূর্ণ। অনেকক্ষণ পরে তিনি উত্তর দিলেন,—

"কি যে করি তাহা কেমন করিয়া বলিব? সেই দেবী, সেই প্রেমময়ী, সেই শক্তিময়ীকে আমার মন প্রতিদিন অবনত মস্তকে বার বার প্রণাম করিয়া থাকে। সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই—আহা বিধাতঃ, তুমি সকলই ঘটাইতে পার, এ অধীনার এ প্রার্থনা কি তুমি পূরণ করিতে পার না?—সেই দেবীকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, যাঁহাকে প্রতিদিন ধ্যান করি—কল্পনায় যাঁহার মূর্ত্তি গঠিত করিয়া প্রতিদিন পূজা করি—আমার সেই দিদিকে যদি সম্মুখে দেখিতে পাই, তাহা হইলে—তাহা হইলে অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে দেখিলে ভক্ত যাহা করে, আমিও তাহাই করি। তাহা হইলে স্বর্ণ সিংহাসন পাতিয়া তাঁহাকে আমার এই দেবতার পার্শ্বে বসাই, স্বহস্তে এই দেবযুগলের চরণ ধৌত করিয়া এই কেশরাশি দ্বারা তাহা মার্জ্জিত করি এবং ভক্তি গদগদ হৃদয়ে দূরে দাঁড়াইয়া সেই দেবযুগলের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করি। কিন্তু সে সৌভাগ্য কি কখন আমার কপালে ঘটিবে?

রমাপতি মুগ্ধভাবে সুরবালার কথা শুনিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, 'সত্যই কি সুরবালা মানবী? অস্থি, মাংস, বসা, চর্ম্মধারী মানবশরীর কখনই এবম্বিধ মহোচ্চ মনোবৃত্তির আধার হইতে পারে না। এই দেবীর বদনের ভাব, কথার প্রণালী, বাক্যের শক্তি আলোচনা করিয়া কে

বলিবে যে এ সকল উক্তিতে বিন্দুমাত্র কপটতা আছে? কে বলিবে এই সকল ভাব এই দেবীর অন্তরের অন্তর হইতে সমুদ্ভূত নহে?' তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—

"তোমার যে এই দেবভাব, সুরবালা, মনুষ্যলোকে ইহার আর তুলনা নাই। মনুষ্যশরীর লইয়া তোমার এরূপ ভাব কেন হইল বহু আলোচনাতেও তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি না।"

সুরবালা বলিলেন,—

"হৃদয়দেব! আমার এভাবে আমি বিস্ময়ের কারণ কিছুই দেখি না। দেবভাব কাহাকে বলে তাহা এ অধম নারী বুঝিতেও অক্ষম। আমার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই দিকে প্রধাবিত। যখন হইতে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলে আমার চক্ষে পড়িয়াছ, যখন তোমার পত্নীবিয়োগে বিজাতীয় কাতরতা আমি দেখিয়াছি, যখন তোমার সেই দারুণ দুর্বিপাক সময়ের কাহিনী সমস্ত তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি, তখনই তোমাকে দেবতা বলিয়া আমার ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই ভক্তি তোমার দয়া, সরলতা, কোমলতা, বিদ্যা ও রূপ দেখিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন স্থানে উপনীত হইয়াছে যে আমার হৃদয়ে তাহার আর স্থান হয় না। তখন কিসে তোমাকে সুখী করিতে পারিব, কিসে তোমার কাতর হৃদয়কে প্রফুল্ল করিতে পারিব, কিসে তোমার সেই শোকভারাবনত হৃদয়কে আনন্দময় করিতে পারিব, ইহাই আমার জীবনের চেষ্টা, লক্ষ্য, বাসনা এবং প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। অন্য সাধ আমার জীবনে নাই। তোমার সুখ ভিন্ন, তোমার আনন্দ ভিন্ন, আমার প্রাণের আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। তুমি দেবতা, আমি দেবসেবায় আমার দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আছি। আমার আর স্বতন্ত্রতা নাই। সার্থক আমার জীবন, সার্থক আমার জন্ম। আমার দেবতা আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়াছেন; আমার প্রাণের প্রাণের বিরস বদনে এখন হাস্যের জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ তথায় এখন খেলা করে এবং সুখ তথায় এখন বিচরণ করে।"

তখন সুরবালা সেই নিশানাথবিরাজিত হৈমকরোজ্জ্বল গগনতলে

অশ্রুময় নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিয়া উভয় বাহুতে রমাপতির পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"আমার ভক্তি ও মুক্তি, সুখ ও স্বর্গ, আশা ও সম্পদ সকলই তুমি। আমি তোমারই দয়ায়, তোমারই চরণপ্রসাদে ধন্য হইয়াছি। আমার দ্বারা—তোমার এই সামান্য দাসীর সামান্য সেবায় তোমার প্রাণে আবার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এ অধম দাসীর পক্ষে ইহার অপেক্ষা আর কিছু প্রার্থনার আছে কি? তাই বলিতেছি, তোমারই চরণাশীর্ব্বাদে তোমার এ দাসী ধন্য হইয়াছে।"

তখন রমাপতি সেই স্থানে সুরবালার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার লোচন দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতেছে। কোথায় এমন লোক আছে যে এমন অপার্থিব প্রেমের অধিকারী? এমন প্রেম স্বর্গেও আছে কি? এ সংসারে রমাপতি তুমিই ভাগ্যবান! সুরবালা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"আমার যাহা ব্রত তাহার শেষ নাই—সীমা নাই। তোমাকে সুখী করাই আমার যোগ ও সাধনা। কিন্তু সুখের তো সীমা নাই। তোমাকে সুখী করিতেছি বটে, কিন্তু সুখের সর্ব্বোচ্চ সোপানে না উঠিতে পারিলে তোমার এ সেবিকার পরিতৃপ্তি নাই। যদি কখন দিদির সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তোমাকে আরও সুখী করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা তো হইবার নহে। যদি নিজ প্রাণের বিনিময়েও সেই ভাগ্যবতীর সাক্ষাৎলাভ ঘটিত, তাহা হইলে তোমার দাসী এখনই তাহা সম্পন্ন করিত।"

তখন রমাপতি বলিলেন—

"সুরবালা, তোমার কামনা অতুলনীয়। জগতে এমন প্রেমের তুলনা নাই। তোমারই কৃপায় যে অভাগা ছিল সে এখন পরম ভাগ্যবান্। একদা এ হৃদয় সুকুমারীময় ছিল সন্দেহ নাই; এখনও হৃদয় যে সুকুমারীর স্মৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছে, এমন নহে, এবং কখন স্মৃতি হইতে সে মূর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু, সুরবালা, এখন তুমিই আমার জীবন ও মরণ, আশা ও নিরাশা, সম্পদ ও বিপদ সকলই। এ জীবন তোমারই

চেষ্টায়, তোমারই কৃপায়. তোমারই জন্ত রক্ষিত। যদি, সুরবালা, যদি তুমি আমার এ শুষ্ক হৃদয়ে অজস্র ধারে শান্তিসুধা না সেচন করিতে, যদি তুমি এ দগ্ধ তরুতে প্রেমের কুসুম না ফুটাইতে, যদি তুমি এ অন্তর প্রান্তরে আনন্দের নদী না বহাইতে তাহা হইলে এতদিন আমার কি দুর্গতি হইত? যে দেবী আমার ন্যায় হীনজনের প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে সুখসাগরে ভাসাইয়াছেন, তিনিই তাহাতে সকল প্রবৃত্তি সজীব রাখিয়াছেন। সুকুমারী, মৃত্যুকবলিত হইলেও, আমার হৃদয়ে তিনি যে এখনও বাঁচিয়া আছেন সে কেবল তোমারই যত্নে এবং তোমারই বাসনায়। আমি এখন যে প্রেমের অধিকারী, আমার সৌভাগ্যক্রমে যে আনন্দ-সাগরে আমি এখন ভাসিতেছি, মানবজন্ম লাভ করিয়া কেহ কখন কোথায়ও তাহা পায় নাই। এমন প্রেমে যে মত্ত, এমন সুখে যে ভাসমান, আর কোন স্মৃতিই তাহার থাকা সম্ভব নহে। কিন্তু তাহা তোমারই চেষ্টায় এখনও আমার হৃদয় ত্যাগ করে নাই। কিন্তু, সুরবালা, তুমি ভিন্ন এখন আমার গতি নাই। আমার হৃদয়ে যে সুকুমারী মূর্ত্তি আছেন তাহা তোমার দ্বারাই অধুপ্রাণিত, তোমার তেজে তাহা তেজোময়. তোমার প্রেমে তাহা প্রেমময়। এখন আমার সুকুমারী স্বতন্ত্র সুকুমারী নহে। এখন আমার সুরবালা ও সুকুমারী অভিন্ন ও এক। এখন সুরবালা যদি সুকুমারী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়া আমার একদিনও চলিবে না এবং যদি আমার সুকুমারী সুরবালাময়ী না হয় তাহা হইলে তাহা লইয়াও আমি একদিনও থাকিব না। অতএব দেবি, তোমার কৃপায় আমি আমার হারাধন সুকুমারীকে অনেক দিন পাইয়াছি। যাহার স্বতন্ত্রতা নাই তাহা স্বতন্ত্ররূপে পাইবার বাসনা কখন এ ভাগ্যবান্ মানবের মনেও হয় না।”

সেদিন আর যে সকল কথা হইল তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। এই স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ দম্পতী বহুক্ষণ প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য কালীর ফাঁসি। পূর্ব্ব দিবসেই আলিপুর জেলখানার প্রাঙ্গনে এই ভয়ানক ব্যাপার সংসাধনোপযোগী সমুদয় আয়োজন হইয়াছে। সেই জীবনান্তকারী প্রকাশ্যরূপে মানবপ্রাণবিনাশক ভয়ানক যন্ত্র, সদর্পে আপনার বিকট বাহু উত্তোলন করিয়া, দাঁড়াইয়া আছে। সর্ব্বলোক সমক্ষে মনুষ্যঘাতক, অধম জীবিকাবলম্বী, হৃদয়হীন জল্লাদ বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। স্বয়ং জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরেরা সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত। আর উপস্থিত পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনিস্পেক্টর, সব ইনি-স্পেক্টর, কয়েকজন হেড কনষ্টেবল এবং অনেক কনষ্টেবল। লোকের জীবন রক্ষার জন্য চিকিৎসকেব প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির জীবনান্ত সংঘটিত হইয়াছে কি না, তাহারই সমর্থন করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ডাক্তার সাহেব উপস্থিত। সুতরাং ফাঁসির ঘটা খুব।

চারিদিকে অনেক লোক। লোকে প্রায় তাবৎ প্রাঙ্গন ছাইয়া গিয়াছে। অনেক লোক এই ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে না পাইয়া বাহিরে গাছের উপর ও অট্টালিকার চূড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের আগ্রহই বা কত! যেন আজি এখানে কি উৎসবই হইবে এবং তাহা দেখিতে না পাইলে তাহাদের জীবন ও জন্মই বিফলে যাইবে। ধন্য মানবের অদম্য কৌতূহল? যে ব্যাপার স্মরণে শরীর শিহরে, যে লোমহর্ষণকাণ্ড মনে করিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং যাহার আলোচনা করিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, সেই বিকট দৃশ্য দেখিবার জন্যও এত লোকসমারোহ হইয়াছে! একজন মানব—সজীব, সচল এবং সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত মানব, রাজকীয় শক্তির বিরোধে প্রতিকূল চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে জানিয়া, যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অচিরে, অবনত মস্তকে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবে; এই অচিন্তনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য তথায় লোকে লোকারণ্য। এরূপ বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হৃদয়ের কোমলতা বিধ্বংসিত এবং পরুষতা সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

তবে জগতের কিছুই নিরবচ্ছিন্ন অকল্যাণকর নহে। নিপাতকারী হলাহলেরও রোগাপনোদনের শক্তি আছে। তাদৃশ চক্ষে এ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলে অনুমিত হইতে পারে যে, এতাদৃশ ব্যাপার সম্বন্ধে কৌতূহল নিবারণ করিলে, দর্শকের হৃদয়ে উপস্থিত দৃশ্য নিতান্ত বদ্ধমূল হইয়া স্থায়ী অঙ্কপাত করে এবং তাহাতে সমাজের প্রভূত হিত সংসাধিত হয়। কিন্তু যাহারা এই জন্য প্রস্তুত হইয়া, যাতায়াত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, হয় ত কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় সময়নাশ ও কার্য্যক্ষতি করিয়া এই কাণ্ড দেখিতে যায়, তাহাদের কেহই, ইহার ফলস্বরূপে পরিণামে সমাজের হিত সাধিত হইবে, বা হৃদয়ে স্থায়ী অঙ্কপাত হওয়া আবশ্যক ভাবিয়া কখনই যায় না। সুতরাং নিতান্ত জঘন্য কৌতূহল নিবৃত্তি ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মনুষ্য যে পশুরই রূপান্তর এবং মানব হৃদয় যে এখনও পাশব প্রবৃত্তির নিতান্ত বশীভূত এইরূপ নিষ্ঠুরতায় উৎসাহ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আর অল্পকাল পরেই কালীকে ঐ সম্মুখস্থ মরণযন্ত্রে লম্বিত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে হইবে। রোগ বা কোন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে তাহার দেহ ও আত্মার চিরবিচ্ছেদ ঘটিবে না। মানব আত্মকৃত ব্যবস্থা-বলে, প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিবে। যে অত্যুৎকট অচিন্তনীয় পাপে তাহার হস্ত কলঙ্কিত হইয়াছে, যে নৃশংস কার্য্য সমাধা করিয়া সে সমাজের বিরুদ্ধে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছে, মানব তাহার শাস্তিস্বরূপে এই দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে সমাজ সংস্থিতির জন্য পাপীর শাস্তি বিধান নিতান্ত আবশ্যক। সংসারের পাপস্রোত মন্দীভূত করিবার জন্য পাপাসক্তের বিহিত দণ্ড সতত ও সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয়। কালীর পাপানুরূপ শাস্তি প্রয়োগের অভিপ্রায়েই আজি তাহাকে বিগতজীব করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। মানবকৃত বিধিব্যবস্থায় ইহাই তাদৃশ মহাপাপীর চূড়ান্ত শাস্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়া আছে। কেহ কেহ এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এইরূপে প্রাণনাশ করিলেই কি এতাদৃশ ঘোর পাপীর পাপোচিত শাস্তি হইয়া থাকে? তাঁহারা বলেন ভোগের পরিমাণানুসারে শাস্তির গুরুতা ও

লঘুতা স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। কালীর ন্যায় পাপীয়সীর বহুকাল ধরিয়া শাস্তি ভোগ করা আবশ্যক এবং সে শাস্তির জ্বালা তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে ও হাড়ে হাড়ে মিশিয়া যাওয়া আবশ্যক। যতদিন সে বাঁচিবে ততদিন কদাচ যাহাতে এ শাস্তির কথা, ইহার যন্ত্রণার স্মৃতি, সে একবারও ভুলিতে না পারে, এমন কোন সাজা তাহার ন্যায় পাতকীর জন্য নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। অধুনা তাহার নিমিত্ত যে শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে, বলিতে গেলে, তাহা কেবল দুই মিনিটের শাস্তি। কয়েকদিন —সত্যই কয়েকটী দিনমাত্র দণ্ডিত ব্যক্তি একটা দুরন্ত বিভীষিকায় উৎপীড়িত হয় বটে; কিন্তু তাহার পর দুই মিনিটে—কেবল ক্ষুদ্র দুই মিনিটের মধ্যে তাহার সকল বিভীষিকা ও শাস্তির অবসান হইয়া যায়। এত বড় অপরাধী কেবল দুই মিনিটের শাস্তি ভোগের পর সকল যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার লাভ করে এবং তখন সে মানব সমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, আনন্দ ও বিষাদ, সম্পদ ও বিপদ, সুখ ও দুঃখ, জ্বালা ও শান্তি, হাস্য ও রোদন সকল বিষয়েরই হাত ছাড়াইয়া যায়। এরূপ দুষ্কৃতির সহিত তুলনা করিলে তস্কর, দস্যু, প্রবঞ্চক প্রভৃতির অপরাধ নিতান্তই লঘু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাদেরও বহুকাল ধরিয়া অতি কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, অথচ এমন ভয়ানক পাপী কয়েকদিনের ভয় ও দুই মিনিটের যাতনা ভোগ করিয়া, আমাদের হাত হইতে পার পাইয়া যায়, ইহা বস্তুতই নিতান্ত হাস্যজনক অব্যবস্থা।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কালী যে পাপ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে দুই মিনিটের বেশী শাস্তি ভোগ করিতে হইল না সত্য, কিন্তু সে মানব হৃদয়ে যে ভয়ের সঞ্চার করিয়া রাখিয়া গেল, লোকসমূহকে যে শিক্ষা দিয়া গেল তাহার জন্য চিরদিনই সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। কথাটা অবশ্যই স্বীকার্য্য; কারণ মরণের অপেক্ষা মরণের ভয়টা বড়ই ভয়ানক। কালী মরিয়া নিজে যত যাতনা ভোগ করুক না করুক, তাহার এইরূপ মৃত্যু দেখিয়া লোকের মনে এইরূপ কার্য্যের এই ফল বলিয়া, যে এক ভয় ও সাবধানতা জন্মিবে, সমাজের পক্ষে তাহা বড়ই কল্যাণকর। কিন্তু তাহাতে কালীর কি? তোমার কল্যাণ বা অকল্যাণ কালী তো আর

দেখিতে আসিবে না ; তাহার এত বড় পাপে তোমরা যে দুই মিনিটের শাস্তি দিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ তাহার যুক্তি কোথায় ? কেন, তাহা অপরাধের অনুরূপ সাজা কি তোমরা দিতে জান না ? একটা বেগুন চুরি করিলে তোমরা তাহার নাকে দড়ি দিয়া ঘানিতে ঘুরাইতে পার, আর এইরূপ পতিহন্ত্রীকে দুই মিনিটের বেশী সাজা দিতে পার না ? পরকালে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া সাজার হ্রাসবৃদ্ধি করিতে তোমার কোন অধিকার নাই; কারণ পরকালে কি হইবে তাহা জানিতে তোমার হাইকোর্টের জজদেরও কোন ক্ষমতা নাই। যাহা কেহ জানে না ও বুঝে না তাহা হিসাবে ধরা যায় না। সুতরাং পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, ফাঁসির পূর্ব্বে কয়দিনের ভয়ই ইহকালে কালীর দণ্ডের প্রধান অংশ। কিন্তু এই কি সাজার চূড়ান্ত ? ইহার চেয়ে কঠিন সাজা কি আর হইতে পারে না ? অবশ্যই কঠিনতর সাজা উদ্ভাবিত হইতে না পারে এমন নহে। যেমন অপরাধ তাহার তেমনই দণ্ড হইলে লোক-শিক্ষারও ব্যাঘাত হইবে না এবং ন্যায়েরও সম্মান রক্ষিত হইবে।

কেহ কেহ ইহার অপেক্ষা আরও এক শক্ত কথা বলেন। তাঁহারা বলেন, যাহা তুমি দিতে পার না তাহা লইবার তুমি কে বাপু ? তোমার শত শত জজ, শত শত আদালত, শত শত পার্লেমেণ্ট এবং শত শত রাজারাণী মিলিয়া, শত শত বৎসর ভাবিলেও, একটা মানুষ তৈয়ার করিবার আইন করিতে পারেন কি ? তাহা পারেন না। যাহা গড়িবার তোমাদের ক্ষমতা নাই, তাহা ভাঙ্গিতে তোমরা এমন তৎপর কেন ? এমন করিয়া আইনের দোহাই দিয়া, নিয়ত মানুষ খুন করিতে তোমাদের অধিকার কি ?

কেহ কেহ আরও একটা গুরুতর কথা উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যাহারা একবার পাপ করিয়াছে তাহারা কি আর কখন ভাল হইতে পারে না ? একবার যাহার পদস্খলন হইয়াছে, আবার কি সাবধান হইয়া চলিতে পারে না ? যদি তাহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ, এরূপ অন্যায় নরহত্যায় জগতের যে কত সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। হয়ত সেই মহাপাপী, বাঁচিয়া

থাকিলে, হৃদয়ের এমন উন্নতি করিতে পারিত, হয়ত সে সংসারের জ্ঞান ও সৌভাগ্য বৃদ্ধির এমন সহায় হইত যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তুমি তাহার অপরাধানুরূপ ভাল শাস্তি দিতে পারিলে না, অথচ তাহার আত্মোন্নতি সাধনের কোন সুযোগ করিতে দিলে না, তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহাকে অবসর দিলে না এবং তাহার দ্বারা যদি জগতের কোন হিত সঙ্ঘটিত হইতে পারিত তাহাও হইতে দিলে না। ইহার নাম বিচার না বিচারের ব্যভিচার ?

কিন্তু আমরা অপ্রাসঙ্গিক কথায় বহুস্থান ব্যয় করিয়াছি। ফাঁসি বিধেয় হউক না হউক, কালীর আজি ফাঁসি। সব প্রস্তুত, নির্দ্ধারিত সময়ও প্রায় উপস্থিত। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর একবার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন ; তাহার পর জেলখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কারাগারের সেই লৌহদ্বারের মধ্য হইতে বহু কনষ্টবল এক অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোককে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সকলের দৃষ্টি সেই দিকে সঞ্চালিত হইল। চারিদিক হইতে 'আসিতেছে, ঐ আসিতেছে,' শব্দ উঠিল। ক্রমে, পশ্চাদ্দিকে হাতকড়ি দ্বারা নিবদ্ধহস্ত, আসামী ও কনষ্টবলগণ বধ্যভূমির নিকটস্থ হইল, অতি নির্ভীক পাদবিক্ষেপে, সেই লোকসমুদ্রমধ্যে অবগুণ্ঠনবতী অগ্রসর হইতে লাগিল। সে যথাস্থানে উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আইন অনুসারে এখনই তোমার ফাঁসি হইবে, তাহা তুমি জান। এখন তুমি কিছু বলিতে চাহ কি ?"

কনষ্টবলগণ চারিদিকের কোলাহল নিবারণের জন্য "চুপ চুপ্" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। সমাগত লোক সকল রুদ্ধনিশ্বাসে হত্যাকারিণী কালীর উত্তর শুনিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন কালী অতি মধুর, কোমল ও ভীতিশূন্য স্বরে উত্তর দিল,—

"আমার অঙ্গে করস্পর্শ না হয় এইরূপ ভাবে একবার আমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিতে আজ্ঞা করুন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামীর বাসনানুযায়ী আদেশ করিলে একজন কনষ্টবল সাবধানতা সহ তাহার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। কিন্তু একি ?

এ যে সাক্ষাৎ স্বর্গকন্যা! ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কামিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইলেন। রমণী সুন্দরীর শিরোমণি। সুন্দরী ধীরে ধীরে চারিদিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার নিষ্পাপ বদনশ্রী, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও অপার্থিব সৌকুমার্য্য দেখিয়া দর্শকগণ অবাক হইল। সেই সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতায় সেই ঘৃণিত বধ্যভূমিও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সকলেই ঘোর বিস্ময়াকুল! তখন জজ সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাণে কাণে বলিলেন,—

"একি এ? আমি যে আসামীর উপর ফাঁসির হুকুম দিয়াছি, এ কখনই সে নহে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন,...

"তাইত, আমি যে আসামীকে দায়রা সোপরদ্দ করিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

পুলিস সাহেব মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন,—

"আমি যে আসামীকে দুই তিন দিন হাজতে দেখিয়াছি, এ কখনই সে নহে!"

ইনিস্পেক্টর বলিলেন,—

"আমি যে আসামীর জবানবন্দী লইয়াছি এবং বার বার দেখিয়াছি' এ কখনই সে নহে!"

ম্যাজিষ্ট্রেট নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—

"তাহা হইলে নিশ্চয়ই একটা বিষম ব্যাপার ঘটিয়াছে। এখন উপায়?"

জজ সাহেব বলিলেন,—

"আপাততঃ ফাঁসি বন্ধ রাখিয়া তদারক করা আবশ্যক।"

তখন সুন্দরী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসিলেন,—

"আমি ফাঁসিকাঠে এখন উঠিব কি?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন,—

"না, তোমার ফাঁসিতে উঠিতে হইবে না। তুমি যে এ মোকদ্দমার আসামী কালী নহ তাহা স্থির। কালী কোথায় এবং তাহার কি হইয়াছে তাহা তুমি অবশ্যই জান। তুমি কালীকে বাঁচাইবার জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে আইনের চক্ষে তোমার অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ

ঘটিয়াছে। এখনই তোমার অপরাধের যথাবিহিত তদারক হইবে। তাহার পর তোমার বিচার হইয়া শাস্তি হইবে। আপাততঃ কনষ্টবলেরা তুমি যেখানে ছিলে, সেখানেই তোমাকে রাখিয়া আসুক।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এইরূপ আদেশ দিলে কনষ্টবলগণ আবার সেই সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া জেলে ফিরিল, তাহার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস সাহেব এবং ইনিস্পেক্টর বাবুও চলিলেন।

ফাঁসি বন্ধ হইয়া গেল। যাহারা বড় সাধ করিয়া ফাঁসি দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বড় দুঃখিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। বাটী ফিরিবার সময় লোকে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল,—“কালী অনেক মন্ত্র তন্ত্র জানিত। সে মন্ত্রের জোরে চেহারা বদলাইয়া ফাঁসি হইতে বাঁচিয়া গেল।” কেহ মহাবিজ্ঞের মত বলিল,—“আরে নাহে না, তাকে ফাঁসি দেওয়া ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা নয়। দেখিলে এক নজরায় সকলের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিল।” আর একজন বলিল,—“এ সকলই দেবতার কৃপা। দেবতা নহিলে এমন করিয়া বাঁচাইতে পারে কে? দেখিলে না মেয়েটার চেহারা? মানুষের কি কখন এমন চেহারা হয়?” কেহ বলিল,—“দাদা, ঐ যে পুলিস, ওদের পায়ে নমস্কার। এ সকলই জানিবে পুলিসের খেলা। পুলিস টাকা খাইয়া এই বিভ্রাট বাধাইয়াছে। তাহা না হইলে যেখানে মাছিটী পর্য্যন্তও যাইবার যো নাই সেই জেলখানার ভিতরে এমন কাণ্ড ঘটায় কে?” মীমাংসা নানারূপ। ক্রমশঃ।

অতৃপ্তি।

১

বাঞ্ছিত আমার তুমি হে—
তুমি প্রাণময়!
আমি চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে,
এখানে তোমারে চেয়ে,
এখানে তোমারে পেয়ে,
পেয়েছি বেদনা বড়
পরাণে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

২

হেথা দেখিয়া পূরে না বঁধু
বাসনা,
হৃদয়ে শুকায়ে মরে
কামনা।
তিলেকে ফুরায় হাসি,
বাজে না প্রাণের বাঁশী,
ঢাকে সুখ আঁধারের
বিতানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

৩

হেথা বিরহ মাথান নীল
আকাশে,
হাহা রব উঠে শুধু
বাতাসে;
প্রাণের আকুল গান,
কেঁদে হয় অবসান,
প্রেমের সমাধি হয়
শ্মশানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

৪

সেথা জীবন জুড়াব যদি
দেখা পাই,
মরণ চরণ তলে
দেয় ঠাঁই;
গঠি চির বিনোদন
বাসনার উপবন,
পরাণ মাতাব সেথা
সে গানে—
আর চাহি না তোমারে বঁধু
এখানে!

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য